অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা
চন্দনা দত্ত

ছবি
দেবব্রত ঘোষ
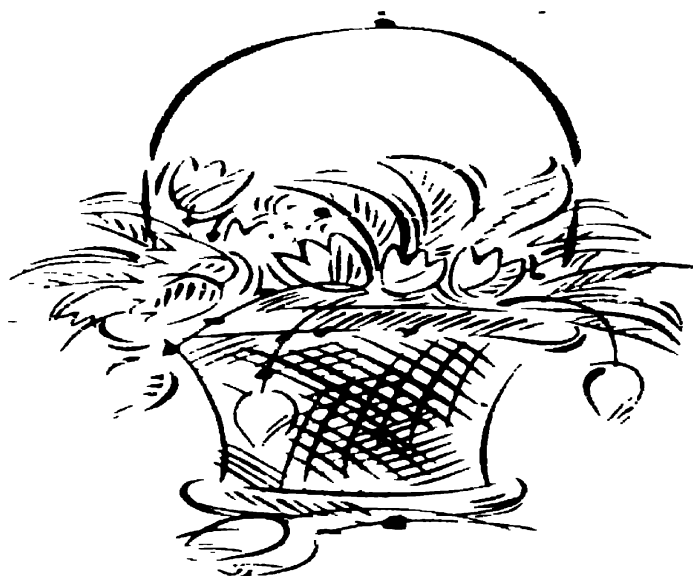
শিশু সাহিত্য সংসদ

CHIROKALER SERA
ABANINDRANATH THAKUR
(Selected works of Abanindranath Thakur
ed Sankha Ghosh)

ISBN-81-86806-52-0

প্রথম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

মূল্য : টাকা ১৫০.০০ মাত্র

প্রকাশকের কথা

ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন ধারার প্রবর্তন করার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও কলম ধরেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। 'বুড়ো আংলা'য় তিনি নিজের নামেই ছড়া কেটেছেন নিজে—'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিনঠাকুর—ছবি লেখে।' সত্যিই যেন কল্পনার রঙে তুলি ডুবিয়ে ছোটোদের জন্যে কখনো ছড়া, রূপকথা, আর নাটক লিখেছেন তিনি। লেখা তো নয়—যেন এক একখানা ছবি।

বাংলা শিশুসাহিত্যে অনন্য ধারার লেখক অবনীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনার এই সংকলনটি সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষ। তাছাড়াও এই সংকলনের পরিকল্পনার প্রথম দিন থেকেই নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয়া মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় এবং দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের বিশ্বাস, অবনীন্দ্রনাথের লেখা শুধু ছোটোরাই কেন, বড়োদেরও মুগ্ধ করে এখনও। সেই চিরন্তন পাঠকদের হাতেই তুলে দিলাম এই সংকলন। ভালো লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

দেবজ্যোতি দত্ত

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশুজগৎ খুঁজে বেড়াই আর ভাবি আমার সঙ্গে সঙ্গে শিশুজগৎটাও বুড়িয়ে গেল নাকি! দেখি ঠাকুরমা বসে বসে ঝিমোচ্ছে সন্ধেকালে, শিশুর দল গল্প শুনতে আসে না; ঘরের কোণে বসে শৈশববিজ্ঞানের বই পড়ছে, কাছে এগোয় না ঠাকুরদাদার রামায়ণকথা শুনতে। সে আমলে ছেলেবুড়ো আমরা সবাই শিশু ছিলেম, কথক ছিল গল্পকথা কইবার! এখন কথা শোনে না কেউ, লেখাগল্প পড়তে চায়।

গল্প কানে শোনার জন্যে, ছবি চোখে দেখার জন্যে, এই জানতেম। এখন দেখি সে চাল উলটে গেছে। গল্প পড়ে চলেছে ছেলেরা, ছবি-পরিচয় চোখে না নিয়ে খবরের কাগজের চিত্রপরিচয় পড়ে দেখছে ছেলেবুড়োতে! নবযুগের এ নববিধান—তড়িঘড়ি শিশুসাহিত্য গড়ে তোলো, শিশু আছে কি নেই খোঁজ নেবার চেষ্টা কে করে! নিয়ে বসো ভিনদেশের গাদাগাদা ছেলে ভুলোনো রঙিন বই, করে ফেল তরজমা, ব্যস হয়ে গেল কাজ শেষ! শিল্পের বেলাতেও তাই, হঠাৎ গজাবার চেষ্টা, চটজলদি বাঁধাকপির মতো নবযুগের শিল্প, বার হোক দেদার শিশুসমালোচনা ও পুস্তক তরজমা, কাগজের তাসের ঘর খাড়া করবারও উৎসাহ বা সময় নেই।

তাড়ার চোটে শিল্প হবে, শিশুসাহিত্য হবে, এরকম ভাবা সহজ হয়ে গেছে নবযুগে। এ অদ্ভুত উপায় কে বাতলালে আমাদের সহজে শিশুসাহিত্য এবং মাস্টারপিস বিনা সাধনায় গড়ে তোলবার তা কে জানে।

গোড়া থেকে শিশুদের সম্পর্ক যদি না রাখি তো আফিসঘরে বসে শিশুগল্প লেখা দুষ্কর। গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র, পড়ার ভাষা স্বতন্ত্র। গল্পের ছলে বলতে হয় শিশুকে গল্প। রামায়ণের হনুমানকে শিশুরা যে আজও ভালোবাসে, ভীমকে যে একটুও ভয় করে না, তার পিছনে আছে সেকালের দুই শিশুসাহিত্যসম্রাটের অপূর্ব চরিত্রগঠনের ক্ষমতা এটা মনে থাকে যেন। তাঁরা তরজমা করে যাননি মহাভারত রামায়ণ, ছেলে, বুড়োবুড়ি সবাই যখন আমরা শিশুমন নিয়ে বর্তমান ছিলেম তখনকার কবি তাঁরা কথার মধ্যে দিয়ে ছবিকে ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাবকে ফুটিয়ে গেছেন সহজে। আর আজকাল গল্পের ভাব বুঝতে ভাষা বুঝতে গালে হাত দিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মাথা ঘামাতে মাথা ধরাতে হয় রাতদুপুরে বাতি জ্বালিয়ে। মুখে মুখে সুকুমারবাবুর আবোলতাবোল ভীষ্মলোচনের কবিতা পড়ে শোনাই, দেখি শিশুরা দিব্যি শুনে চলেছে। যত্নে লেখা যত্নে ছাপানো বই পড়তে দিই, দেখি শিশু দু-পাতা উলটে হাই তুলছে। কোনখানে ঠেকে তাদের মন চড়ায় বাধা নৌকোর মতন—নীরস ভাষার বালুচরে, এবং চলতি ভাষার ন্যাকামোতে ন্যাতাজোবড়া হয়ে বোকা বনে গিয়ে ছেলেরা শৈশব অতিক্রম করে হঠাৎ হয় ঘোরতর যুবা, নয় ভীষণতর বুড়ো রকমের মানুষ। চাঁদামামা সূর্যিমামা তালপাতার সেপাইদের কথা শুনলে চমকে উঠে বলে—ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন চলবে না। শিশুদের জন্যে চন্দ্রসূর্যের বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখো, চলবে বাজারে, তালপাতার সেপাইয়ের দিক্‌বিজয় অচল হবে শিশুদের কাছে।

গুরুগম্ভীর লেখার মধ্যে দিয়ে শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েরা গম্ভীর হয়ে উঠলে যখন বড়ো হবে তখন

আর গভীর নিশ্বাস ফেলে বাল্যকালের দিকে তারা ফিরে চাইতেও চাইবে না—দৃষ্টি থাকবে তাদের শিশুসাহিত্যসম্রাট হবার দিকে, শিশুসাহিত্যের দিকে নয়।

শিশুসাহিত্যপতি, শৈশবরাষ্ট্রপতি, শিশুশিল্পাচার্য খেতাব নেওয়া সহজ, কিন্তু কোনো কেতাবে লেখে না যে এই হলেই হয়ে গেল কাজ!

ইয়োরোপে হাজার হাজার লোক শিশুসাহিত্য গড়ছে, কাব্য লিখছে, ছবি লিখছে, কারও পেছনে তারা মউরতক্ত কিংবা নামের তখমা জুড়ে দেয় না। নবযুগের তাড়ায় এই নববিধান কোথা থেকে অকস্মাৎ আমাদের ঘাড়ে চাপল ভেবে পাই না। বুড়ো হয়েছি তাই ভাবি বুড়ো হয়েই দিন কাটাই আরামকেদারায়। যা নাই, হবার নয়, তার স্বপন আর দেখি কেন? ঘরে যেতে হবে, রাত হল, নমস্কার।

রঙমশাল, আষাঢ় ১৩৪৫ — *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

সূচনাকথা

অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা অনেকসময়ে ইংরেজি বর্ণমালা শিখতে শুরু করে মজার একটা ছড়া দিয়ে। কেমন সেই ছড়া? আর কিছু নয়, অক্ষরগুলিকে পরপর সাজিয়ে বলে যাওয়া শুধু। যেমন:

এ-- বি-- সি-- ডি - ই-- এফ জি
এইচ আই জে-- কে-- এলেমেনো পি
কিউ আর এস টি-- ই-- উ-- ভি
ডাবলু এক্স ওয়াই জেড এ-- বি-- সি।

সবে যারা পড়তে শিখছে, তাদের মধ্যে কতজনই যে 'এলেমেনো'-কে 'এলোমেলো' পড়ে গেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

খুব যে সহজে তৈরি হয়েছিল ছড়াটা, তা কিন্তু নয়। ছবির শিল্পী অবন ঠাকুরের একবার শখ হয়েছিল যে তিনি ছবি ছেড়ে পালা ধরবেন, চিত্র ছেড়ে পুঁথি। 'এসপার ওসপার' নামে সেইরকম একটা খেয়ালখুশির পালা লিখেছিলেন তিনি, অভিনয় হবে বলে তার মহড়া চলছে, তখন দরকার হল একটা ছড়ার। সুর দিয়ে তাকে গান করতে হবে। ইংরেজি অক্ষরগুলো সাজিয়ে নিলেই তৈরি হতে পারে সেই গান, মনে হল অবনীন্দ্রনাথের। কিন্তু সাজানো হবে কেমন করে? ভাগ করা হবে কেমন করে? বর্ণমালার শেষে যে এক্স-ওয়াই-জেড আছে, তার মিল পাওয়া যাবে কোন্ অক্ষরে?

জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ির ছেলের দল তৈরি হচ্ছে অভিনয় করবার জন্য, আর এদিকে খুবই ভাবছেন অবনীন্দ্রনাথ, কেননা গানের সুর এখনও পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানের একটা সূত্র ভাবতে ভাবতে আর্কিমিডিস যেমন স্নানের টব থেকে দৌড়ে এসেছিলেন 'পেয়েছি পেয়েছি' বলতে বলতে, ঠিক সেইরকমই স্নান করতে করতে সেইরকমই উত্তেজনায় এবং এন 'ইউরেকা ইউরেকা' বলতে বলতে ছুটে এলেন অবনীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, পেয়ে গেছেন মীমাংসা। শেষের দিকটায় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এ-- বি সি, তাহলেই তো মিলে যাবে সব। ছোটোদের বললেন তিনি: 'দেখলি তো, এ-- বি-- সিটা শেষকালে জুড়ে দেওয়া দরকার। ওইটে হচ্ছিল না বলে যত গোল!'

শেষকালে এ-বি-সিটা জুড়ে দেওয়াই শুধু নয়, ছড়াটার আরও মজা হল 'এল্ এম্ এন ও'-কে একত্র বেঁধে দিয়ে 'এলেমেনো' করে দেওয়ায়, অন্য অক্ষরগুলিকেও কখনো টেনে কখনো চেপে উচ্চারণ করায়।

কিন্তু এর মধ্যে কি কিছু মহিমা আছে না, মহিমা কিছু নেই। এ হল খেলা মাত্র। ছোটোদের সঙ্গে ছোটোদের মতো হয়ে খেলা। এই খেলাটা বড়োরা সবাই যে খেলতে পারেন তা নয়, বড়োরা প্রায়ই একটু ভারিক্কি হয়ে যান। ছোটোদের মানুষ করে তুলতে হবে বলে ভারী ভারী জ্ঞানের কথা সাজাতে থাকেন তাঁরা অনেকসময়েই। কিংবা, যদি কখনো ছোটোদের সঙ্গে ছোটোদেরই কথা বলেন তাঁরা, তখন অনেকে

হয়তো-বা একটু একপেশে হয়ে যান। ভাবেন, কিশোরমনকে ছোঁবার জন্য চাই শুধু রহস্য, চাই শুধু রোমাঞ্চ। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প চাই, গোয়েন্দার গল্প চাই, ভূতের গল্প চাই—ভাবেন তাঁরা।

এসব গল্পে ছেলেমেয়েদের যে কিছু দরকার নেই তা নয়। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধও নয় ছোটোদের মন। যে-মন অনুভব করতে পারে, যে-মন কল্পনা করতে পারে, যে-মন অনেক কিছু সৃষ্টিও করে তুলতে পারে, সতেজ সজাগ সেই মনই তো ছোটোদের? সে-মনের জন্য কি অনেকরকম রসদ চাই না আমাদের? কারা জোগাবেন সেই রসদ?

অন্য অনেকের সঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথও তুলে নিয়েছিলেন সেই ভার, কিশোরমনের রসদ জোগাবার ভার। দেশের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল শিল্পী হিসেবে, 'ছবির রাজা অবিন ঠাকুর'-এর কথা সবাই আমরা জানি। সেই ছবির মন নিয়ে, তুলি ছেড়ে তিনি কলমও ধরেছেন কত সময়ে! তৈরি হয়ে উঠেছে রূপে-ভরা ছন্দে-ভরা কিশোরজগৎ, যে-জগতে সব বয়সের সব মানুষের সহজ যাওয়া-আসা আছে।

কেমন ভাবে তৈরি হয়ে উঠল সেটা, তাঁর সেই লেখার জগৎটা?

একেবারে যে নিজের ইচ্ছেতেই তিনি কলম ধরেছিলেন, তা নয়। লেখার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেয়। যৌবনে একদিন তাঁকে বলেন রবীন্দ্রনাথ, ছোটোদের জন্য লেখো। অবনীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। লিখবেন? কেমন করে তিনি লিখবেন? তিনি তো সেতার বাজাতে পারেন, তিনি তো ছবি আঁকতে পারেন, কিন্তু লিখবেন কেমন করে তিনি? লেখেননি তো কখনো। রঙের রেখার ভঙ্গবিভঙ্গ তিনি জানেন, কিন্তু লেখার করণকৌশল তো জানেন না কিছু তিনি। তাহলে?

তাহলেও, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যেমন করে তুমি গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।' ভাষায় যদি কিছু দোষ হয়? তা যদি হয়, রবীন্দ্রনাথই তা ঠিক করে দেবেন, ভরসা দিয়েছেন তিনি।

সেই থেকে শুরু। লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। খুশি হলেন তাঁর রবিকা। ভাষা শুধরে দেবার কথা যে বলেছিলেন তিনি, তার কী হল? শুধরে দিতে হল অনেক? লেখার মধ্যে একটা শব্দ ছিল 'পল্বল', হয়তো একটু ভারী শব্দ ভেবে সেখানে অন্য কিছু বসাবার কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরে, 'না থাক' বলে সরিয়ে নিয়েছেন তাঁর কলম।

সরিয়ে নেবারই কথা। কেননা অবনীন্দ্রনাথ, ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর সেই প্রথম বইখানিতেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর একেবারে নিজস্ব ভাষা। সে-ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষাজগৎ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ভাষা দিয়ে ছোটোদের যে মানসজগৎ গড়ে তুলতে চান রবীন্দ্রনাথ, তারও থেকে অনেকটা দূরে চলে যান অবনীন্দ্রনাথ। তাই, একবার লেখার স্বাদ পেয়ে যাবার পর, অবনীন্দ্রনাথের কলম চলতে থাকে ভিন্ন একটা পথে। পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, কিংবা কখনো দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত কোনো রচনা থেকে সূত্র নিয়ে কথা বুনে যান তিনি আপনমনে। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যেমন করে তুমি গল্প কর, তেমনি করেই লেখো', যেন সেই ইশারা নিয়ে তাঁর ভাষা হয়ে দাঁড়ায় রূপকথা বলবার ভাষা, ছবি ফোটাবার ভাষা। আর সে-ভাষায় সবসময়েই জড়িয়ে থাকে তাঁর নিজেরই ছেলেবেলার জন্য আকুল একটা টান।

টলস্টয় তাঁর ডায়ারিতে একবার লিখেছিলেন আটাত্তর বছর বয়সে : 'আবার যদি সেই ছোটো ছেলেটি হতে পারি! ঘন হয়ে যেতে পারি সেই আমার মায়ের কাছে!' অনেক লেখকেরই মনে এমন

একটা আবেগ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আমাদের অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'মাসি' গল্পের মধ্যে নিজের আদলে গড়ে তুলেছিলেন এক 'অবু'কে, সেই অবু বলেঃ 'মাসি, আমার মনে হয় আমি ঠিক তেমনি আছি ছোট্টটি।' একেবারেই তখন ছোটো নয় সে-অবু, তবু তার ভাবতে ইচ্ছে করছিল সেইসব সময় 'যখন আসত তাড়াতাড়ি সকাল, তাড়াতাড়ি পড়ন্ত বেলা।' ফেলে-আসা সেই সময়ের জন্য আকুলতা দিয়ে মাখানো আছে বলে অবনীন্দ্রনাথের ভাষা একটা বিশেষ স্বাদ নিয়ে আসে। তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' বা 'বুড়ো আংলা'র মতো রচনাগুলিতে জড়িয়ে আছে সেই স্বাদ, সেই মেজাজ।

অবশ্য ও-বইগুলির তুলনায় কম পরিচিত আরও একজন অবনীন্দ্রনাথ আছেন, নিজেকে যিনি প্রকাশ করেন অজস্র পুথিতে পালায় পদ্যে গল্পে, যিনি হালকা কৌতুক করেন রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে; যিনি তাঁর নাট্যচরিত্র নারদকে দিয়ে বলিয়ে নেন কখনোঃ 'ভৈমগণ মধুপানে উন্মত্ত হয়েছেন—কিছু একটা হইচই লাগিয়ে দাও সেজেগুজে' বা 'দাও সাদাকে কালো, কালোকে সাদা করে ছেড়ে।' সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা করে দেবার এইসব উলটোপালটা হইচই থেকে তাঁর ওসব পালার মধ্যে দেখা দিতে থাকে এমনি নানা গান, হিড়িম্বা যেমন গায় :

নাগ ঝমাঝম্ ঝম্ কিড়ি,
দন্তে দিব্য ফিট্‌কিরি,
ভাজি খাব কিড়িমিড়ি,
সুপারি ডাবা পানবিড়ি,
গানের শোভা গিটকিরি,
দ্যালের শোভা দ্যাল গিরি!

'রাজকাহিনী' বা 'বুড়ো আংলা'র আবিষ্টতার পাশে এ তাঁর এক ভিন্ন একটা মেজাজ, সেই মেজাজেই এ– বি– সি দিয়ে গানও বাঁধতে পারেন তিনি।

এসব নানা রকমের মেজাজ নিয়েই আমাদের অবনীন্দ্রনাথ, ছোটোদের অবনীন্দ্রনাথ।

শঙ্খ ঘোষ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা	গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত	
শকুন্তলা	আদি ব্রাহ্মসমাজ	১৮৯৫
ক্ষীরের পুতুল	আদি ব্রাহ্মসমাজ	১৮৯৬
রাজকাহিনী	হিতবাদী লাইব্রেরি	১৯০৯
ভারতশিল্প	হিতবাদী লাইব্রেরি	১৯০৯
ভূতপত্‌রীর দেশ	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	১৯১৫
নালক	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	১৯১৬
পথে বিপথে	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স	১৯১৯
বাংলার ব্রত	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	১৯১৯
খাতাঞ্চির খাতা	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	১৯২১
প্রিয়দর্শিকা	কান্তিক প্রেস	১৯২১
চিত্রাক্ষর		১৯২৯
রাজকাহিনী (২য় খণ্ড)	গ্রন্থবিহার	১৯৩১
বুড়ো-আংলা	এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স	১৯৪১
ঘরোয়া	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৪১
বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৪১
জোড়াসাঁকোর ধারে	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৪৪
আপন কথা	সিগনেট প্রেস	১৯৪৬
সহজ চিত্রশিক্ষা	বিশ্বভারতী	১৯৪৬
আলোর ফুলকি	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৪৭
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৪৭
ভারতশিল্পের মূর্তি	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৪৭
মাসি	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৯৫৪
একে তিন তিনে এক	এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স	১৯৫৪
শিল্পায়ন	সিগনেট প্রেস	১৯৫৫
মারুতির পুঁথি	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং	১৯৫৬
চাঁইবুড়োর পুঁথি	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউস	১৯৫৭
রং-বেরং	অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির	১৯৫৮
কিশোর সঞ্চয়ন	অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির	১৯৬০
চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প		১৯৭১
হানাবাড়ির কারখানা		
অবনীন্দ্র রচনাবলী (১-৮ খণ্ড)	প্রকাশ ভবন	১৯৭৬-১৯৯৭
ছোটদের সম্ভার	এশিয়া পাবলিশিং	১৯৮৫
হাওয়া বদল ও অন্যান্য রচনা	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৯১

সূচি

পুথিপালা

গল্প-কাহিনী

ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানি, দুয়ো আর সুয়ো। রাজবাড়িতে সুয়োরানির বড়ো আদর, বড়ো যত্ন। সুয়োরানি সাত মহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুয়োরানি মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক-ভরা সাত রাজার ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুয়োরানি রাজার প্রাণ।

আর দুয়োরানি—বড়োরানি, তাঁর বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন। রাজা বিষনয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন— ছেঁড়া কাঁথা। দুয়োরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুয়োরানি—ছোটোরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সা[illegible]

রা[illegible]র আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস গে[illegible]
জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা[illegible]

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটোরানি—সুয়োরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়ে ছিলে[illegible] সখী সেবা ক[illegible]ছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটো[illegible]নিকে বললেন— রানি দেশবিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব?

রানি ননির হাতে হিরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—হিরের রং বড়ো সাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আটগাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানি গলার গজমতি-হার দেখিয়ে বললেন—দেখো রাজা, এ মুক্তো বড়ো ছোটো, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারই একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কী আনব রানি?

তখন আদরিণী সুয়োরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললে—মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননির দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটোরানি হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন—মনে পড়ল দুঃখিনী বড়োরানিকে।

দুয়োরানি—বড়োরানি, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়োরানি, আমি বিদেশ যাব। ছোটোরানির জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানি বললেন—মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাত মহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারির পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায় সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হিরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব! মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাত মহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাওগে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন—না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বলো তোমার কী সাধ?

রানি বললেন—কোন লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ারমুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়োরানি—দুয়োরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিমমুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুয়োরানি নীল সাগরের পারে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথার পড়ে রইলেন। আর আদরিণী সুয়োরানি সাতমহলা অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়োরানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটোরানির সেই

হাসিহাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানি কী করছেন? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কী করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানির চোখে ঘুম এল না।

সুয়োরানি—ছোটোরানি রাজার আদরিণী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমন করে জাহাজে দেশ—বিদেশে রাজার বারো মাস কেটে গেল।

তেরো মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানির চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝংকার—মন্দিরার রিনিরিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকালবেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুয়োরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর একছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ-মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ-মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিণী সুয়োরানির শখের শাড়ি কিনলেন।

তারপর আর ছ-মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটোরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়োরানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর, বড়ো ভুল হয়েছে। বড়োরানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটোরানির সাধের গহনা শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানি সাত মহল বাড়ির সাত তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে, সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজললতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটোরানির সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন—এই নাও, রানি। মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশে রাজার মেয়ে, এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছটি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, একদিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখো! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখো!

রানি তখন দু-হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু-পায়ে দশগাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল, দু-পা যেতে দশগাছা মল শানের উপর খসে পড়ল। রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন।

সাত পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতেবহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটোরানি আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন—ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন দেশের ধুলোবালিতে এ মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা শাড়ি, পরা গহনায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোসাঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠঘাট দোকানপাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানাকড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটোরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানির গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড়ো ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়ারাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি, পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভান্ডারে তুলে রাখো, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিয়ো।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী বানরটা বলে কী? ছেলেই হল না, বউ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানির শাড়ি বুনতে দাওগে। এ গহনা, এ শাড়ি রাজভান্ডারে তুলে রাখো; যদি বউ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব। রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর, রাজা সেই বাঁদর কোলে বড়োরানির কাছে গেলেন!

দুঃখিনী বড়োরানি, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মহারাজ, বসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিবে এলে, আমি এমনি অভাগিনি তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়োরানির কোলে বাঁদরছানা দিয়ে বললেন—মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটোরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষগুণ ভালো। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টিকথা আছে; সেখানে তা তো নেই। রানি, সাত-জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটোরানি পায়ে ঠেলেছে; আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এসেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি। কিন্তু দেখো, ছোটোরানি যেন জানতে না পারে! তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায়, বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়োরানিকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুধ-কলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটোরানির সাত মহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়োরানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়োরানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটা চালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথি বনের বানরকে কোলে নিয়ে ছোটোরানির সাত মহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়োরানিকে যখন দেখে তখনই রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কীসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানি বললেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাত মহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাত মহল বাড়িতে রাজার

ছোটোরানি আমার এক সতিন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে জাদু করে আমার সাত মহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত-সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে, সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনি করেছে। ওরে বাছা, আমার কীসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বউ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাত মহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম, তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এজন্মে সোনার সংসার সতিনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনি হয়েছি! বাছারে, বড়ো পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা, বুকে সয়ে বেঁচে আছি।

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে—মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাত মহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশো দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস, তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কী তপস্যা করে, কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক, আমার যে দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্যসাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে— না মা, আমার কথা না শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পূর্ব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি—শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটোরানির সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়োরানির জলে-ঝড়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নবত বাজল, রাজা-রানির ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে রাজবেশ অঙ্গে পরে, রাজদরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটোরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়োরানি কী করলেন?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন, ওপাশ দেখলেন—বানর নেই! রানি এঘর খুঁজলেন ওঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন—বানর নেই! বড়োরানি কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজ দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাইসান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাইসান্ত্রীর হাত এড়িয়ে রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড়ো সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কী? একথা কি সত্য? বড়োরানি দুয়োরানি তার ছেলে হবে? দেখিস একথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুয়োরানিকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি করো, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি-হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

বানর নাচতে নাচতে ভাঙা ঘরে দুয়োরানি পড়ে পড়ে কাঁদছেন—সেখানে গেল।

দুয়োরানির চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে—এই দেখ মা, তোর জন্যে কী এনেছি! তুই রাজার রানি, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর।

রানি বানরের হাতে গজমোতি-হার দেখে বললেন—এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গজমোতি-হার! যখন রানি ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ হার কোথা পেলি? বল বানর, রাজা কি এ হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কি কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললে—না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি-হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানি বললেন—তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি?

বানর বললে—ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানি বললেন—ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর! ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কী সুখের সন্ধান পেলি যে, রাত না পোহাতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি?

বানর বললে—মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম—রাজামহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইতে রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানি বললেন—ওরে, রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন! হায় হায়, কী করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কী সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি?

বানর বললে—মা তোর ভয় কী, ভাবিস কেন? এ দশ মাস চুপ করে থাক, সবাই জানুক বড়োরানির

ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানি বললেন—চল বাছা, চল। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানি ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটোরানির ঘরে গেলেন।

ছোটোরানি কু-স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন—আরে শুনেছ ছোটোরানি, বড়োরানির ছেলে হবে! বড়ো ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানি, বড়ো ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানি বললেন—পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন—সেকী রানি? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজ-সিংহাসনে রাজা করব, একথা শুনে মুখ ভার করে? রানি, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ করো?

রানি বললেন— আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মলো-বাঁচল তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটোরানি আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড়ো রাগ হল, রাজকুমারকে ছোটোরানি মরো বললে। রাজা মুখ-আঁধার করে বারমহলে চলে এলেন। রাজা-রানিতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটোরানির মুখ দেখলেন না, বড়োরানির ঘরেও গেলেন না—ছোটোরানি শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়োরানিকে প্রাণে মারে! রাজা বারমহলে একলা রইলেন।

এক মাস গেল, দু-মাস গেল, দু-মাস গিয়ে তিন মাস গেল, রাজা-রানির ভাব হল না! ঝগড়ায় ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুয়োরানির পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন—কী হে বানর, খবর কী?

বানর বললে—মহারাজ, মায়ের বড়ো দুঃখ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন—একথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনই সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়োরানিকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়োরানিও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় করো।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে গেলেন। আর রানির বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানির কাছে এল।

রানি বললেন—আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন, খাব কখন?

বানর বললে—মা আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানি নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলোজন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলোশো বাঁশ নিলে। সেই ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলো জন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুয়োরানির বানর ভাঙা ঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলোবামুনে রানির ভাত নিয়ে এল; ষোলোমোহর বিদায় পেলে।

দুয়োরানি নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন—ঘর নতুন! ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন। মেঝেয় নতুন কাঁথা! আলনায় নতুন শাড়ি! রানি অবাক হলেন। বানরকে বললেন—বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বলল—মা, রাজামশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল।

রানি খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানি রাজভোগ খান আর ভাবেন—আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে ভয়ে এক মাস, দু-মাস, তিন মাস গেল। বড়োরানির নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন—কী বানর, কী মনে করে?

বানর বললে—মহারাজ, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?

রাজা বললেন—নির্ভয়ে কও।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড়ো দুঃখ পান। ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতের হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে লেপ পান না, আগুন জ্বালতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন—তাইতো! তাইতো! একথা বলতে হয়। বানর তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে—মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটোরানি বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন—সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানিকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটোরানি আসতে পাবে না। সে মহলে বড়োরানি থাকবেন, বড়োরানির বোবা-কালা দাই থাকবে। আর বড়োরানির পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে—মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন—যাও মন্ত্রী, মহল সাজাওগে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়োরানির নতুন মহল সাজালেন।

দুয়োরানি ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার

পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটোরানির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী—ছোটোরানির 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটোরানি বলে পাঠালেন—মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে।

রানি ডেকেছেন—ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানি বললেন—এসো ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটেরানির পাশে বসে বললে—কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার-ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কী?

রানি বললেন—হয়েছে আমার মাথা আর মুন্ডু! সতিন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানি হয়েছে! ভিখারিনি দুয়োরানি এতদিনে সুয়োরানির রানি হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুনসই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতিনের এ আদর সয় না।

ব্রাহ্মণী বললে—ছি! ছি! সই। ওকথা কি মুখে আনে! কোন দুঃখে বিষ খাবে? দুয়োরানি আজ রানি হয়েছে, কাল ভিখারিনি হবে, তুমি যেমন সুয়োরানি তেমনি থাকবে।

সুয়োরানি বললেন—না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নাই। আজ বাদে কাল দুয়োরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজা হবে! লোকে বলবে আহা দুয়োরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখো না, পোড়ামুখী সুয়োরানি মহারাজার সুয়োরানি হল তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারাদিন উপোস যায়! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতিনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে—চুপ করো রানি, কে কোন দিকে শুনতে পাবে। ভাবনা কী? চুপিচুপি বিষ এনে দেব, দুয়োরানিকে খেতে দিয়ো। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানি বললেন—যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে না খেতে বড়োরানি ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে—ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়োরানিকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাকো।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুঁজে খুঁজে, ভর সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটোরানি সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন—ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়োরানিকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়োরানির নূতন মহলে গেল।

বড়োরানি বললেন—আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুয়োরানি বলে কি ভুলে থাকতে হয়?

ডাকিনী বললে—সেকী গো! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কি ভুলতে পারি? এই দেখো, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানি দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড়ো যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন— ব্রাহ্মণী আমায় কী খাওয়ালে! গা কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে— চল মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানি উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানি চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা শানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানির মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে—রানি অজ্ঞান, অসাড়।

বানর সোনার প্রতিমা বড়োরানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কী লতাপাতা, কোন গাছের কী শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়োরানিকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল—বড়োরানি বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানির মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোকলস্কর, দাসী-বাঁদি যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে—মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বলো।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়োরানির মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন, তিন রাত বড়োরানি অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়োরানি চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে—মহারাজ, বড়োরানি সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হিরের হার খুলে দিয়ে বললেন—চল বানর, বড়োরানিকে আর বড়োরানির ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে—মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়োরানিকে দেখে এসো ছোটোরানি কী দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন—বিষের জ্বালায় বড়োরানির সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, রানি পাতাখানার মতো পড়ে আছেন, রানিকে আর চেনা যায় না।

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটোরানিকে প্রহরীখানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন—মন্ত্রীবর, আজ বড়ো শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে পথে আলো জ্বালাও, ঘরে ঘরে বাজি পোড়াও, দীন-দুঃখী ডেকে রাজভান্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারি না থাকে।

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে পথে আলো দিলেন, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য-নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন—দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও!

বানর বললে—মহারাজ, আগে ছেলের বউ ঠিক করো, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল! কন্যার অঙ্গের বরন কাঁচা সোনা, জোড়া ভুরু—বাঁকা ধনু, দুটি চোখ টানা টানা, দুটি ঠোঁট হাসি হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।

বানরকে ডেকে বললেন—ছেলের বউ ঠিক করেছি, কাল শুভদিনে শুভ লগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে—মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়ো, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন—দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানির ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন মহলে বড়োরানির কাছে গেল।

বড়োরানি ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন—ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কী ছলে ভোলাব!

বানর এসে বললে— মা গো মা, ওঠ। চেলির জোড় আন, মাথার টোপর আন, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানি বললেন—বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কী ছলে ভোলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতিন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস? তুই রাজাকে ডেকে আন, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে—রাজাকে পাব কোথা? দু-দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড়ো অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানি বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলির জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন, জরির জুতো পায়ে দিলেন।

বানর চুপিচুপি ক্ষীরের বর পালকিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু-খানি ছোটো পা, দু-পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলো জন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানি, আঁধারপুরে একলা বসে বিপদভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঢাকি-ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী— সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগ্‌নগর এসে পড়ল।

দিগ্‌নগরে দিঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল, কাহার পালকি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দিঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে—মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম বরকে যেন কেউ না দেখে, আজকের দিনে বর দেখলে বড়ো অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন দিঘির জলে নেয়ে, রেঁধেবেড়ে খেয়ে, তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বউ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুন খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুনের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুন কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুনের কালো বেড়াল মিউ মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে মনে ফন্দি এঁটে পালকির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা-কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পালকির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুন আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশের রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুনের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন— ঠাকরুন, দিনে-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুন বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুনের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে

পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানির বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুন তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক-পিঠ-মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগরে দিঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুন তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে—ঠাকরুন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর-খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুন ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কী! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দিঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুন লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোনদিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুয়েরানি তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে—কই ঠাকরুন,, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও তবে তো ষষ্ঠীরদাস যেঠের বাছাদের দেখতে পাব! ষষ্ঠীঠাকরুন বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথেঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারও পায়ে নূপুর কারও কাঁকালে হেলে, কারও গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউ বা পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারও পায়ে লাল জুতুয়া, কারও মাথায় রাঙা টুপি, কারও গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল তলায় ফুল কুড়োচ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলা; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারে সরবন, তেপান্তর-মাঠ, তার পরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছেগাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি,

নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খইয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তী গাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে-মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক-মৃদং-ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলির দেশে পুটুরানির বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে ক্যাঁচম্যাচ আর সে দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হিরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারই ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপেছে—পণ কড়ি গুনতে গুনতে মাছ ধরতে এসেছে; কারও পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারও চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল-মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুরটুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন পাড়ায় কোন ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলাব্যাঙ ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিকচিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন-বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন, আর-এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো-কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু-পাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে-ভরা-দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে-নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে—ছেলেটি বড়ো সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিনসে-কাহার নিয়ে, চার মাগি-দাসী সঙ্গে, আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে পুটুরানিকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে-যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুলগাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল—দেশটা যেন মাটির নীচে ডুবে গেল।

বানর দেখলে—কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুন কোথায় কে। বটতলায় দিঘির ধারে ছেলে-কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পালকি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগ্‌নগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন—বানর [illegible]ও এল না! [illegible]মার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে—না-জা[illegible] বর দেখতে কে[illegible]? কনের

মা-বাপ ভাবছে—আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে! রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু-গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকঝক আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়াপড়শি বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে—বর-কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে, তার পরদিন বউ-ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়োরানি দু-দিন—দু-রাত কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ষষ্ঠীঠাকরুন বলছেন, রানি ওঠ। [illegible] দেখ তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে ওঠো গো রানি ওঠো, পাটের শাড়ি পরো, বউ-বেটা বরণ করোগে!

রানি পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বউ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বউকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটোরানি বুক ফেটে মরে গেল!

শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারিসারি তাল-তমাল, পাহাড়-পর্বত, আর ছিল—ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলই দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে-কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়ালভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কী করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথি বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা গৌতমীর মুখে দেব-দানবের যুদ্ধকথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলই ছিল, ছিল না কেবল—আঁধারঘরের মানিক—ছোটো মেয়ে শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা-মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারারাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল-ফুল কুড়োতে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলি ফলের বনে ইংলি কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেইসঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাই-বাছুর—সে-ও তার আপনার, এমনকী—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়োই আপনার দুই প্রিয় সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু—বড়োই ছোটো—বড়োই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথিসেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ ছাড়া আর কী কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুনগুন গল্প করা, নয়তো মরালীর মতো মালিনীর হিমজলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড়ো রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুবদেশের রাজা, পশ্চিমদেশের রাজা, উত্তরদেশের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত সমুদ্র তেরো নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা-রুপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস-দাসী ছিল; দেশজুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশজুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেইদিন সাতদিন সাত সমুদ্র তেরো নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয় সখা মাধব্যকে বললেন—'চলো বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দু-বেলা থাল-থাল লুচি-মণ্ডা, ভার ভার ক্ষীর-দই দিয়ে মোটা পেট ঠান্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ-ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার জো কী, রাজার আজ্ঞা!

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে

শিকারি এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘা্ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দু-পাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে-বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয় সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হট্‌হট্‌ করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে-বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্যসামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোটো ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে — শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ-বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তির নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয় সখা মাধব্য, কত দূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুনগুন গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারও হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—ঊর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশ্বর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা — দু-জনে দেখা হল!

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না। রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই

বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ বন সে বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়! বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয় — ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে-বনে 'হা শকুন্তলা! হো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কী করছে?

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! এক দণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কী হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কী হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কী হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দু-জনে মালা বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কী হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয় সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কত দিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানি কুটির দুয়ারে—দু-জনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথিসেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয় সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির দুয়ারে পাষাণপ্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায় কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতিমিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না।

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনই শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে-অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশরফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কী বেশ করে দিলে? প্রিয় সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানি, তার কি এই সাজ?—হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হিরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানির সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোন দিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানির মতো রাজার কাছে চলে যাবে?—না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা-মাধবী কচি কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া, এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয় সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন।

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—'দেখিস ভাই, যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতারজলে গা-ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে
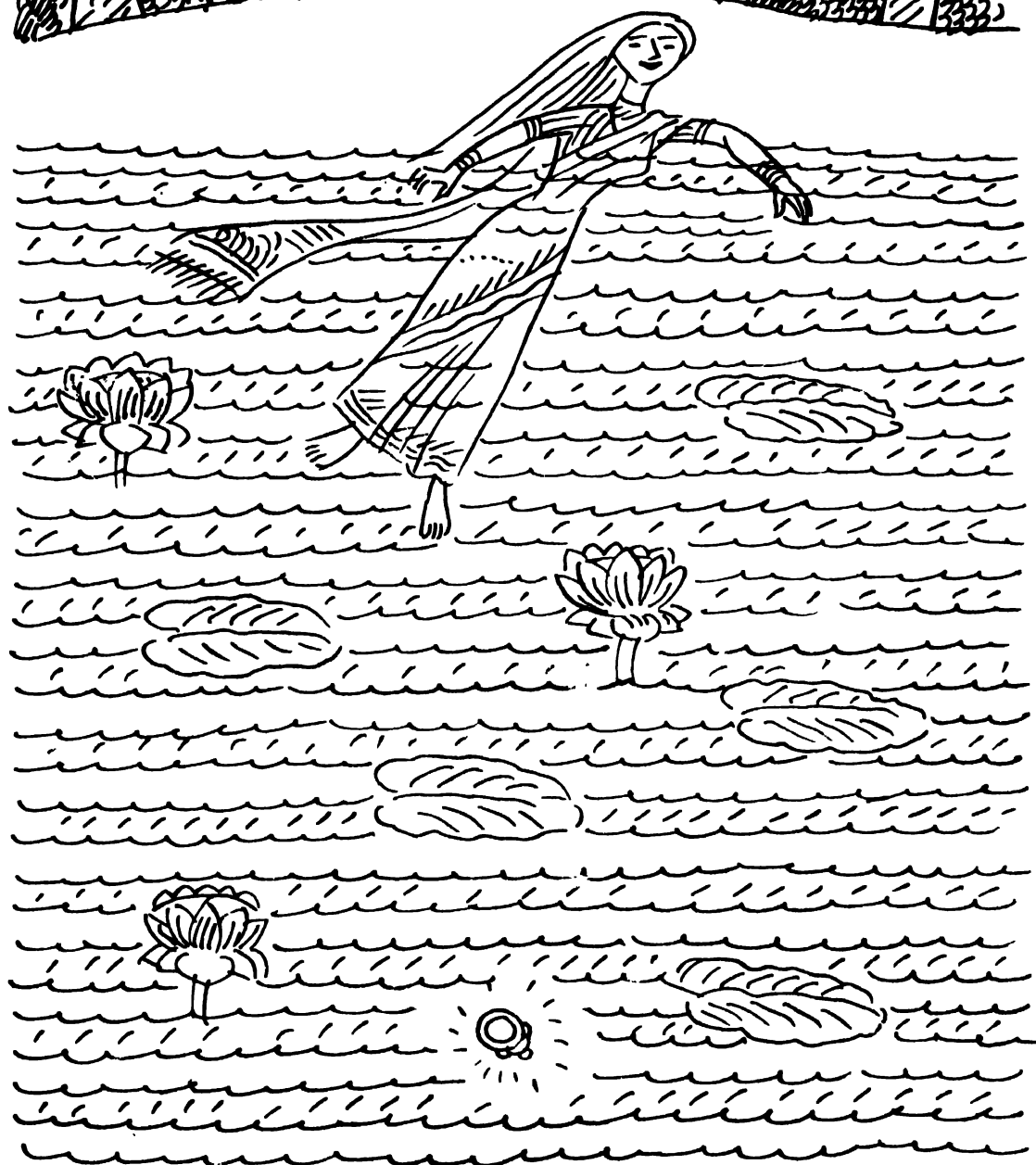
গেল। সেইসময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা, বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাত মহল বাড়ি, তার এক-এক মহলে এক-একরকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা—সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির—সেখানে সোনার দেয়ালে মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথিশালা—সেখানে সোনার থালায় দু-সন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা—সেখানে নাচ চলছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সংগীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণদুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়-বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কী চাও? টাকাকড়ি চাও, না, ঘরবাড়ি চাও? কী চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘরবাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, একী কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘরবাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সেকী কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজা, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুনগুন গল্প করছিলাম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলাম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!—শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজা, তুমি কত দিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে

কত দিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা-রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জবনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সেকথা কি ভুলে গেলে?

'যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন,—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাত রাজার ধন এক মানিকের বরন আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

'মাগো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেইসময় শকুন্তলার সেই পাষাণী-মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকুট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকুট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোলভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ে া।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রুপোলি রঙের সরলপুঁটি, চাঁদের মতো পায়রাচাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাঁড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁঠাভরা বাটা, কত কী জালে পড়ল। সোনালি-রুপোলি মাছে নদীর পাড়, মাছের ঝুড়ি, যেন সোনায়-রুপোয় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল; জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে -দীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এপার ওপার দু-পার জুড়ে জলে পড়ল! সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলেপাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে।

যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড়ো মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাত রাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিকরে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরিব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি স্যাকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর-আংটি দেখে স্যাকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বকশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকুন্তলা!—হা শকুন্তলা!'

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, অন্তঃপুরে সুখ নেই—কোথাও সুখ নেই।

সংগীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর-একদিকে জগতের রাজা, রাজা দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরছেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকুট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনই বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়োই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।
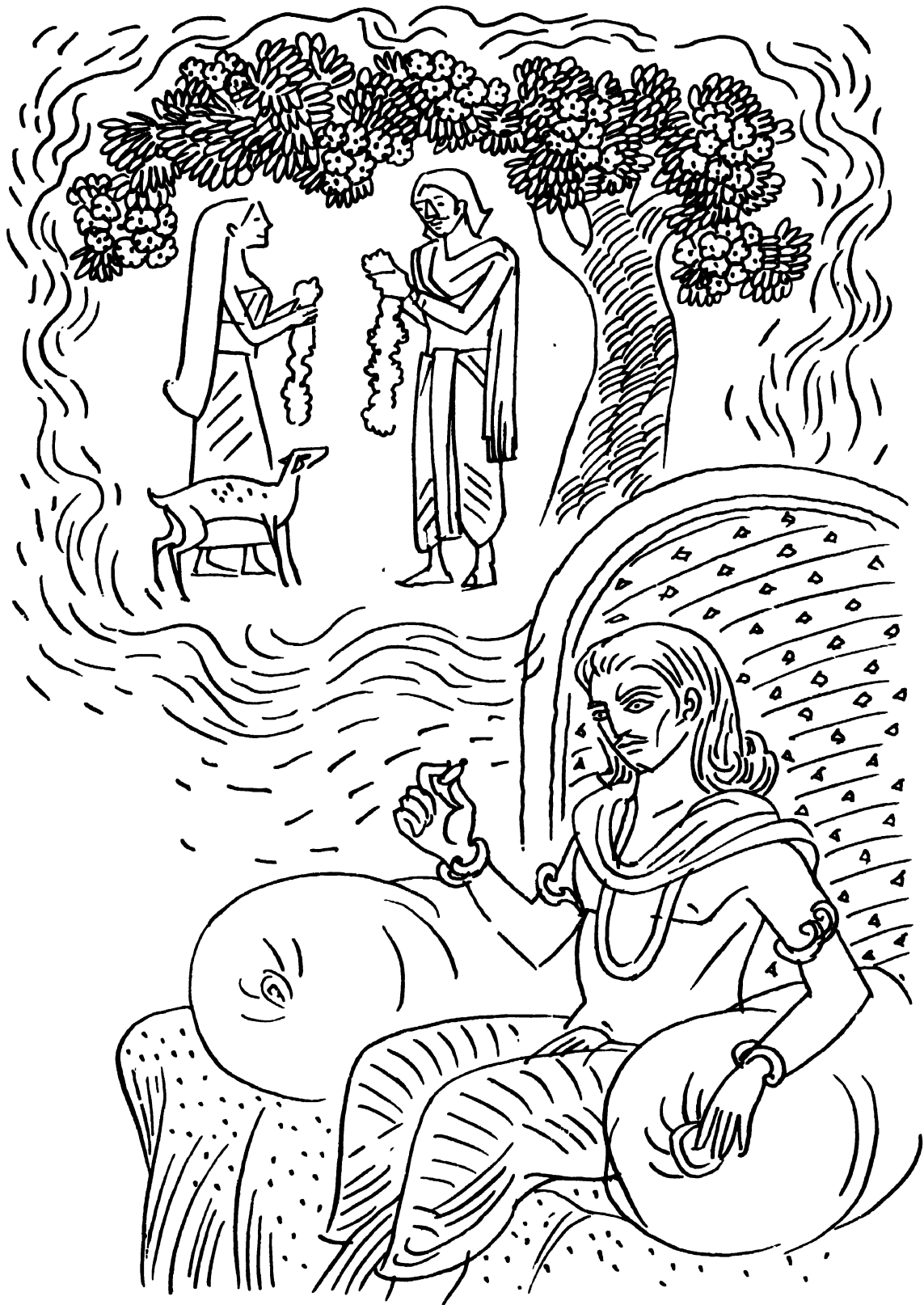
হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তার রাজসিংহাসন। দু-দিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল—শুকপাখি তার প্রিয় সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে-পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র। ভাবছেন— পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজা-রানিতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ-অদিতিকে প্রণাম করে রাজা-রানি রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজা-রানি সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস-তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

নালক

দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক — সে একটি ছোটো ছেলে — ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার গঙ্গা-ওপার গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল — ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে — একটু, একটু, আরও একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল — পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে — এদিক-সেদিক, এধার-ওধার সেধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি! আকাশ জুড়ে কে যেন সাত রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন, 'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেকো।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তরমুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি।

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানি মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরও ওধারে — অনেক দূরে হিমালয় পর্বত — সাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক সাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কী চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটো দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানি স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবতখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসিতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানির পোষা ময়ূর ছাদে এসে উড়ে বসল, সোনার খাঁচায় শুক-শারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরি এসে 'জয় রানিমা!' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানির স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল।

কপালে রক্তচন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলি, সকালে সূর্যের মতো রাজা

শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর— সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর — শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল — ঢাল-খাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুই দিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আর-একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারি—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নীচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারই উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি হাতে, পুঁথি খুলে রানির স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারও মাথায় পাকা চুল, কারও মাথায় টাক, কারও বা ঝুঁটি বাঁধা, কারও বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক-এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানির স্বপ্নের ফল গুনে বলছেন :

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান-গুনবান রাজাধীরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎদুর্লভ এবং জীবের দুঃখধারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ করো।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল— 'আনন্দ করো, আনন্দ করো! অন্নদান করো, বস্ত্রদান করো, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান করো।' কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানির দেওয়া ভোটকম্বল, দাস-দাসী দীন-দুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলি আনন্দে দুলতে থাকল। প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলই গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া ঠান্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শালগাছ, তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুরপাড়ে, গাছের তলায়— কোনোখানে কোনো কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর-এক পারে রুপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষ কোটি তারায় আর সন্ধিপুজোর শাঁখ-ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগান বেড়াতে এলেন; রানিকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায় ছায়ায় চলে-ফিরে, রানি এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক

তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা। ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপা ফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর-এক চাঁদ। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন— যেন পদ্মফুলের উপর একফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠল। পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোধন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাস-দাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে ঘরে শাঁখ-ঘণ্টা, পাতালের তলে তলে, জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত পা চলে যাচ্ছেন! সুন্দর পা দু-খানি যেখানে যেখানে পড়ল, সেখানে সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত সমুদ্রের জল এনে সেই সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝিরঝির করে ঢালতে লাগল।

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানবে মিলে সেই সাত পদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন, 'দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল, বাড়ি চল!'

মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল, 'ছেড়ে দাও মা, তারপর কী হল দেখি। একটিবার ছাড়ো। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।'

সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!' আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ! নালককে তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন, 'ওকাস অহং ভন্তে।' নালক পড়ে যাচ্ছে—'ভন্তে।' গুরু বলছেন, 'লেখ, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।' নালক বড়ো বড়ো করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—'সীলং দেথ মে ভন্তে।' কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই! তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে।

পাঠশালার খোড়ো ঘরের জানলা দিয়ে একটা তিন্তিড়ি গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটা এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুবকুব করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভনভন করে উড়ে বেড়ায়—একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেইদিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময়ে গুরু বলে ওঠেন, 'লেখ রে লেখ!' অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খসখস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কী কষ্টে আছে তা সে-ই জানে! হাত চলছে না, তবু পাততাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর

মাথা দুলিয়ে পুবে-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে-মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে, আমাদের গ্রামখানা ওই পাঠশালার খোড়ো চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙেচুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরে-বাইরে বাতাস শনশন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে মনে ডাকতে থাকে—ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক! ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনোদিন কপাটও খোলে না, দেয়ালও পড়ে না—যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুনছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন... 'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়!'

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুই ধারে মাঠে মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্‌বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে--কেউ পসরা-মাথায়, কেউ ধানখেত নিড়োতে, কেউ-বা সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দলবেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে... 'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়!'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা একটুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।' মায়ের কোলে ছেলে শুনছে—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন, 'ওরে নোমো কর, নোমো কর।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে—নমো নমো নমো। রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেইসময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপর পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন 'সুখী হও, মুক্ত হও।'

ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঋষিকে বলছেন—'নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বললেন, 'দুঃখ কোরো না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরো না; এসো, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

'কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্‌গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।'

নির্মল আকাশের নীচে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন।

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা! গাছের নীচে দেবলঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতে ত্রিশূল ঝকঝক করছে।

নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশত্থপাতায়, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিকঝিক করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারও মুখে কোনো কথা নেই কেবল এক-একবার দেবলঋষি বলছেন—'তার পরে?' আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে :

'রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার-চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্বা, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

'পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন—রাজপুত্রের নাম হল কী?

'ব্রাহ্মণেরা বলছেন—এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেই জন্য এঁর নাম রইল সিদ্ধার্থ; রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেই জন্য এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

'রাজা বলছেন—কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা করে বলছেন! প্রথমে শ্রীরাম আচার্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন ঠিক বলা কঠিন, দুই দিকেই সমান টানা দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বলছেন—দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বলছেন—হ্যাঁ-ও বটে, না-ও বটে। শ্রীমন্তিন দুই দিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ওই কথা। ভোজ দুই চোখ পাকল করে বলছেন—এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বলছেন—দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোটো অথচ বিদ্যায় সকলের বড়ো কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনোদিকেই যাবেন না স্থির নিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারি পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।'

সন্ন্যাসীর দল হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে।

আর কিছু দেখা যায় না! সেদিন থেকে নালক যখনই ধ্যান করে তখনই দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝকঝক করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার ইটে-বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মনপাখি উড়ে উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক —যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে; শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়; আবার বসন্তে যখন ফুলে ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে ফুটে পড়তে থাকে — তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দেয়ালে ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে— এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন— সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে, বসন্তের পহরে পহরে—কখনো কোকিলের কুহু, কখনো বাতাসের হু হু, কখনো-বা বিষ্টির ঝরঝর, শীতের থরথর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে — বাহিরে এসো, বাহিরে এসো, নিস্তার করো, নিস্তার করো! ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে-তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধসিয়ে গেল। আনন্দ — সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো — এই আছে এই নেই; সুখ — সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন—সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল — সে ও তা চিরদিন থাকে না! হায় রে, সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিন-রাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে— তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেকো না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেলো, বাহিরে এসো— নিস্তার করো! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য অকুলিবিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনো বিষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনো ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে; আলো হয়ে ডাকছে — এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে — নিস্তার করো! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে — সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে— জগৎসংসারে হাসি-কান্না, জীবন-মরণ — রাতে-দিনে মাসে মাসে বছরে বছরে নানাভাবে নানাদিকে।

একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে — কী তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে

হাজার হাঁস ডেকে চলেছে— চল, চল, চল রে চল! আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে সাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে— পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তির বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশ দিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—তিরে বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ—সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা, সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তিরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে— সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে, বাজতে লাগল— কান্না আর কান্না। বুক ফেটে কান্না! দিনে-রাতে, যেতে-আসতে, চলতে-ফিরতে, সুখের মাঝে, শান্তির মাঝে, কাজেকর্মে আমোদ-আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন— কান্না আর কান্না! জগৎজোড়া কান্না! ছোটোর ছোটো তার কান্না, বড়োর বড়ো তাদেরও কান্না।

দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে বনে পাখিরা, গ্রামে গ্রামে চাষিরা ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন— আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়—সকলই আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে ঘরে আনন্দ ছেলেমেয়ের হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন খেলনায় ঝিকঝিক করছে, ঝুমঝুম বাজছে; আনন্দ— পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েছে— লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে-পথে — যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে— আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে— পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ— ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না।

এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক-খানা হাড়! বয়সের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়ছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে; কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না—কেবল দু-খানা পোড়া কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটিগুটি, একা! তার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলেমেয়ে-বন্ধুবান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার

কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ-শোক, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে — একা; এক দিকে — আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে, গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে, 'আমাকে দেখো, আমি জরা, আমার হাতে কারও নিস্তার নেই— আমি সব শুকিয়ে দিই, ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখো হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না!' দশ দিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল — নতুন যা-কিছু পুরনো হয়ে গেল, টাটকা যা-কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন — পাহাড় ধসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে, সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে — তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে সাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে পায়ে গুটিগুটি—অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা—সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে সব শুষে নিয়ে সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর-একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ — সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণদুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠান্ডা হয়ে গায়ে লাগছে —সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল-ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ-জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনে-বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে—কানের কাছে, প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে—খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোর নীচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠান্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠান্ডা আলো-ছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুরফুরে দখিন বাতাস — জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাহিরে—সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনে পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে — সারিগানের তালে তালে সুখসাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়ছে, সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে, অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে, সুখে রয়েছে, শান্তিতে রয়েছে।

এমন সময় পর্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে—সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাঙাশ মূর্তি—জ্বরে জর্জর, রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না—ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে, কখনো-বা গায়ের জ্বালায় সে জল-জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাঙাশ, হিম-অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত

পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিভে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা, সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো-কাদা-মাখা জ্বরের সেই পাঙাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে— কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে— ধ্বক, ধ্বক! তারই তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে, একবার জ্বলছে, বাতাস একবার আসছে, একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনও তিনি শুনছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায় পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধ্বক, ধ্বক!

এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে—অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই-বাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখাল ছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিন গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশপিদিম, যাদের ঘর নেই, দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসীতলায় দুগ্‌গোপিদিম — যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনদের পাশে, বন্ধুবান্ধবের মাঝখানে। ভিখারি যে সে-ও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে—'এল মা ওমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা-দুয়ারে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে। শূন্য প্রাণ, খালি বুক, ভরে উঠছে আজ ফিরে পাওয়া সুরে, বুকে পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে পাওয়া সুরে!

সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে পারে। ভরা নদীর মতো ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোনখানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলেছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোন এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খনখন করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে, আছে, দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুকফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরে বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল—সে কান্না! সিদ্ধার্থ সুখের

স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে। পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই পহরে জলে-স্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন সাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না—কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা জুড়ে জলে ভরা কালো মেঘ, কাঁদো কাঁদো দু-খানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে চোখের জলের মতো। বৃষ্টির এক-একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর! তারই মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—সাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যেদিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে—ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে-ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক-একটা দমকা বাতাসে রাশি রাশি ছাই উড়ে এসে সেই মরণপথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল সাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরন পাঙাশ করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব-জ্বালানো, সব-পোড়ানো গরম ছাই! আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ — সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা কিছু যত কিছু সব ছাইভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে দূরে দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা মেঘের মতো। তারই তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে—হায় হায় হায় রে হায়! সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিন-রাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রং বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কত দূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচু-নিচু ছোটো-বড়ো সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটি পাখি উড়ে চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কী আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; সাদা বরফে, হিম-কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম-

কুয়াশায় সাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ-গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে রঙে ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা দেবে না? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না-রাত্রি না-দিন, না-আলো না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পর্দা : তারই ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—সাদা চুল নিয়ে, জ্বর কাঁপছে—পাণ্ডাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মতো হিম-সাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, সাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো, সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎসংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন—জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্তমাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা—তিনটে শিকারি কুকুরের মতো ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দাঁতে নখে যা কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—আগড় ভেঙে, শিকড় ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা ছোটো-বড়ো সব উড়ে চলছে, ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিবে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না! আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়! জলে-স্থলে, ঘরে-বাইরে, হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলিবিকুলি করছে। হাজার হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলই শব্দ উঠছে রক্ষা করো! নিস্তার করো! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে। এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন আছে যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথায় যেন উত্তর দিয়ে আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে শব্দ উঠল—বিদ্ধা মহিদ্ধিকা—মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকসস্ লোকসস্ সব্বে এসে পরায়না—

দীপা, নাথা, পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু, মহাস্সাসা, সরণা চ হিতেসিনো॥
মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা॥

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভু, মহাতেজ, মহাজ্ঞানী, মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর,

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে সবুজে পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে-গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে—সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাত রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন—সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ!

যেমন আর দিন, সেদিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে, সেই মায়াজালে ঘেরা সোনার স্বপনে মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে কত অজানা দেশের পথে পথে—একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রানি যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দগান, কপিলাবাস্তুর ঘরে ঘরে সাত রঙের আলোর মালা—কিছুতেই আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—সে রইল না, সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব। আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ—তার মন যেদিকে গেছে।

সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন, 'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন—অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল — কপিলবাস্তুর রাজপুরী, সামনে দেখা গেল —পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

ছন্দক চলেছে, কপিলবাস্তুর দিকে, সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে—দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোটো নদী—দেখতে এতটুকু, নামটিও তার নমা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ-বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পার থেকে নামলেন সে পারে ভাঙনজমি— সেখানে ঘাট নেই, কেবল

পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে গাছে ছায়া-করা পথ। সবুজ ঘাস বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল—বালি ধুয়ে ঝিরঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোটো একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।

নদী—সে ঘুরে ঘুরে চলেছে আম-কাঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোটো ছোটো পাহাড়ের গা ঘেঁষে—কখনো পুবমুখে, কখনো দক্ষিণমুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে ধারে ছাওয়ায় ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জাম গাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে; তারই তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশো চেলা নিয়ে আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কীসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না।

তিনি আবার চললেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর! মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে—নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনোদিন সে নগরে আসেনি! যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারও ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে দেখতে। কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না। রাজপথের এপার থেকে ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানি চাচ্ছে দোকান লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারি চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারি সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে—ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনও লোকের মন ভরেনি! তারা মণিমুক্তো সোনা-রুপো ফুল-ফল চাল-ডাল স্তূপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা-প্রজা ছোটো-বড়ো—সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে দ্বারে পথে পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমনি ভিক্ষে কেউ কোনোদিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনা-রুপো বসন-ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য কেবল একমুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের যত দীন-দুঃখীকে বিতরণ করে গেলেন।

উদরক পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালীপাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ

কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন, 'দুঃখ যায় কীসে?'

উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন, 'এসো, তুমি-আমি দু-জনে একটা বড়োগোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখো, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে ভারে মন্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে।

সিদ্ধার্থ গ্রামের পথে ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুণে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন।

কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা—শীতে-গ্রীষ্মে বর্ষায়-বাদলে অনশনে-একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর একবিন্দু রক্ত রইল না—দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কি না!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ, কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে-একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না—যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনি করে অনেক দিন কেটে গেছে। সেদিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল, উরাইল বনে যত পাখি, যত প্রজাপতি, যত হরিণ, যত ময়ূর সব যেন আজ কীসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারা বেলা ধরে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে—বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষবেলার সিঁদুর-আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া বসনের মতো।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠান্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণভরে একবার নেচে নিচ্ছে। সেইসময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন—এতদিন পরে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চললেন। শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। সিদ্ধার্থ তারই একটা ডাল ধরে আস্তে আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চললেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে

তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কীসে জানতে পারলেন কি?' সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না—এখনও না।' অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন, 'প্রভু, তবে আর একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন — দুঃখের শেষ আছে কি না।'

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—'নারে! নারে! নাইরে নাই!'

কৌণ্ডিন্য বললেন, 'জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু?' সিদ্ধার্থ বললেন, 'পথের সন্ধান এখনও পাইনি, কিন্তু দেখো তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে. তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীরকে সবল রাখো, মনকে সতেজ রাখো। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর-মনকে বেশি আরামও দেবে না, বেশি কষ্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর-মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারকে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজে না, তেমনি শরীর-মনকে আরামে-আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর-মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য-বিলাসে তাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই—মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।'

সেদিন থেকে শিষ্যেরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাইমাখা, আসন বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধুনি-ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনোমতো হল না।

তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে , শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে—কখনো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে, কখনো হেঁটমুণ্ড হয়ে দুই পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটি ফুল, তারপর সারাদিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে একফোঁটা জল, তারপর তা-ও নয়—এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড়ো ঋষির সন্ধানে।

শিষ্যেরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারী নির্জন। ঘন ঘন শালবন সেখানটা দিন-রাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড়ো একটা আসে না; দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শালপাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোটো রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোটা মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর

ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে, তখন কোনো-কোনোদিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া কাপড় পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো-কোনোদিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছের তলা আলো করে সোনার কাপড় পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন! কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনোদিন দেখেনি—পুন্না ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বট-গাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছায়ার মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনো-বা সে গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই বেদির উপরে বসেছেন!

আজ শীতের ক-মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ-কথা সে সুজাতাকে বলেছিল — আর কাউকে না। সুজাতা সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনোদিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কী কথা কন তবে যেন পুন্না বলে—দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে আমার বাবাকে আমার ছোটো ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভালো রেখো। বড়ো হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি করে ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠান্ডা পাথরের বেদির উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেলবেলার সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে-মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোটো-ছোটো গ্রামগুলি! মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ির সাদা পাড়ের মতো, সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলিবাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠান্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ—একটার পিঠে মস্ত একগাছ লাঠি হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে

চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে—'আরে রে পুন্না রে'! ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেইদিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের পর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না দু-জনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া বসন পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদিটিতে!

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গোরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে, 'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি, আমি দু-জনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন, 'যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক — এই বুঝি?

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোটো ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এক কোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গোরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় গোরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাতে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এক কোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপর চাপিয়ে দিলে—দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন, 'তুই গোটাকতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক! পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা, চলো, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পুজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন, 'ওরে, সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু

এর মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরই মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিং পাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পুজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠান্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনও বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদির উপর বিছিয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে ধোওয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পাথরের বেদিতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ দেখবই দেখব—সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তখন মার—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায়, কুকর্ম করায়—সেই মার-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার শব্দে বুদ্ধের দিকে।

চারিদিকে আজ মার-এর দলবল জেগে উঠেছে। তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধুলা—জল-স্থল-আকাশের দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পরদা টেনে দিয়েছে—মার! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্তবৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে নিবে যাচ্ছে।

আকাশকে এক হাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, মার আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর—যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তলোয়ার, মাথার মুকুটে দুলছে মার-এর প্রকাণ্ড একটা রক্তমণির দুল, তার কানে দুলছে মোহনকুণ্ডল, তার বুকের উপরে জ্বলছে অনলমাল—আগুনের সুতোয় গাঁথা।

বুক ফুলিয়ে মার সিদ্ধার্থকে বলছে—'বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা! উত্তিষ্ঠ—ওঠো! কামেশ্বরোহস্মি—আমি মার। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহ্যবিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব—ওঠো চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা কোরো না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকো, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ করো; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কী লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারও সাধ্যে নেই।'

সিদ্ধার্থ মার-কে বললেন—'হে-মার! আমি জন্ম জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি—তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এ প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার মার বললে—'উত্তিষ্ঠ —ওঠো, চলে যাও, তপস্যা রাখো!' তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন—'না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুংকার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে মার! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল! মার সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মতো দু-পাটি সাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠছে; আর হুংকার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে মার-এর দল; চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশ দিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—মার-এর দল ঘূর্ণিবাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো! পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বনবন শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো; লক্ষ লক্ষ খ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে মার-সৈন্য, বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা আঁজলা আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদির আশেপাশে। উরাইল বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমনকী, ঘাসগুলিও জ্বলে উঠেছে; জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনমাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শানিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘূর্ণিবাতাসে ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে মার ডাকছে—'হান! হান!'

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ মার-এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'। তার ধুলোমাখা কটা চুল

বাতাসে উড়ছে—আকাশজোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে-দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থরথর কাঁপছে। মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন-উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎজুড়ে উঠেছে মারীর আর্তনাদ, মার-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংসপোড়া বিকট গন্ধ!

তখন রাত এক-প্রহর। মার-এর দল, মারীর দল উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্ত-আঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা-হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে—যেন দু-খানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে! মার দু-হাতে দুটো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে—'পালাও, পালাও, এখনও বলছি তপস্যা রাখো!' বুদ্ধদেব মার-এর দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না! মার-এর মেয়ে 'কামনা' তার ছোটো দুই বোন 'ছলা-কলা'কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাতজোড় করে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে মার-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ—সেই মার-এর দর্প চূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! মার আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদির একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে মার এক দণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই! দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে মার আস্তে আস্তে পালিয়ে গেছে — নরকের নীচে, ঘোর অন্ধকারে চারিদিক কালো করে দিয়ে! বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন ধ্যান ধরে প্রহরের পর প্রহর।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু মার-এর ভয়ে তখনও পৃথিবী এক-একবার কেঁপে উঠছে — চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না। সেইসময় ধ্যান ভেঙে মার-কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাত রঙের আলো। সেই আলোতে জগৎসংসার আনন্দে জয় জয় দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। তাঁর পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি দুই কূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারালো খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নীচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড়ো বড়ো সব গুহাগর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাহাড়ের উপরে সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরই গাছে গাছে ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা

একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান; দিন-রাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তারা আর বার হন না। দেবলঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক-মাস ধরে রয়েছেন!

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না, রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনও আষঢ়ন্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুলো তখনও আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোটো-ছোটো সবুজ পাখিগুলি এখনও যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা সাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলই নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে—সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টানছে—সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে! সেই তেঁতুলগাছের ছায়া-করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলই যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে।

দেবলঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে! আজ সে কত বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে— যায় কি না যায়। সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে—'যাবে গো! যাবে গো!' বলে ডেকে গেল! সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোটো নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে — অনেক দূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে — জলে একটি ছোটো পিদিম ঝিকঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না। নালক মনে মনে দেবলঋষিকে প্রণাম করে বলছে—'ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।'

দেখতে দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোটো নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সেসময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর-একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশ-বিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ে যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে। পুরনো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নূতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তিরের মতো জল কেটে, কখনো-বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটু আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমনকী অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চর সব ডুবিয়ে দিয়েছে!

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাঁশঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থইথই করছে জল! খালবিল খানাখন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে বর্ষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝনদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সে ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক — সে মনে পড়ে না কত দিন আগে— ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারি দাঁড়িয়ে গাইছে—

'এরে ভিখারি সাজায়ে তুমি কী রঙ্গ করিলে!'

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেইসময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের এক ধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্র-কন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনই আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্যমন্দিরে সূর্য-পুরোহিত তেজস্বী ব্রাহ্মণ বড়োই একাকী, বড়োই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষসরাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন। আর মনে মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহু কষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল—পরনে ছিন্নবাস, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কী চাও?' তখন সেই ব্রাহ্মণবালিকা কমলকলির মতো ছোটো দুইখানি হাত জোড় করে বললে, 'প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণকন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মা-ও নেই, আমায় আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ বললেন, 'আরে অনাথিনি, এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন!'

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—'হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু করো, আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পূজা করলাম, আজ শেষ দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার সেবাদাসী! হে আমার প্রিয় ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারতেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে—আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেইদিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোটো প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন, 'পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি করুন।' ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন, 'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই। নতুন প্রদীপ তুলে রাখো, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি হবে।' সেই দিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেইসময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন— যে মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার আরতি শেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল—সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন! সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোটো পাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোটো-বড়ো ছেলেমেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটি পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল—চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন—সেইসময় একদিন খুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা-শ্রাবণে একা বসে বসে বাপ-মায়ের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন; আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'হায় এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।' হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো কালো দুটি বড়ো বড়ো চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে—চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির—কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে

অনাথিনি, অভাগিনি সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন! সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুটি বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কী জানি কী মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহু দূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দু-হাতে মুখ ঢেকে বললেন, 'হে দেব, রক্ষা করো, ক্ষমা করো, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!' সূর্যদেব বললেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা করো!' বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন, 'প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনি, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক!' সূর্যদেব বললেন, 'বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা করো!' তখন সুভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি! ছেলেটি তোমারই মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী।'

সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তার সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোটো পাখি কী সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকালবেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলে-মেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বর সফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দু-জনের নাম দিলেন, গায়েব-গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন; তখন পুবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড়ো হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেইসময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত-দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনই শিষ্ট-শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোটো ছোটো মেয়ে সেধে সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার

সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে — গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়ো; এসো আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তা হলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুশিতে সেইসকল ছোটো ছোটো ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময়ে একটি খুব ছোটো ছেলে বলে উঠল, 'আমি রাজার পূজারি। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটিকা দেব।' তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোটো ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে, 'গায়েব তোমার নাম জানি, বলো তোমার মায়ের নাম কী? বাপের নাম কী?' গায়েব বললেন, 'আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী — মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম — কী?' গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়চাপড়ে ছোটো ছেলেদের ফোলা গাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোটো প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেইসঙ্গে সূর্যদেবের মূর্তি-আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বললেন, 'আরে উন্মাদ, কী করলি? সূর্যদেবের মঙ্গল-আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?' গায়েব বললেন, 'দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে; বলো, আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।' যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল — কী জানি কী করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বললেন, 'বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্যদেবের অপমান করিসনে; পিতার নামে কী কাজ? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কীসের অভাব?' গায়েব তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য; অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারির অধম?' কথাগুলো তিরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে মনে ভাবলেন — হায় ভগবান, কী করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কী বলে প্রবোধ দিই? গায়েব-গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, একথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার স্মরণ হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে, দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু — এই কচি বয়সে গায়েব-গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে — তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বললেন, 'বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।' গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বললেন, 'তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখনই তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না।' সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বললে, 'ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?' গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে

দিলেন। সুভাগা দু-জনের হাত ধরে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু-ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সূর্যদেব দর্শন দিলেন — সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বললেন, 'প্রভু গায়েব-গায়েবী কার সন্তান?' সূর্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিনি সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল, 'মা, মা!' গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা কোথায়?' সূর্যদেব কোনোই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন! গায়েব বুঝলেন মা আর নেই। রাগে-দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি-আঁকা পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুড়ে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল — সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্ছিত হলেন!

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সূর্যদেব কোথায়?' গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বলল, 'ওই নাও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্যবংশ নাম দিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ। যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা-হাতে পৃথিবী জয় করে এসো।' গায়েব বললেন, 'তোকে কোথা রেখে যাব বোন?' গায়েবী বললে, 'ভাই, আমাকে এই মন্দিরে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেয়ো।'

গায়েব মহা-আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মা রে! ভাই রে!' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেইসময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝনঝন শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মন কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননির পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নীচে চলে যেতে লাগল! গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—কাচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাই রে!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে, গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশ-বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে-বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনোদিকে সাড়াশব্দ নেই, পায়ের ধারে চামরধারিনি চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে

সোনার প্রদীপ নিভ নিভ হয়েছে, সেইসময় শিলাদিত্য তাঁর ছোটো বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হল, যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে : আর সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে, 'ভাই রে, ভাই রে, ভাই রে!'

শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন ভীমের বর্ম-দু-খানার মতো মন্দিরের দু-খানা কপাট একেবারে বন্ধ—কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন—দিনের আলো পেয়ে একঝাঁক বাদুড় ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পরদার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন, 'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল, 'হায় গায়েবী! কোথা গায়েবী!' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন—উত্তরদিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপর জেগে আছে। যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাইবোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতিপ্রদীপ ছিল, সেসকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'গায়েবি! গায়েবি!' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরের । ঘুরে-ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেইদিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে মন্দিরে আর অন্য মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনি রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনই কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন; তখনই তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, সবচেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনই রইল! শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজরথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায় ঢাকা ছোটোখাটো পাখির বাসাটি যেমন , গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনই সুন্দর, তেমনই মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানি পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানি পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানির ছেলে হলে দু-জনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধে বাদ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তির তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নীচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোটো শ্বেতপাথরের বারান্ডা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজে রেশমে, সবুজ ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হালকা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব; তারপর দু-জনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানি মেঘের মতো সাদা শ্বেতপাথরের সেই বারান্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহু দূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকমক করে উঠত; তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারান্ডায় রাজরানি পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তিরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত।

যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারান্ডায় মহারাজার সেই চিঠি হাতে বসে থাকতেন।

সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে, কোনো রাখাল-বালক পাহাড়ের নীচে ছাগল চরাতে চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারও হাতে একছড়া পান্নার চিক, কারও হাতে-বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্বাদ করতে করতে সেইসকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারানি পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন—কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেইসঙ্গে রাখালবালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত! তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন; আর মনে মনে বলতেন, 'হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয় ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো। ভগবতী, আমার যে ছেলে হবে, সে যেন মহারাজেরই মতো তেজস্বী হয়, তাঁরই মতো যেন নিজের রানিকে খুব ভালোবাসে।' হায় মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড়ো সাধ ছিল—সেই শ্বেতপাথরের বারান্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন—তাঁর যে বড়ো সাধ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানি পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রুপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নীচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড়ো হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেলল।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝি-বা সেখানে সর্বনাশ ঘটল!' রাজরানি বললেন, 'আর কটা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক।' পুষ্পবতী বললেন, 'না, না, না, মা!'

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর, আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমি-মোড়া একখানি ছোটো ডুলি, বড়ো রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই। বিধর্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখে একফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধুধু করতে লাগল; তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হিরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির

সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানির কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রানি পুষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয় সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড়ো সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন, 'প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো। তোমায় আর কী বলব ভাই? দেখো, রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে! আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই একমুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিয়ো— যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানি, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন! দেখতে দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল — 'জয় মহারানির জয়! জয় সতীর জয়!' কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই-মুঠো এক হাতে নিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রবতীর রাজরানি অনেকবার গোহকে চন্দ্রবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত, বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁরা বলতেন, 'আমাদের মহারানি আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন! এই তাঁর রাজপ্রাসাদ!'

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন।

কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে, বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, কোনোদিন ভীলদের সঙ্গে ভীলবালকের মতো, কোনোদিন-বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কখনো-বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন!

মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝরঝর, আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেইসকল অন্ধকার বনে বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোটো একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেইসকল ভীল বালকদের সঙ্গে ভীল-রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম হাতে বাঘের ছাল পরা হাজার হাজার ভীল বালক, ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে 'আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!' বলে, মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে

লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন, 'হাঁ রে, কোথায় রে তোদের নতুন রাজা?' ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন, 'ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে।' তখন একজন ভীল বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজতিলক টেনে দিল, ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য কারও নেই।

গোহ সত্য সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়ো রাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নীচে একখানি ছোটো পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীন-দুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-করা কালো বাঘের মতো কালো ছেলে; কিন্তু হায়, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল! সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল।

ভীলরাজের এক ছোটো ভাই ছিলেন। দশ বৎসর আগে একদিন কী জানি কী নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোটো ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন, রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন, 'এ রে ভাইয়া! বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হয়েছিস? বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হল না, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়েয় বসালি কী বলে।' মাণ্ডলিক বললেন—'ভাইজি, ঠান্ডা হ।' ভাই-রাজ বললেন—'ঠান্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।' এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বললেন, 'দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।' তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সরদারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল সরদার বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে গোহকে রক্ষা করে—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ-আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কী ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপিচুপি গিয়ে বললেন—'গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।' গোহ কোমর থেকে নিজের নাম-লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, দূরে দূরে দু-একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুবি হাতে রাতদুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন—কারও সাড়াশব্দ নেই! ভীলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন, তাঁর ছোটো ভাই সামান্য ভীলের মতো মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল; তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মতো ছোটো ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না! মনে ভাবলেন আমি কী

নিষ্ঠুর! হায়, ছোটো ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি!

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন, 'ভাইয়া!' একবার ডাকলেন, দু-বার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন, 'ভাইয়া।' কোনোই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোটো ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভাইয়া রাগ করেছিস? ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব; তুই উঠে বস, কথা ক! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি! কেন আমার কাছে কাছে চোখে-চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালোবেসেছি? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না; সেসময়ে গোহ আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল! ভাই ওঠ আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি, এই নে ছুরিখানা—আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক।'

মাণ্ডলিক ভায়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন। ধারালো ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল—বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন, ছোটো ভাইয়ের গা-টা যেন বড়োই ঠান্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিশ্বাসের শব্দ নেই! তিনি 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপরে গিয়ে পড়ল। গোহ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোটো ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীল-রাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে-দুঃখে বুক ফেটে মারা পড়ত? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোটো ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন; কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনই সেই ভীল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণখানি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সেঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি-হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—'গোহ রে তুই কী করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি; গোহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?' হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল, 'আহা কী সুন্দর রাজা দেখেছিস ভাই!' আর-একজন বললে, 'নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপারা দেখলুম।' মাণ্ডলিক নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায়, এরই মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেইসময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—'ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীল-রাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?' অন্যজন বললে, 'গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন বুড়ো বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।' মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসি মুখে মনে মনে বললেন—'ধন্য গোহ! ধন্য তার ভালোবাসা।' হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোটো

ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারি কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি 'ভাই রে!' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি শিকারি কুকুরের দাঁতের মতো ভীলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল — পাহাড়ে পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল — হায় হায়, হায় হায়, হায় হায় হায়!

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন — ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা ! রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বললেন, 'মহারাজ করেছ কী! আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?' গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে, দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে,সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

হাম্বির

চিতোর তখনও পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনও ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ, সেইসময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারির দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল— শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেক দূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল— সেখানে ঘোড়া চলে না, তির তো ছোটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাশা দেখছিল — পরনে তার পিলা ওড়নি, নীল আঙিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা! দু-জনের চোখ দু-জনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেইসময় বরাহটা মেরে শিকারিদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়সে মারা!'

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে, 'ইসিসে ঘায়েল কিয়া।' তার ধুলো-মাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড়ো শোভা ধরেছিল। তার সুডোল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কি না কে জানে; কিন্তু একসময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল! হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত—তারই মাঝে সেই নীল আঙিয়া, পিলা ওড়নি কৃষকনন্দিনী!

পশ্চিম বাতাসে অড়রের খেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা শেষে দিনের আলো নিবু নিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কালো মেঘের সরু রেখা — রাজকুমার শিকার-শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেখানেই আবার দু-জনে দেখা হল — বালিকা মাথায় দুধের কলসি নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে— সঙ্গে দুটি চিকন - কালো ছানা-ভঁৈষ!

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়—রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ-রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শির দুয়ারে

লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষা হয়েই থাকো।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, 'তোমরা যাই বলো আমি কিন্তু লছমিকে কখনোই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরিবের ঘরে গিন্নি হয়ে থাক সেও ভালো।'

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশিদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানি লিখছেন: 'আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।'

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমির সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধুমেধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বরবেশে যুবরাজ এলেন যেন কোনো স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলা গ্রামে উদয় হলেন—আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমিরানিকে আর এক মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলা গ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানি পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোরলক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলা গ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রানি লছমি, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোটো গ্রাম, আর-একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভীলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চার মাস এখানেই কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক। তারপর পাহাড়ি জাত যখন ক্রমে অধীন হয়ে শত্রুতা ছেড়ে বশ্যতা মানলে তখন আর বড়ো একটা এখানে আসবার প্রয়োজন হত না। ক্বচিৎ দুই-একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙেচুরে বনজঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কী দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইঁদুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট—রাজার ছেলে রাজার বউ মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানি, রাজার ছেলে ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানিমা কোথায় দুই রাজকুমার অজিমসিংহ-সুজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট-সিংহাসন, কিংখাবের সুজনি, জরির চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রুপার প্রদীপ, সোনার বাটা, শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষির মেয়েরা তরিতরকারি, ঘিয়ের মট্‌কি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে দেখতে সাজসরঞ্জামে

কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানির মুখে, দুই রাজপুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনও পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হায়! সূর্য এখনও রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে!'

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝি-বা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল, অর্থবল কোথায়? বড়ো আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ-সুজনসিংহ বড়ো হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে— কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা-রানিতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানিমা এক-একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানিমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারেবারে জানালার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, 'তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?'

'কে জানে প্রাণটা কেমন করছে,' বলে রানিমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানিমা মলিনমুখে ফিরে এসে বললেন, 'এরা যে দু-ভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনও এল না কেন?'

রানা বলে উঠলেন, 'সেকী? এখনও এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?' বলতে বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজা-রানি দেখলেন জনকয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, 'রানিমা, দেখুন গিয়ে বড়োকুমার অজিম বাহাদুরের কী হয়েছে।' বলতে বলতে লোকজনে ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা-রানি শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সরদার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমে লড়াই বাধে। বড়োকুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন।

রানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সুজন সিং কোথায় গেলেন?'

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন, আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!'

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!'

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা-রানি রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য অজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আঘাত সাংঘাতিক।' ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার 'মা' বলে ডাকলেন; তারপর ভাঙা খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণপাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে দুঃখে নিরাশায় দিন দিন ম্রিয়মাণ হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমনকী দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর—প্রজালোককে কে রক্ষা করে? এক দিকে পাঠানের উৎপাত আর-এক দিকে মুঞ্জ ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল — রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কি না সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেইসময় উজলা গ্রাম থেকে লছমি রানি হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়স্বজন দেশের সরদার-সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, হাম্বির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন। হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক, সেই চোখ; দাদার মতো তেমনই সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনই গম্ভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়ো হলে এ-দুটি তাকে দিয়ো।'

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত-সরদারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, পড়ে দেখো, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কী।' পত্রে লেখা ছিল —

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ শ্রীকলিঙ্ক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতু

অতঃপর অজয়সিংহজি ও মেবারের দশ সহস্র অধিকাংশে সামন্ত-সরদার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে—ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠানযুদ্ধ সংকট সমরে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচারমতো ভাইজি অজয়সিংহ একলিঙ্গজির দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানি লছমিও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে উজলা গ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলা গ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমিজমা রানির নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাসমতো দেওয়ানির বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন

লইয়া হাম্বির ও ভাইজির সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সরদার, মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানিতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাঁহারা এই উত্তরাধিকারসূত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সংকট অবস্থা—এ সময়ে গৃহবিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহবিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সংবৎ ১৩৩৩ চিতৈরগড়।

পত্রপাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন কী করা কর্তব্য! রাজ্যের সমস্ত সামন্ত-সরদারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কী হাম্বিরের এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানির ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির করো।

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেইসময় পেটমোটা, নেশায় ঢুলুঢুলু রক্তচক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুই দল হল। একদল বললেন সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেন না রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম? রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দুটোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কী করতে? আমরা তো বলি হম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্য দল বলে উঠল, বাপু হে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুই দলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার জোগাড়।

অজয়সিংহ বললেন, 'তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোনো। তোমরা তো জানো ভীল সরদার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই। সেই রাত্রে ডাকাত এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে; শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুইজনেই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে-মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে; রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছামতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ করো।' কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারী ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন বাহাদুরের ঘুম ছাড়ত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী

না উঠতে উঠতে বড়োকুমার সুজনসিংহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, ছোটো রাজকুমার গেলেন না?'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'তিনি একটু আরাম করছেন। চলো আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।'

অমনি একজন খোশামুদে রাজপারিষদ বলে উঠল, 'চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোটোকুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।' অন্যজন-বা বললে, 'হুঁ, রানার বুড়োবয়সে ভীমরতি ধরেছে। এ কি যার-তার কর্ম? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত — মুঞ্জ ডাকাত! নামে যার দেশসুদ্ধ থরহরিকম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোটোকুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!' ওর মধ্যে কোনো মন্ত্রীপুত্র বলে উঠল, 'না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম! কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা।'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'না হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কী জানো, ছেলেমানুষ, এখনো হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমতো কুস্তি শেখাবার বন্দোবস্ত করছি, দেখো না!'

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরনো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শানপাথরে ঘষে ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলা গ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান পেয়ে অস্তর দু-খানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে বসে অস্তরে শান দিচ্ছেন, এমন সময় লছমি রানি সেখানে এসে বললেন, 'এখানে বসে কী করছিস?'

হাম্বির বললেন, 'জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দু-খানায় শান দিচ্ছি।'

লছমি রানি বললেন, 'হা কপাল! তুমি এখনও অস্তর শান দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজন সিং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোকে কেবল তার মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলেম।'

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়ছিনে।'

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান দিতে লাগলেন। রানিমা বললেন, 'যা যা, বেলা হল — এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দু-খানায় শান দিচ্ছি।' হাম্বির উঠে গেলেন, লছমি রানি বসে-বসে অস্তরে শান দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটার চেয়ে অস্তরে শান দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দু-খানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে-ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানিমা তাঁর হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, এটায় যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকাবাঁকা যেন কীসের দাগ দেখছি! এ-খানায় তো কোনো কাজই হবে না।'

হাম্বির বললেন, 'বলো কী মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কী? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।' হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটায় একদিক থেকে আর-একদিক জুড়ে একটা আঁকাবাঁকা ফাট। ফাট কী রক্তের দাগ চেনা যায় না!

হাম্বির বললেন, 'তাই তো, এটা তো কিছু বোঝা গেল না; ভালো করে দেখতে হবে। মা তুমি অস্তর দু-খানা আমার ঘরে রেখে দিয়ো। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।'

অজয়সিংহ আজ আর সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখে বললেন, 'সেকী, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন!'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।'

অজয়সিংহ বললেন, 'লোকজন তো সব বড়োকুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন করে?'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একজন শিকারির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে-রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা চাই।'

অজয়সিংহ বললেন, 'যা ভালো বোঝো তাই করো। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।' হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমি রানি এসে বললেন, 'কই তোর যাবার কী হল? তোর তো লড়ায়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস!'

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, 'রোসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও! এ কি বুনো শুয়োর, যে যাব আর জনারের শিষে গেঁথে আনব।'

লছমি রানি বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে মনে যেন কী একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে ওই পুরনো তলোয়ার আর দাগি ছোরায় কতদূর কী করো! এখন বল দেখি তোর মতলব কী!' তারপর মায়েতে-ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কী পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয়-হয়, রানি লছমি বললেন, 'তুই তবে প্রস্তুত হ—আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।'

হাম্বির বললেন, 'আর প্রস্তুত কী, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখো তো মা আমার ঘোড়াটা এল কি না।'

রানি উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখা যাক মা, পুরনো তলোয়ার, দাগি ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কী করতে পারি।'

মা আশীর্বাদ করলেন, 'জয়ী হও।'

হাম্বির সেকেলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটরখটর করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দু-হাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর

বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি নদীর পারে পারে, ঘন বনের ধারে ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যেসব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই—দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাম্বির সেই সব মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি—বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখো। আবার ওই যে বাঘের গর্জন ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনোদিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীবজন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন; কিন্তু সকাল হল তো পাখি ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেইসময় যেন দু-জন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল! লোকদুটোর কথা বোঝা গেল না, কিন্তু দু-একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়িতে কথা হচ্ছে, 'ওরে ভাই বদরি, তুই এখনো মুঞ্জু-মুঞ্জু বলিস তাই তো সে চটে যায়।'

'মুঞ্জুকে মুঞ্জু বলব না তো কী? সে কি জানে না যে আমি তার চাচা হলেম?'

'ওরে ভাই, সে কি এখনও চাচা-ফাচা মানে? যো [illegible] থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়ায়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'

'রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।'

'তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই নাচ দেখতে চলেছিস কেন? সরদার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে—তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।'

'ওরে এ কি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।'

লোকদুটো হনহন করে উত্তরমুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুমহুম ঝমঝম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনো খবর নেই। সকলেই বলছে, নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলা গ্রাম থেকে লিখেছেন—তিনি উজলা গ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশোখানা গ্রাম জায়গির দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়! এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, 'দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দু-মুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড়ো তার স্পর্ধা।'

অজয়সিংহ বললেন, 'হাম্বির কি এতদূর নীচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?'

রাজমন্ত্রী বললেন, 'কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কী করে বসে বলা যায় না।'

সুজনসিংহ বললেন, 'তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সরদারকে খবর পাঠানো হোক।'

অজয়সিংহ বললেন, 'তাতে কাজ নেই। এ কি পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সরদারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বলো। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলা গ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পার তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।'

সুজনসিংহ 'যে আজ্ঞে' বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড়ো অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?

অজয়সিংহ বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে!'

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমি রানির সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানিমার অন্দরমহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল—হাম্বিরের পরামর্শমতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলা গ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন। ডাইনে-বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজলা গ্রামের দু-এক পেটমোটা জোতদার আর দু-চার কালো মুশকো পাহাড়ি ভীল।

একজন গরিব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জ রাজা হুকুম দিলেন, 'ওর মাথা কাটো।' অমনি হাম্বির কানে কানে বললেন, 'এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিশ দিতে হুকুম হোক।' অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল. গরিব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে মনে বললে, 'রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সরদার, ওর কি দয়ামায়া আছে?'

এমন সময় কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচপত্র রাজভাণ্ডার

থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভীলরাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচখরচা ও মাসিক ছ-হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জায়গির দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন, চুয়োমল একরারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত— কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, 'এসব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।'

মুঞ্জ বাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের দুই পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জ বাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এ তো বড়ো মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লির বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?'

হাম্বির বললেন, 'আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লি পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁকজমকটা দেখে যাক।'

মুঞ্জ রাজা বললেন, 'বন্ধু, তুমি যেমন বোঝো করো, কিন্তু দেখো, মাদলের বাজনা আর মহুয়ার কলসিটা ভুলো না। এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না।'

হাম্বির ভারে ভারে মহুয়ার কলসি দলে দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলা গ্রামে ভীলরাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ার খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে-যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেইসঙ্গে এল সাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য!

রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে; ভীলের দল মহুয়ার কলসি খালি করে যেখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে; সেইসময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলা গ্রাম থেকে বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভীল রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল।

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, 'রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদ্‌যাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনও পাঠানের হস্তগত।' তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ-হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব করো গিয়ে। মনে ভেবো না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখো তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর করো, তবেই বড়ো হতে পারবে।'

রানা কুম্ভ

রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন — চাচা আর মৈর। যদিও দু-জনে রাজার ছেলে, কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে; সেইজন্য রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো! মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি — মুকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজি যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র করে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোনো গোলই হত না; তা না, একদিন দুই খুড়োকে সাতশো করে সেপাইয়ের সরদার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দু-জনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্রি আফিং খেয়ে ঝিমানো। হঠাৎ সরদার বনে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না জানি কী বিপদেই পড়বেন — কোথায় থাকবে আফিং, কোথায়-বা তামাক? দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না; উলটে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে! — মাদেরিয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেকদিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশো সেপাইয়ের সরদারের মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না; কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা ক্রমেই একটু কড়ারকম হতে লাগল। এমনকী আফিংচি হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ করে ঝিমানো দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চালাবার অন্য উপায় ছিল না; কাজেই মনের রাগ তাদের মনেই জমা হতে লাগল! আর কোনো কোনো দিন মুখ ফসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজির আমোদ আরও বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা, লখা রানার মতো মকুলেরও কম ছিল না! একদিন দুই চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন যে, বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন, নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনোদিন-বা তাঁকে হারাতে হয়! চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটল না। খুড়োদের খেপিয়ে তিনি তামাশা করেই চললেন।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রের মধ্যে রাঙা ফুল এত ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে! মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব!'

মকুল তাঁর দুই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'গাছটার নাম কি আপনারা জানেন চাচা?'

সাদা কথা কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে পাওয়া সম্ভব। এইটেই রানা ইশারায় জানালেন। মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে! সেইদিনই দুই খুড়ো মকুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন। রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি, লোকলস্কর, হাতি-ঘোড়া সব পড়ে রইল; কেবল একটি মা-হারা মেয়ে যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন,

তাকেই কোলে করে সেপাই সরদার সবার মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন—একেবারে বন ছেড়ে।

দুই খুড়োর উপর কতটা অন্যায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন। মাপ চেয়ে দুই খুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুই খুড়ো আর ফিরলেন না! অনুতাপে মুকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন। নিতান্ত ভালোমানুষ নিরুপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলই ব্যথা দিতে লাগল। তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন। সরদারেরা রানার মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ সঙ্গে যেতে সাহস পেলে না। সবাই তফাতে তফাতে রইল। বনের তলায় আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এসময়ে যখন চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না ভেবে যখন সব সরদার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সেসময়ে মনে হল যেন অনেকগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা ছুটে পালাল। তারপরেই সরদারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুইদিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালা জপ করছিলেন, এখনও তাঁর ডান হাতের আগায় মালা জড়ানো। রানার মতো রানা ছিলেন মকুল—মেবারে হাহাকার পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, এ কাজ সেই দুটি খুড়োর না হয়ে যায় না। মাদেরিয়ার বনে বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার অসম্ভব বোধ হল!

পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেইখানে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন। ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের যোধরাও এসে মিলেছেন; গ্রামে গ্রামে, পরগনায়, পরগনায় তাঁদের লোক চাচা আর মৈর—দুই ভাইকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম চিতোর থেকে বহুদূরে ক-ঘর ছুতোর-কামার, জনকতক, জোতদার-কিষাণ, বেশির ভাগই গরিব-গুর্বো। চাচা আর মৈর দু-জন সরদার তাদের মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল করে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা তারা খুব খুশি হল। প্রথম প্রথম দু-একবার তাদের সবারই পালপার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সরদার হাত গোটাতে লাগলেন। শেষে এমন দিন এল যে দুই সরদারের কথা কেউ আর বড়ো একটা মুখেই আনত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লার দুই বুড়োর নামে নানারকম গুজব রটতে লাগল! কেউ বললে তাদের অনেক টাকা; কেল্লার মধ্যে তারা সেইসব ধনদৌলত এনে পুঁতে রেখেছে; রোজ তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে উঠছে সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, দুই সরদার কেল্লার মধ্যেকার একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে দিল্লি যাওয়া-আসা করে, নবাবও মাঝে মাঝে কেল্লায় এসে নাচ তামাশা খাওয়াদাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার সময় সারঙ্গির আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন কামার কবে কেল্লায় দু-একটা মরচে-ধরা দরজার খিল মেরামত করে এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে দুই বুড়োতে একটা আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহাচুর ফেলছে, আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা রক্তে ভরা; দুটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবল মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ংকর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোক আনাগোনাই আর করত না, দিনে-দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে থাকল, আর সন্ধ্যার সময় দেখতে লাগল—যেন কারা ঘোড়ার পিঠে থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে—ঝমঝম।

দুই সরদার মাসে দু-মাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়চোপড় আটা-গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারা গ্রাম হপ্তাখানেক ধরে সরগরম থাকত। সে নানা কথা—আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের তার দাম কতই-বা? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রীর গলায় হঠাৎ রুপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে দুটো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে বলে!

এদিকে গ্রামের ঘরে ঘরে এই চর্চা, ওদিকে পাহাড়ের উপরে দুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ, সেই ভাঙা কেল্লা, সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন রাত ভরে রয়েছে। তার হাতে লাগানো ফুলের লতা ভাঙা দেওয়াল বেয়ে উঠে সকাল-সন্ধ্যায় ফুল ফোটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশছাড়া এই দুটো বুড়োর জন্যে। একলা কেল্লায় এই তিনটি প্রাণী। আর আছে এক পাহাড়ি কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দারোয়ান, সান্ত্রি, পাহারা—অজানা লোক যে হঠাৎ কেল্লায় ঢুকবে, তার জো নেই! শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে বাচ্চা নিয়ে থাকে তেমনি সাদা-চুল দুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন—অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কী বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ওই বুড়ো সরদার দুটো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করেছে। মেয়ের বাপ পাগলের মতো হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেল্লার আশেপাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরিয়া তার ওই কেল্লাতেই আছে। কেন না একদিন সকালে সত্যিই সে একটি মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে বেড়াতে দেখেছে—খুব দূর থেকে যদিও কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, 'যাও রানা কুম্ভের কাছে নালিশ করো গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে ভয়ানক লোকেদের হাতে পড়েছে, কুম্ভ ছাড়া কারও সাধ্যি নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।' বুড়ো দফাদার চলল। মরচে-ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে চলল সে।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিনরাতের পথ তা কে জানে, দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে ফিরে রাতকোটের কেল্লাটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় দফাদারের মুখে মেয়ে চুরির খবর শুনে তিনজনেই বললে, 'চলো, দফাদারসাহেব এর জন্যে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে সেই দুই বুড়োর দফারফা করে আসছি চলো!' শুনে দফাদার ঘাড় নেড়ে বললে, 'চেনো না সেই দুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ। মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা। যদি কেউ সে কেল্লা মারতে

পারে তো রানা কুম্ভ! পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে—রাস্তা নেই। বনে-জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না, এমনি ভয়ানক পাহাড়ের চুড়োয় রাতকোটের কেল্লা! আর তারই মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক দুই বুড়ো বসে! বলেই দফাদার হাউমাউ করে মেয়ের জন্যে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব ছোটো যে সেপাই, সে বললে, 'ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এসো।' ছোটো সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই!'

ছোটো সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুম্ভ নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান করে শাস্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, 'কেউ যদি কেল্লায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো দুটো তোমার মেয়েকে নিয়ে সেখানে গেল কোথা দিয়ে? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বললে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে এদিকে আসি? নিজেই গিয়ে বদমাশ দুটোর মাথা কেটে আমার মেয়েকে'—বলেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সেপাই তাকে ঠান্ডা করে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাইবেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুম্ভ যখন উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে—আকাশে কালো মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে যে বুড়ো দুটি আছেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো—চাচা আর মৈর। রাগে কুম্ভ লাল হয়ে উঠলেন, 'চলো, আর দেরি নয়, এখনই সেই দুটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব!' রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া ছোটালেন দেখে সঙ্গের দুটো সেপাইও চলল—পিছনে। দফাদার অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে, 'পাগল! পাগল!' বলে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ সোঁ ঝড় বইতে লাগল আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা—কালো অন্ধকারের একটা ঢেউ যেন আকাশজুড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভিজে মাটিতে তিনটি ঘোড়ার পায়ের ছপছপ শব্দ হতে থাকল। রানা বললেন, 'ঘোড়া এইখানে ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলো।' বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন।

এদিকে পাহাড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দুটো বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন আর কেল্লার ফটকে সিংহের মতো কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারি কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙা দরজার চৌকাঠে মস্ত থাবা দুটো পেতে মুখটি বাড়িয়ে দুই কান খাড়া করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে—কেউ আসে কি না। ভিজে বাতাসে শিকারি কুকুরের কাছে রাতে-ফোটা একটা বনফুলের গন্ধ ভেসে এল; তার পরেই কাদের পায়ের তলায় বনে কুটোকাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল। কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বার হল জঙ্গলের পথে। বনের মধ্যে ভিজে পাহাড়ের তাত উঠছে। অন্ধকারে দু-চারটে জোনাকি পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কী যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে! কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে চুপটি করে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের শব্দ শুনে শিকারি কুকুরের চোখ দুটো জ্বলছে। কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারাও কম সজাগ নেই—পাকা শিকারি, পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চারণ, আর মাড়োয়ারের যোধরাও! জানোয়ারের চোখ জ্বলছে কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির আলো বলে ভুল করলে না। রানার হাতের ছুরি সাঁ করে

গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুকধুক করছে ঠিক যেখানে! শিকারির ছুরিতে কেল্লার একটিমাত্র রক্ষক, দুটি বুড়ো একটি কচি মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়— সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া মরল — একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে। সে যেন বলে গেল — 'সাবধান।' ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ-ডাক ছেড়ে দিয়ে কুকুর স্তব্ধ হল! রানার বড়ো স্ফূর্তি হয়েছিল যে তিনি কেল্লা নেবার মুখেই একটা মস্ত সিংহ শিকার করলেন। সঙ্গীরাও বললেন, 'রানা, এ বড়ো সুলক্ষণ।' কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চুড়োয় কেল্লার দিকে একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল। দেখলেন একটা কুকুর পড়ে আছে। তিনজন আস্তে আস্তে আবার চললেন। মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন, তাঁর ছোটো ভাই আর-এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমুচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে : 'আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোটো। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে চললেন — এতটুকু ওকে বুকে করে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল, তুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি তাঁর মনে আছে? মিছে চিতোর যাওয়া! মা ঘাড় নাড়লেন; তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোটো ঘরখানি, সেই সবুজ মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুলতলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন কেমন করতে থাকল। আমি কেবলই ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম! মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না — সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে বরাবর সেইদিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে, কোনোদিন গাছতলায় কোনোদিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনোদিন কোনো গাঁয়ে আসি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই! কোনোদিন কিছু পাইও না, খাইও না। এইভাবে মা আমাদের চলেছেন — চিতোরের রানার দুঃখিনী কাঠকুড়োনি রানি! কতকাল পথে পথে কাটল তার ঠিক নেই! সারা বর্ষা চলে গেল — ভিজতে ভিজতে পথ চলতে চলতে! শীত এল। মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের দুঃখিনী মা — রানি মা! আমি এক-একদিন বলতেম মা, ঘরে চলো। মা বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতেম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠান্ডা নীল ঢেউ! মা, সেই নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক-একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ত। এমনি সে কতদিন, কতদূর চলে একদিন আকাশে আজকেরই মতো বাদল লাগল, বাতাস বইল, বিদ্যুৎ চমকাল; মেঘের ছায়া পড়ে সামনের পাহাড় সেদিন যেন কালো হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে বোধ হল; মা আমার পথের ধারে চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা চেয়ে দেখো পাহাড়ের উপর কত বড়ো বাড়ি! মা একবার চোখ মেলে দেখে বললেন, ওই আমার ঘর! খানিক পরে আস্তে আস্তে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, 'তারপর? কী হল?' কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর দিলেন, 'তারপর আর কী? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে ডেকে নিলেন — নিজের ঘরে!'

'আর তোমাদের?' মেয়েটি শুধাল।

চাচা আস্তে বললেন, 'আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কতকাল কাটালেম, সুখে-দুখে দুই ভাই একলা! অত বড়ো রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দু-জনে একলা থাকি আর মায়ের জন্যে কাঁদি।'

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, 'রানার ঘরে মাকে পেলে না?'

চাচা ঘাড় নাড়লেন, 'না। কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন করে জানব? সে অনেকদিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন একদিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব এমন সময় দেখলেম, পথের ধারে মা আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব বলে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেকদিনের হারানো মাকে ফিরে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেম।' মেয়েটি শুধোলে, 'রানা আবার কাঠকুড়োনি রানিকে কেড়ে নিতে এলেন না?' চাচা, মৈর দু-জনেই বলে উঠলেন, 'খুঁজে পেলে তো রানা? আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি রানার সাধ্যি কী, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন!' গল্প শুনতে শুনতে মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে, 'আমাকে একদিন তোমাদের মাকে দেখাবে?' চাচা আস্তে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আর একটু বড়ো হও, তারপরে সেই নিরালা ঘরে একটি পিদিম জ্বালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপিচুপি চলে যাব।' মেয়েটি ঘুমের ঘোরে দরজার দিকে চেয়ে বললে, 'হিঙ্গুলিয়া?' চাচার ভাই আফিমের ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।' যারা গল্প বলছিল আর শুনছিল, সবাই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো—অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর-ঘষা একটুখানি সোনালি রঙ!

কোন সময়ে ঝড় বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না; কখন রানা কুম্ভ তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘ গর্জনের সঙ্গে কড় কড় করে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপরে ঝকঝক করছে। রানা কুম্ভ ডাকলেন, 'ওঠো!' দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন—মেয়েটির হাত ধরে। কুম্ভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানাকে খুন করেছ, রাজপুতের মেয়েকে চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে!'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'রানাকে?'

মৈর আস্তে আস্তে বললেন, 'মকুলজিকে?'

কুম্ভ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই খুনের শাস্তি এই নাও!' দু-খানা তলোয়ার একই সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি 'মা!' বলে একবার ডেকে অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিবিয়ে দিলে! কুম্ভ জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজস্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাঠকুড়োনি রানির দুই ছেলে, যাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানলেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন। আর সেই মেয়েটি জানলে না দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই-বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই-বা সকালে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে—এ তো নয়, সে তো নয়! এমনি নানা কথা কয়ে সবাই মিলে সন্ধ্যাবেলায় গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই-বা সারারাত চাচা-চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া বলে কেঁদে ডাকলেও কেউ

সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেল্লা অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল খুঁজে খুঁজে, চলে চলে পা ধরে গেল, তবু তো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না!— কেন? কেন?

তারপরে রানা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রানি মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমন। রতিয়া রানার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে রূপ দেখে রানা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রানি স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে— রণ্‌ছোড়জির মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে— এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিরি রণ্‌ছোড়জির মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!'

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারী লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, 'মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ করো।'

এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না কিন্তু গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই একমনে কান পেতে প্রাণভরে মীরার গান শুনতে থাকে— তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না।

জোছনারাতে মন্দিরের সামনে শ্বেতপাথরের বেদিতে বসে সোনা আর হিরে-জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরির মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভীড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হিরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্‌ছোড়জির গলায় পরিয়ে দিয়ে সে রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লির বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে কে এক উদাসীন, কেউ-বা আরও কত কী! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে রণ্‌ছোড়জিকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু কুম্ভ রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'এবারে ভক্তেরা আসুন আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।' এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলজির সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেইসঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে-আনা ফুলের মতো মীরা দিন দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুমধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুদ শাকে তার মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রানা জয় করতে পারলেন না; মীরা বললেন, 'রানা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ কোরো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—'মীরা আয়!' আমাকে ছেড়ে দাও রানা, আমি পথের কাঙালিনি হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই!' রানা রেগে বললেন, 'রতিয়া সামান্য সরদার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে— যেখানে খুশি— আমি নতুন রানি নিয়ে আসছি।' সেইদিন চিতোরেশ্বরীর মীরা নন্দলালার মীরা, ভিখারিনির মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রানির খোঁজে।

মন্দুর-রাজকুমারের সঙ্গে ঝালোয়ারের রাঠোর সরদারের মেয়ের বিয়ে, বর আসছে ধুমধাম করে, এমন সময় রানা কুম্ভ এসে ঝলকুমারীকে সভার মধ্যিখান থেকে কেড়ে নিয়ে চিতোরে আনলেন। একে মহারানা, তাতে কুম্ভ, তাঁর উপর কথা কয় রাজস্থানে এমন তো কেউ নেই! কেবল বৃন্দাবনে মীরা যখন শুনলেন, মন্দুর-রাজকুমারের মুখে, রানা দুই প্রাণীর ভালোবাসার উপরে কী বিষম ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝলকুমারীর বরকে নিয়ে চিতোরে চললেন। রানার কাছে খবর পৌঁছল মীরা আসছেন। আর কেন আসছেন সেটাও শুনলেন কুম্ভ। রানা কড়া হুকুম দিলেন, 'ঝলোয়ান বাগানের মধ্যে ঝলকুমারীকে কড়া পাহারায় যেন বন্ধ রাখা হয়!' তারপর কুম্ভ মীরাকে এক চিঠি পাঠালেন—চিতোরেশ্বরী মীরা, চিতোরেশ্বর তাঁকে পেলে সুখী হবেন। তিনি যা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, সেই স্ত্রী-রত্ন যেখানে বন্ধ আছে, সেই ঝলোয়ানের চাবিও রানা পাঠালেন। ইচ্ছে করলে বাগানের দরজা খুলে রানি মীরা ঝলকুমারীকে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মন্দুরের রাজকুমার যদিও-বা কোনো উপায়ে ঝলোয়ানের বাগানে প্রবেশ করেন, কুমারীর দেখা পাবেন না নিশ্চয়। কেন না, রানার অন্দরে রানির ছাড়া কোনো পুরুষের যাবার হুকুম নেই। যদি যায়, তবে মাথা বাইরে রেখে যায় এটা জানা কথা!

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশে একটিমাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে, পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে মন্দুরের রাজকুমারের উপরে ঝলকুমারীর জ্বলন্ত ভালোবাসা! ঠিক সেইসময়ে রানার চিঠি মীরা পেলেন! চিঠি পড়ে মীরা বুঝলেন, উপায় নেই। তিনি দুটো কথা রানাকে লিখলেন—'প্রেম না করল রে, বিনা প্রেমসে প্রেম না মিলল রে!' মীরা মন্দুরের রাজকুমারের হাতে ঝলোয়ানের চাবি দিয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন; আর মন্দুর-রাজকুমার ঝলকুমারীকে শেষ দেখা দেখে নিতে বাগানে ঢুকলেন—আলোর নিশানার দিকে চেয়ে।

সেই রাতকোটের কেল্লায় অন্ধকার রাতে দুটি বুড়ো আর একটি কচি মেয়ের ভালোবাসার প্রদীপ যেমন করে হঠাৎ নিবেছিল, আজও আবার তেমনি করে রানা কুম্ভ নিজের অন্দরে ঝলকুমারীর ভালোবাসার প্রদীপটি তলোয়ারের চোটে নিবিয়ে দিয়ে রাজসভায় এসে বসলেন। কারিগর এসে জোড়হাতে বলল, 'মহারানার কীর্তিস্তম্ভ শেষ হয়েছে। স্তম্ভের নাম কী, জানতে চাই। পাথরে খোদাই করতে হবে।'

কুম্ভ রানা খানিক ভেবে বললেন, 'লেখোগে যাও- কুম্ভশ্যাম।'

আলোর ফুলকি

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনি কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারী খুশি। সোনালিয়াকে দেখে বললেন, 'বাঃ, তুমি তো খুব সকালে উঠেছ। বেশ, বেশ।' কিন্তু সোনালিয়া চিনে-মুরগির চা-পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছেনা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারী দমে গেলেন। কুঁকড়ো পষ্ট বললেন, তিনি ওই চিনে-মুরগিটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকড়োকে চিনে-মুরগির মজলিশে যেতে পেড়াপিড়ি করে বললে, 'দেখি তুমি আমার কথা রাখো কি না।'

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বললে, 'তবে আমি এখনই বাড়ি চলে যাই।' কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'না সোনালি, এখনই যেয়ো না।' সোনালি অমনি সুযোগ বুঝে বললে, 'তবে যাবে বলো চিনিদিদির বাড়িতে।' কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তাই, আমিও যাব।' কথাটা বলেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চটলেন, মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মানতে হবে!

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগল। কুঁকড়োকে চিনিদিদির বাড়িতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁষে বললে, 'তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলো না, শুনিই-ই—।'

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বললে, 'বলো না, বলো-বলো, বলো না।'

কুঁকড়ো এবারে গদগদ-স্বরে 'সোনালি আমার মনের কথাটি—' বলে আবার চুপ করলেন। সোনালি বলে চলল, 'বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনিতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আমি বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে, যেন দূরে কার বাঁশি বাজছে।'—বনের রানি সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন গুণীর না মনটা নরম হয়। কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'বলি কি না বলি।' সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, 'এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া।' কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, 'হল না তো হল না তো।' তারপর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন, 'কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।' সোনালিয়া বলে উঠল, 'কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বললে না রূপকথার নিতিটুকু,' বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বললেন, 'জানো, সে কথাটা কি? যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলে না? কথাটা হচ্ছে, তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া বনের টিয়া।' সোনালি গম্ভীর হয়ে বললে, 'কী বকছেন আপনি। রূপকথা শোনাতে হয় তো আপনার চার বউকে শোনান গিয়ে, খুশি হবে,' বলেই সোনালি অন্যদিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজগজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'একটা গান গাও না।' কুঁকড়ো ফোঁস করে উঠলেন, সোনালি বললে, 'বাস রে, একে

বুঝি বলে গান!' তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'সো-ও-ও-ন্', যেন শ্যামা পাখি সিটি দিলে, সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক-ওদিক করে বললেন, 'সোনালি, তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার, বুকের ভিতরটাও যদি তেমনই তোমার খাঁটি হয় তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি,' বলে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না, 'বলো বলো।' তারপর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন, 'সোনালি পাখি, বুঝে দেখো আমি কী, সোনার শিঙার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যই সৃষ্টি হয়নি কি জীবন্ত এক রৌশন চৌকি? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনই সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙখি, সকাল-বিকাল।'

সোনালিয়া বলে উঠল, 'নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনোদিন দেখিনি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে করো, আমি মাটি আঁচড়াই মাসকলাই সংগ্রহ করতে। সে করে মুরগিরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি, কোন মাটি আমার উপযুক্ত দাঁড়াবার বেদি হতে পারে। আমি জানি, গান গাওয়া মিছে হবে যদি না ইট-পাটকেল, ঘাস, কুটো-কাঁটা সব সরিয়ে এই পুরনো পৃথিবীর কালো মাটির পরশখানি নিতে ভুলি। পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরও যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে, লতায়-পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি ফুটি করছে, ঠিক সেইসময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর ও গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারই ধাক্কায় আর আমি বুঝি, আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভলগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বেজেছে।

'অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোররাতের হিম-মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারই প্রার্থনা, ভোরবেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে চারিদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

'নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে, আলো কী দোষে হারালেম।

'আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধানখেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার

পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায় গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো-তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে, জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারারাত কাঁদছে। এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল।' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা-কা শব্দ নিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'এই বুঝি তোমার মন্তর।'

'হাঁ, সোনালি, মন্তরটা আর কিছু নয়, আমি না থাকলে পুব আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকত এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বলো বা তন্তরই বলো,' বলে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন — 'ঘাড় হেঁট হয় এমন কাজ আমি করিনে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াইনে, আমি আলোর জয়জয়কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলার রেশ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে বলে।' কুঁকড়ো যতক্ষণ বলে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চটকা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল; সে বলে উঠল, 'একী পাগলের কথা! তুমি, তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে....'

'সেই জিনিস যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়। আকাশ যেদিন মেঘে ঢাকা, সেদিন জানব, আমি ভালো গাইনি।'

'আচ্ছা তুমি যে দিনের বেলাও থেকে-থেকে ডাক দাও, তার অর্থটা কী শুনি।' সোনালি শুধোল।

কুঁকড়ো বললেন, 'দিনের বেলায় এক-একবার গলা সেধে নিই মাত্র। আর কখনো-বা ওই লাঙলটাকে, নয়তো কোদালটাকে, ওই ঢেঁকি, ওইখানে ওই কুড়ুল, এর গাস্তেকে বলি, ভয় নেই আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-ব না ভু-ল-ব না।'

সোনালি বললে, 'ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে শুনি?'

'পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।'

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়ল বই কমল না; সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি মনে করো, সত্যিই তোমার গানে জগৎজুড়ে আলোর বান ডাকে?'

কুঁকড়ো বললেন, 'জগৎজুড়ে কী হচ্ছে তার খবর আমি রাখিনে, আমি কেবল এই পাহাড়তলিটির আলোর জন্যে গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে, এ পাহাড়ে যেমন আমি, ও পাহাড়ে তেমনি সে, এমনি এক-এক পাহাড়তলিতে এক-এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে।' সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত ফুরিয়ে এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান দেবার সময় হয়েছে, তিনি সোনালিকে বললেন, 'সোনালি

আজ তোমার চোখের সামনে সূর্য ওঠাব, আমাকে পাগল ভেবো না, দেখো এবং বিশ্বাস করো। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে, তেমন গান আমি কোনোদিন গাইনি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়গুলিতে কেউ কখনো দেখেনি সোনালিয়া।' বলে কুঁকড়ো ঢালুর উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কী সুন্দরই দেখাতে লাগল। সোনালি মনে মনে বললে, 'এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি!' এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগ ফুলটা যেন আগুনের শিখার মতো রগরগ করছে। পুবদিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'ফ-জী-ই-ই-র্ ফ-জী-র্'... সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পুব আকাশকে হুকুম দিলেন, 'কাজ শুরু করো', আর অমনি মাটির হুকুম কাজের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গেল, 'ভোর ভয়ি ভো-র ভ-য়ি' হাঁকতে হাঁকতে। তারপর সোনালি দেখলে কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন, 'বাদল বসন্তের চেয়ে দু-দণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেব ভয় নেই।' সোনালি দেখলে তিনি একবার মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও ঝোপ এ ঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কী বলছেন, যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন, 'দেব, দেব, আলো দেব, রোদ দেব, হিম-আঁধার ঘুচবে, ভয় কী ভয় কী।' অণু-পরমাণু ধুলোবালি তারা—কুঁকড়োর কানে কানে কী বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, 'দোলনা চাই, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে, আর অণু-পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলন দে দোল দোল, দে, দোল দোল।' সোনালি দেখলে আকাশ আর মাটির মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু-আধটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। সোনালি বললে, 'দিনের আলো দেবার আগে সব তারাগুলোকে বড়ো যে নিভিয়ে দিচ্ছ, এককে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন?' কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলিনি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দূ-উ-উ-র হল দেখতে-দেখতে।' সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানি রঙে সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রং আর দূরের পাহাড়ে-মাঠে সব জিনিসে কুসুমফুলের গোলাপি আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চললেন, 'আলোর ফুল আলোর ফু-ল-কি-ই-ই গোলাপি হোক সোনালি, সোনালি সে রুপোলি, রুপোলি হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল', কিন্তু তখনও দূরে খেতগুলোতে শোন ফুলের রং মেলায়নি, সব জিনিসে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আ-লো-ও-ও,' অমনি কাছের খেতের উপরে চট করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল। কুঁকড়ো পুব ধারের আকাশকে বললেন, 'খুলুক, খুলুক।' অমনি আকাশ জুড়ে পুবদিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'খুলুক খুলুক', অমনি সব পাহাড়ে-পাহাড়ে গোলাপি ফুলে ভরা পদম্ গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। 'খুলুক খুলুক,' দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের-কাছের সব জিনিস ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী। শুকনো ছড়ি থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনি কুঁকড়োর এইসব কাণ্ডকারখানা অবাক হয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল, কুঁকড়োই বুঝি এসবের ছিষ্টিকত্তা, এমন সময় কানের কাছে শুনলে, 'মন, বলো ভালোবাসো তো?'

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আনলে, তার সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতে কে না ভালোবাসে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সরে এসো সোনালি, বুক তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ,' এই বলে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আলোর ফুলকি সোনালি,' সোনালি অমনি কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বললে, 'ভালোবাসি গো, ভা-লো-বা-সি।' কুঁকড়ো বললেন, 'সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজের মতো আমার চোখের কোলে লাগল, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে। এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনই ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি।' সোনালিয়া আদর করে বললে 'দাও না পাহাড়টা গিলটি করে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসব।' কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, 'সো-না-র জল সো-না-লি-য়া,' অমনি পাহাড়ের চুড়োয় সোনা ঝকঝক করে উঠল, তারপর সোনা গলে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নীচের পাহাড়ের গোলাপিতে এসে মিশল, শেষে গোলাপি ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তাঘাট মাঠ-ময়দান ঘরদুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিল। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনও একটু-আধটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বললেন, 'সাফাই,' সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁপিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু এ কি যে-সে কুঁকড়ো যে, কাজ বাকি রেখে যেমন-তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে, 'আরও আলো চাই' বলে কুঁকড়ো আবার গা ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল, 'আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল কি-ই-ই আলো-র-র-র।' দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে-আস্তে। সোনালি তাকিয়ে দেখলে কুঁকড়ো কী সুন্দর। সে সকালের শিল্পী কুঁকড়োকে মাথা নিচু করে নমস্কার করলে। আর কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এই আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকড়ো আনন্দে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তখনও কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে। তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নীচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগল; যে-যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যখন আলো বলে ডাক দিয়েছেন, তখনও রাত ছিল, তিনি যে সবার বড়ো তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল, এইবার সূর্যকে আনা চাই, কুঁকড়ো আবার শুরু করলেন, 'রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি,' অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠল সেই সুরে, 'আলোর ফুলকি, আলোর ফুল।'

সোনালি বললে, 'দেখেছ ওদের আস্পর্ধা। তোমার সঙ্গে কিনা সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা?'

কুঁকড়ো বললেন, 'তা হোক, সুর-বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশি দেরি হয় না, সূর্য দেখা দিলেন বলে।' কিন্তু তখনও কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি হাঁক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগল। দূরে একটা সরষেখেত তখনও নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন, আলো পড়ে খেতটা সবুজ হল, খেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল। নদীটা কেমন ধুঁয়াটে দেখাচ্ছিল, কুঁকড়ো ডাকলেন, অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রং গিয়ে মিলল। হঠাৎ সোনালিয়া বলে উঠল, 'ওই যে সূর্য উঠেছেন।' কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাকে ওই সূর্যের রথ, এসো তুমিও, বলেই কুঁকড়ো নানা ভঙ্গিতে যেন সূর্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চললেন, 'তফাত হো তফাত হো' বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগল, 'আসছেন আসছেন।' কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওপার থেকে এল রথ।' ঠিক সেইসময় শালবনের ওপার থেকে সূর্য উদয় হলেন সিন্দূরবরন। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'আঃ, আজকের সূর্য কত বড়ো দেখছ!' সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্যের জয় দিয়ে একবার গান করেন। কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালিকে কুঁকড়ো বলেছেন, অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠল 'উরু-উরু-রু-রু-রু।' কুঁকড়ো শুকনো মুখে বললেন, 'আমি নাই-বা জয় দিলেম, শুনছ দিকে দিকে ওরা সব তূরী বাজিয়ে তাঁর উদয় ঘোষণা করছে।' সোনালি শুধোলে, 'সূর্য উঠলে পর তুমি কি কোনোদিনই তাঁর জয়জয়কার দাও না? তোমার নবতখানায় সোনার রৌশনচৌকি সূর্যের জয় দিয়ে কি কোনোদিন বাজাওনি।'

'একটি দিনও নয়,' বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সোনালি একটু ঠেস দিয়ে বললে, 'সূর্য তো তাহলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে।' কুঁকড়ো বললেন, 'তাতেই-বা কী এল-গেল।' সোনালি আরও কী বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনোই এমন উতরোত না।' সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বললে, 'তুমি যে সকালটা করতে সূর্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কী হল?' কুঁকড়ো বললেন, 'পাহাড়ের নীচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়াগুলি আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে, সেইটেই আমার পরম লাভ।' সোনালি সত্যিই শুনলে, নীচে থেকে দূর থেকে কাছ থেকে কীসব শব্দ আসছে। সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারিদিক চাইতে লাগল। কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বললেন, 'কী শুনছ সোনালিয়া, বলো।' সোনালিয়া বলে চলল, 'আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'দেবতার আরতি বাজছে।'

সোনালি বললে, 'এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং-টং।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কামারের হাতুড়ি পড়ছে।'

সোনালি, 'এবার শুনছি গোরু সব হামা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।'

কুঁকড়ো, 'হাল-গোরু নিয়ে চাষা চলেছে।'

সোনালি এবার বললে, 'কাদের বাসা থেকে বাচ্ছাগুলো সব রাস্তার মাঝে চলকে পড়ে কিচমিচ করে ছুটছে।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'পাঠশালার পোড়োরা চলল,' বলে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বললে, 'পিঁপড়ের মতো কারা সাদা সাদা হাত-পাওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কাপড় কাচা হচ্ছে। আর দেখছি'—সোনালিয়া বললে, 'একী, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চকচকে ডানা ঘষছে।' কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ওহো, কাস্তেতে যখন শান পড়ছে তখন ধান কাটার দিন এল বলে।' তারপর পাহাড়তলির থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে চারিদিক থেকে কত কীসের সাড়া আসতে লাগল। ঘণ্টার ঢং-ঢং, হাতুড়ির ঠং-ঠং, কুড়ুলের খট-খট, জলের ছপছপ, স্যাকরার টুকটাক, কামারের এক ঘা, হাসি, বাঁশি, বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কাজকর্ম চলেছে, কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই, বসে নেই। সত্যিই দিন এসেছে, কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মতো চারিদিকে চেয়ে বললেন, 'সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এইসব কারখানা এ কি আমার ছিষ্টি। দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি, না এসব পাহাড়তলির পাগলা কুঁকড়োর খ্যাপামি আর খেয়াল? সোনালি, একটি কথা বলব, কিন্তু বলো সেকথা প্রকাশ করবে না, আমার শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাবো-না কেন, আমি জানি এই স্বর্গে-মর্ত্যে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়ল? কত ছোটো, কত ছোটো আমি, আর এই জগৎজোড়া সকালের আলো সে কী আশ্চর্যরকম বড়ো, কী অপার তার বিস্তার। প্রতিদিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি। আমি যে আবার কোনোদিন এতটুকুও আলো দিতে পারব তার আশাটুকুও থাকে না।' সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বললে, 'মরি মরি।' কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বললেন, 'আঃ সোনালি, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কী জ্বালা কেমন করে বলি। গান গাইতে হবে, আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙুলের আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলই মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকব, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব, না দেখব, গান নেই, গলা নেই, আলো নেই, তুমি নেই, আমি নেই, কিছু নেই? হারাই কি পাই, এরই বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে-শিরে সোনালি। এই যে দোটানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে। রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নীচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সে-ও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জানো বনের মধ্যে উইপোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার এ কী বিষম ডাক দেওয়া কাজ। কাল যে কী হবে সেই দুঃস্বপ্নই বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে কি না প্রাণ, গান গাব কি না ফিরে আর-একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।'

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, 'নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে, গলা ফিরে পাবে, আলোর সুর মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে।'

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'কী আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো, আরও বলো—।'

সোনালি চুপিচুপি বললে, 'আহা মরি, কী সুন্দর তুমি।' 'ওকথা থাক সোনালি।' 'কী চমৎকার গাইলে তুমি।' কুঁকড়ো বললেন, 'গান ভালো-মন্দ যেমনই গাই আমি যে আনতে পেরেছি...।' সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।' 'না সোনালি, আমার কথার উত্তর দাও, বলো, সত্যি কি —।' সোনালি আস্তে বললে, 'কী?' কুঁকড়ো বললেন, 'বলো, সত্যি কি আমি,' সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, 'পাহাড়তলির কুঁকড়ো তুমি সত্যি আলো দিয়ে সূর্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'ভ্যালারে ওস্তাদ', বলেই তাল-চড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন, চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভুরু তুলে শিস দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। কুঁকড়ো ভাবছেন এ হরবোলাটা সব শুনেছে নাকি। ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলেছে দেখে তিনি ডাকলেন, 'আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি।' চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বললে, 'বাহবা তারিফ। যা দেখলেম শুনলেম —।'

কুঁকড়ো বললেন, 'চটকরাজ, তুমি যে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।'

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরনো ময়লা খালি ফুলের টবটা দেখিয়ে বললে, 'আমি ওইটের ভিতরে বসে একটা কানকুটুরে পোকা কুটকুট করে খাচ্ছি এমন সময় আঃ, কী যে দেখলেম, কী যে শুনলেম তা কী বলি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তারপর।' চড়াই অমনি বলে উঠলে, 'তারপর যদি বলি ওই মাটির টবটা দিব্যি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'গামলা থেকে লুকিয়ে-শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি।' চড়াই জবাব দিলে, 'শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনি অবাক হয়েছিলেম যে কখন যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেছি তা আমার মনে নেই। আহা, কী দেখলেম রে, কী সুন্দর কী সুন্দর।'

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'বটে লুকিয়ে দেখা! তফাত যাও।' কুঁকড়ো যত বলেন, 'তফাত তফাত,' চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল করে কিচকিচ করে 'বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হল ফাঁস ফুসমন্তর হল ফাঁস ক্যা বাত ক্যা বাত।' কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেললেন। সোনালিয়া বললে, 'চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।'

চড়াই বললে, 'ভক্তি করব না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ কেউ কি দেখেছে? কী সকালের রংটাই ফলালে, কী গানটাই গাইলে গা, যেন তুবড়িবাজি ভুস।'

সোনালি বললে, 'এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ করো, আমি চললুম।'

কুঁকড়ো বললে, 'কো-ক্-কা-ম কোথায়?'

সোনালি বললে, 'ওই যে সেই —।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'তাই তো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোটো হাজিরিও জমতে চলল, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগির চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা-যাওয়া।'

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপিচুপি শুধোলেন, সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন?

সোনালি বললে, না ওরকম মজলিশে তাঁর যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'তবে তুমি যাচ্ছ যে।'

সোনালি বললে, 'আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝকমকানিটা কেমন তাই সেইসব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসব,' বলে সোনালি একবার গা ঝাড়া দিলে তার সোনার পালকগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগল। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে বলে চিনে-মুরগির মজলিশে চলল। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'কেন?'

'সে তোমার শুনে কাজ নেই,' বলে চড়াই মিটমিট করে চাইতে লাগল সোনালির দিকে।

সোনালি হেসে বললে, 'না, চড়াইকেও যে তুমি পাগল করলে,' বলে সোনালি পাখি সোনালি ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিম্মা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাত মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাশ তো নয়।

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বললে, 'বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগিগুলোকে বিশ্বাস করিয়েছ যে তুমিই সূর্যোদয় করে থাকো, মেয়েদের চোখে ধুলো দিতে তোমার মতো দুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগিরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে। হয় কলম্বাস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছ, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারই তুমি বাচ্ছা, এ না হলে তুমি আলোর আবিষ্কর্তা হতে না আর মুরগিদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু-পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এসব খেয়াল কি যে-সে মাথা থেকে বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন বলে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার-তার কর্ম।'

রাগে কুঁকড়োর দম বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বললেন, 'থামো, চুপ।'

চড়াই দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জানো না যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?'

কুঁকড়ো বললে, 'তুমি জানতে পার, আমি জানিনে। আর যাই নিয়ে ঠাট্টা করো, করো—একথা নিয়ে আর কোনোদিন তামাশা কোরো না যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।'

চড়াই মুখে বললে, খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বললেন, 'কিন্তু যখন আমি ডাক দিতে সূর্যই উঠল আলো হল, সে আলো পাহাড়ে-পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রং ধরলে তখনও কি একবার তোমার মনে হয় না যে এসব কাণ্ড করলে কে।'

চড়াই বললে, 'গামলায় গর্তটা এমন ছোটো যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ওই হলুদবরন চরণ দু-খানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসেনি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তোমার জন্যে আমার দুঃখু হয়, আলোর মর্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি।'

চড়াই জবাব দিলে, 'বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'বেশ কথা, যে থাকবার থাক, আমি যেমন চলেছি সূর্যের দিকে মুখ রেখে তেমনিই চলি দিনরাত এই পাখি জন্ম সার্থক করে নিয়ে। চড়াই জানো, বেঁচে সুখ কেন, তা জানো?'

চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে,' বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগল। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চললেন, 'কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করব তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড়ো হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস, সেইজন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রুপোর জাল দিয়ে গিলটি করতে চাচ্ছে, ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি।' 'আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি,' বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলেন। 'তোর কি দয়ামায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখব না,' বলে কুঁকড়ো চললেন। চড়াই বললে, 'দয়ামায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যা-হোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা ইচ্ছে করুক বাপু, আমরা সেকথায় কাজ কী, তুমি জানো আর তারা জানে।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'শত্রু কারা শুনি?'

'কেন, প্যাঁচারা।' চড়াইটা বলে উঠল।

'শেষে এ-ও ভাগ্যে ছিল, প্যাঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ,' বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন।

চড়াই বললে, 'আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুন্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখি রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।'

'কাকে তারা জোগাড় করেছে?' কুঁকড়ো শোধালেন।

চড়াই বললে, 'তোমারই জাতভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ, আঃ, সে যে কুস্তিগির ভীম বললেই চলে, সে তোমার আসা পথ চেয়ে সেখানে আছে।' কুঁকড়ো শোধালেন 'কোথায়?' 'ওই চিনে-মুরগির ওখানে,' চড়াই বললে। কুঁকড়ো শোধালেন, 'তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি?' 'না বাবা, যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কী জানি যদি লেগে যায় তবে,' বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কী করেন দেখতে লাগল। কুঁকড়ো চট করে কুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বললে, 'যাচ্ছ কোথায়?' 'কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুলতলাতে যাচ্ছি,' বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চললেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতেই যেতে দেবে না এমনি ভঙ্গি করে বললে, 'না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবে না, আমি বলছি যেয়ো না।' 'যাওয়া চাই,' বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরনো ফুলের খালি টবটা দেখে বললেন, 'এই ছোটো গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে?' 'কেন এমনি করে,' বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বললে, 'কেন এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম।' 'কী দেখলে?' 'কেন মাটি,' 'আর, এইবার আকাশ দেখে নাও,' বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উলটে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরোবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকল 'গেছি গেছি' বলে।

বুড়ো-আংলা

আমতলি

রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গোবুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুরছানা বেড়ালছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ারঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া— এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলির গাঁয়ের প্রজা। দু-জনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বারো বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ; কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে গাছে আমের বোল আর কাঁচা আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলি শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দ ফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত বন যেন পুরন্ত-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে; রোদ পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রং ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে— বাইরে! রিদয়ের কুলুপ-দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামির ফন্দি আঁটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতু বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেড়ালছানাটা কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল-ঘরের কপলে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা রিদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রং একটা ছোটো কী পাখি এসে শিস দিতে লাগল— রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—'ও হিরিদয়! ও হিরিদয়!' রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিকে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিটখিট খিটখিট করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি!

সে পাখিটাকে ছুড়ে মারবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত

দুটো মরচে-পড়া তালা-আঁটা সুঁদ্‌রি কাঠের উপরে পিতলের পাত আর পেরেকের নকশা-কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল মাটির গণেশ ছোটো ঢোলক বাজাচ্ছেন ঠিক তারই নীচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এত বড়ো যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদি!

এই সিন্দুকে কী যে আছে, তা রিদয় এ পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা কিছু ভালো দামি আশ্চর্য সামগ্রী এই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শিষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, ঢিপঢিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন—'দেখিস, সিন্দুকে পা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!'

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক-একদিন ভাদ্দর মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে, তার থেকে ভারী ভারী রুপোর গয়না, বেনারসি শাড়ি, কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়েপুঁছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন; কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কী, রিদয় এ-পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেলে না। সে দু-পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে-ধরা তালা দুটোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার ফুটোর মধ্যে অন্ধকারে একটা কী চকচক করছে দেখা যায়, কিন্তু সেটাকে আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও রিদয় পেরে ওঠেনি। তালা দুটোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেইসঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালাটা কী করে ভাঙা যায় ভাবতে ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও ঢুলে এল।

সেইসময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে গণেশ মোটা পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি! এই বুড়ো আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি সাদা, শুঁড়টি ছোটো একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান দুটি যেন ছোটো দু-খানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রুপোর তারের পইতে ঝোলানো; পরনে লালপেড়ে পাঁচ আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোটো একখানি কোঁচানো চাদর; মোটাসোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোটো ছোটো ঘুঙুর, গোলগাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্টো ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সম্‌সকৃতে গণেশ-বন্দনা করতেন :

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব-স্থূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসারসমুদ্র পিয়া খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভালো খেলা খেলো দয়াময়॥

এই বন্দনা শুনে সে গণেশকে মনে করেছিল না জানি কতই বড়ো! একেবারে পদভরে মেদিনী
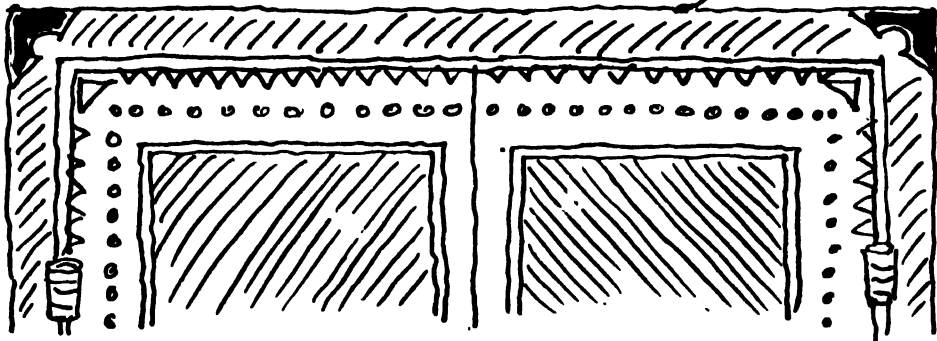
কম্পমানা! মেঘ গর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে — তালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা শুঁড় দোলাতে দোলাতে, কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গণেশ যে গণেশদাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা — পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোটো, ঢোলকটি মাদুলির চেয়ে বড়ো নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁদুরটির চেয়ে একটু ছোটো, এটা রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক খাঁচা বিলিতি ইঁদুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁদুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গণেশ ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গণেশকে গিয়ে চেপে ধরে— যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা-বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল কিন্তু সেটা ছুড়ে মারলে গণেশ এত ছোটো যে চেপটে যাবার ভয় আছে; পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল; আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগাতে পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সেঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না! চারদিকে দেখতে দেখতে কোণে ঠেসানো চিংড়িমাছ-ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দু-হাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু-হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ করে কুঁড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকে পড়ে যাওয়া!

ইঁদুরটা টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন ঢুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উলটে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই!

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু-পা আকাশে ছুড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন — 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!' কিন্তু দাঁতে শুঁড়ে ঢোলকে জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে হাঁপাতে মা দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন; সেইসময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে আস্তে এসে কটাস করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে-দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন :

মার মার ঘেরঘার হান হান হাঁকিছে,
হুপহাপ দুপদাপ আশপাশ ঝাঁকিছে!
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে,
হুমহাম খুমখাম ভীম শব্দ ভাসিছে!
উর্ধ্ববাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,
লম্ফঝম্ফ ভূমিকম্প নাগদন্ত লাড়িছে!
পদ ঘায় ঠায় ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,
খণ্ড খণ্ড লন্ডভন্ড বিস্ফুলিঙ্গ উঠিছে!

হুলথুল কুলকুল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে,
ভস্মশেষ হইল দেশ রেণু রেণু উড়িছে!

দেখতে দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'এতবড়ো আস্পর্ধা!—ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়িমাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটোলোক তুই, তেমনি ছোটো বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে থাক!' বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, মেঝেতে ভাঙা গণেশের একরাশ রাঙা মাটি ছড়ানো রয়েছে! গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে সিন্দুকটা এত বড়ো হয়ে গেছে আর সে এত ছোটো হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল! মাথার উপর কড়িকাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনও সে বড়োই আছে; যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাকে উলটে ফেলে বললে, 'ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন তুই ছোটো হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি।'

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো আঙুলের মতো ভয়ানক ছোটো হয়ে একেবারে বুড়ো-আংলা হয়ে পড়েছে! রিদয় প্রথমটা ভাবল সে স্বপন দেখছে, কিন্তু তিন-চারবার চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটুও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল—কী করা যায় এখন?

গণেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন—যক্ হয়ে থাক! কিন্তু যক্ বলে কাকে? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোটো থাকা? না, আর-কিছু ভয়ানক হবে?

অন্য ছেলে হলে ভয়-ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক্ কাকে বলে কারও কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোটো হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টুবুদ্ধিও ছোটো হয়ে গেছে, কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল, 'ঠাকুর, এবারকার মতো মাফ করো। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক্ কাকে বলে বলে দাও।' কিন্তু গণেশ কোনো সাড়াশব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারী চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোটো আর ভালোমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গোঁফ ফুলিয়ে কাছে এসে বললে, 'কেমন! যেমন কর্ম তেমনি ফল! এখন থাকোগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে! আর আলোতেও আসতে পাবে না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না।'

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড়ো একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চুপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে, 'ভাই, যক্ কীরকম?'

ইঁদুর উত্তর করলে, 'সেকালে লোকে ছেলেপিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক্ বসাত—জোঁক

বসানো নয়, যক্ বসানো! আগে সব বাড়িতে একটা করে চোরকুটরি ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়েছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোরকুটরির নীচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়োর মতো অন্ধকার জায়গায় লোকে কখনো কখনো যক্ বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্ট ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভালো কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে এক থালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না খেয়ে, দানধ্যান না করে যেসব ধনদৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নীচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—এই যকের ধন তুমি আগলে থাকো। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়। হ্রিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী? দু-চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যেত! পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে অন্ধকারে ডাঁশপোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেইসময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা ছেলের ফাঁপা মাথার খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে ধনদৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক্ হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলই কাঁদত আর . . .'

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশপোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইঁদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে, 'শুনলে তো? এখন ছেলেধরা তোমাকে দেখেছে কী ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এইবেলা, মানুষের কাছে আর এগিয়ো না, ধরা পড়লে মুশকিল!' বলেই ইঁদুর কুলুঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে, 'আর কি মানুষ হব না?'

ইঁদুর হেসে বললে, 'গণেশঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।'

রিদয় আরও ভয় পেয়ে শোধালে, 'গণেশ গেলেন কোথা? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাপ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি কোনোদিন সন্দেশ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছিমিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশো দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গাস্নান করব।'

এমনি ভালোমানুষ হবার যত-কিছু প্রতিজ্ঞা কোনোটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না! কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়দের বাড়িও তেমনি ছিল —'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে!' ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে যেতে রাস্তা হয়েছে— পুকুরপাড়ে যাবার, গোয়ালে

যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার! বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু-টুকরো নারকোল গাছের গুঁড়ি পাট্যতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনও থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড়ো নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক-আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেতেন বেড়ালছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে, কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উলটে উলটে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো আংলাকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল, 'ছি-ছি! ও হিরিদয় হল কী? ছি-ছি।' অমনি কুবো পাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল—'দুয়ো, বেশ হয়েছে, দুয়ো!' আর অমনি চারদিক থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি, মুরগির ছানা, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমনি সব ঘরের আশপাশের পোষা পাখি, বুনো পাখি মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিবে চ্যাঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল, 'ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা, দেখো দেখো! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-আংলা! ও হিরিদয় হল কী?' কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে, 'কী হল।' চড়াই ল্যাজ নেড়ে বললে, 'একী, যক্ নাকি?'

রিদয় যখন মানুষ ছিল, তখন পাখিদের কিংবা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত না, কিন্তু যক্ হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কুঁকড়ো বলছে, 'কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে?'

মুরগি অমনি বললে, 'যেমন দুষ্টুমি, তেমনি শাস্তি হয়েছে! চুরি করো আমার ছানা! এইবারে এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।' বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতিহাঁস অমনি বলে উঠল, 'থাক, থাক, এবার মাপ করো।'

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বললে, 'তোর এমন দশা করলে কে?'

রাজহাঁস অমনি নাক তুলে শুধোল, 'এ্যাঁঃ?'

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি, হাঁস—যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসবে, এটা রিদয় সইতে না পেরে, এক ঢিল ছুড়ে ধমকে উঠল, 'প্যাঁকপ্যাঁক করিসনে বলছি—পালা!'

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি একসঙ্গে খ্যাঁকখ্যাঁক করে তেড়ে উঠল, 'দূর হ, দূর হ! পালা!' ধাড়ি-বাচ্ছা সব পাখি চারদিকে ঘিরে এমনি চ্যাঁচামেচি করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার জোগাড়! বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাইপাঁশ মেখে বাঘের মতো ডোরা-টানা এক বেড়াল, চান সেরে সেইদিকে আসতে লাগল—'কিও কিও' বলতে বলতে! বেড়ালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালোমানুষের মতো, মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এই ভাবে পায়ে পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয় সে জানে, ভেবে রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেড়ালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেড়াল অমনি ল্যাজ ঘুরিয়ে, সামনে দুই থাবা রেখে, গম্ভীর হয়ে

বসে চোক পিটপিট করতে করতে যেন রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত রোদে বসে চেটে চেটে সাফ করতে লাগল। রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জব্দ হয়েছে; সে বেড়ালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোল, 'বলো না মেনি, গণেশঠাকুর কোনদিকে গেলেন?'

মেনি বললে, 'গণেশঠাকুর কাছেই এক জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে বলছিনে বাপু!'

রিদয় আরও নরম হয়ে বললে, 'লক্ষ্মীটি, বলো, কোথায়? তিনি আমার কী দশা করেছেন দেখছ!'

বেড়াল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ দুটো বড়ো করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'তোমায় দেখে দুঃখু হবে না? আমর ল্যাজে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হুঁঃ!' বলে বেড়াল একবার গা ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে, 'দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কি না—' বলে যেমন বিড়ালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেড়াল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো শজাবুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কান দুটো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেড়াল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেড়াল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেড়ালকে ধরতে গেছে, অমনি বেড়াল ফাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উলটে ফেলে তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আবার বজ্জাতি! এখনও বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো-আংলা কোথাকার! জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো তোকে ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!'

বেড়াল যে ইচ্ছে করলে এখনই নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দুটি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেড়ালের নিজমূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোটো হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে জল দেখে বেড়াল রিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে, 'ব্যস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম—তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি! আর কখনো পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে—যাঃ!' বাঘের মাসি বেড়াল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়ো আঙুলের মতো দু-বার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালোমানুষটির মতো আস্তে আস্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে গোয়ালবাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপলে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে হুটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা গাই বলছে, 'হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁহুঁ!'

কপলে গাই বললে, 'আমার কানে বোলতা ছাড়া! হুঁহুঁ!'

এইসময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়োরে দেখে কালো গাই লাথি ছুড়ে বললে—'খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।'

ধলা বললে, 'আয় না, এইবার একবার শিং ধরে নাড়া দিবি!'

কপলে বললে, 'একবার বোলতা নিয়ে কাছে এসো না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!'

কালো—সে সবচেয়ে বুড়ি, সবচেয়ে জোরালো গাই, সে বললে, 'বড়ো যে আমাকে ঢিল মারা হত।

আবার সেদিন আমাকে জুতো ছুড়ে মারা হয়েছিল! আয়, একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুধ দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উলটে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই যে তিনি তোর জন্যে না কেঁদেছেন। আয় আজ একবার তার শোধ তুলব। বাপরে বাপ, কী দুষ্টু ছেলে গো! গণেশঠাকুর — তাঁর সঙ্গে লাগা!'

রিদয় গোরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল — যদি তারা গণেশঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনো দিন আর সে কারও কাছে কোনো অপরাধ করবে না; কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না। সে আস্তে আস্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশুপাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না! গণেশের দেখা যদিই বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই-বা ঠিক কী! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারা রিদয় বেড়ার ধারে মুখ চুন করে এসে বসল। এ জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক্ হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না! সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমনকী ভিন-গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই বুড়ো-আংলা দেখতে দলে দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেবে নীচে বড়ো বড়ো করে লিখে — 'আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন — ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!' হয়তো-বা কোনোদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিট-মারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে জাদুঘরের কাঁচের সিন্দুকে চাবি দেওয়া হবে! রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল! আর সে মানুষের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারবে না, সবাই তাকে দেখলে যক্ বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘরবাড়ি — রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। খড়ের চাল ছোটো ছোটো তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোটো রান্নাঘরখানি; তার চেয়ে ছোটো গোয়ালঘর; ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারিদিকে চারটিখানি শাকসবজি। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু — কখানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল গাছটি নিয়ে কী সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি! অ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর কখানির উপর কী আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটেছে, নদী চলেছে— কলকল, কুলকুল, ফুরফুর! চারদিক আজ উল্সে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয়—একলাটি মুখ চুন করে। সে ভাবছে, কোথায় যাবে—কী করবে? সে যক্ হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে। গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক্ হয়ে থাকা ছাড়া আর কী উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতালপুরীতে সে কিছুতে যেতে পারবে না! এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াল! এইসময় শেওলায় পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলি আস্তে আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলি শুধোলে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?'

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে ঢিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে, আমি কৈলাস পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশঠাকুরের ছিচরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

গুগলি উত্তর করলে, 'আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।'

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে, 'কতদিনে সেখানে পৌঁছবেন?'

'যে কয়দিনে পারি।' বলে গুগলি রিদয়কে শুধোলে, 'কৈলাস পর্বতে তুমি কহন পৌঁছাবে?'

'বোধ হয় দু-চারদিনে।' বলে রিদয় আস্তে আস্তে গুগলির সঙ্গে চলল।

গুগলি খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'আমি বোধ করি দ্যেড় দিনট্যেকের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌঁচে যাব, কী বলো?'

রিদয় এবার ঘাড় নেড়ে বললে, 'তা কেমন করে হবে? যে গুটিগুটি আপনি চলেছেন, তাতে ওই হাঁসপুকুরে পৌঁছতেই তো আপনার একদিন লাগবে।'

গুগলি বললে, 'ওহান থিকে না হয় বড়ো জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সমুদ্দুর।'

রিদয় হেসে বললে, 'তবেই হয়েছে! পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপরে সবজিখেত, তার ওধারে তেপান্তরের মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম, গ্রামের পর বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তার পরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর — যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড় দিন কী, দেড় বছরে সেখানে পৌঁছতে পারেন কি না সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান।'

গুগলি ভাবলে রিদয় তার সঙ্গে মশকরা করছে। সে আকাশে নাক তুলে বললে, 'আর তুমি ভাবছ দিন-চারেকে কৈলাস পর্বতে যাবা—এই পিঁপড়ার মতো সরু সরু ঠ্যাং চালিয়ে? যদি দিনরাত চলে যাতি পার, তথাপি চার বছরে তুমি সেহানে পৌঁছতি পার কি না সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পরপর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ নগর, সে নগর; উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ ঘাট, ও ঘাট, সে ঘাট; এ মাঠ, ও মাঠ, সে মাঠ; এ বন, ও বন, সে বন; তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকা বাদ পাহাড়তলি, তৎপরে চিত্রকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়পর্বত; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলাগিরি, তৎপরে মানস সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরও ওধারে কৈলাস পর্বত। এই নদ-নদী পাহাড়-জঙ্গল ভাংতি ভাংতি সেহানে যাওয়া গঙ্গাফড়িংটির প্রায় তোমার কর্ম! পক্ষীরাজ ঘোড়া যে, সেও সেহানে যাতি পারে না চার হপ্তায়, তুমি তো তুমি! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বইসা থাহ; কৈলাসের আশা ছাড়ি দ্যেও।'

রিদয় বললে, 'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই!'

গুগলিও বললে, 'আমিও যেহ্যনে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেদ্ধোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়ুমনি।'

ঠিক সেইসময় খোঁড়া হাঁস, পুকুর থেকে ছপছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

‘মানস সরোবর!’ বলে হাঁস হেলতে-দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড়ো সুবিধে, মানস সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার মা সুবচনী ব্রত করতে যে খোঁড়া হাঁস পুষেছিলেন, তারই সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

চলন বিল

মানুষ যেমন, গুগলিও তেমনি হাঁটা পথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটা পথের খবরই গুগলি রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটা পথ যেমন, তেমনি আকাশের উপর দিয়ে জলের নীচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গোরু, গুগলি, শামুক — এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেক দিন লাগে। মাছেরা এঁকেবেঁকে এ নদী সে নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরও অল্প দিনে ঠিকানায় পৌঁছোয়। আর পাখিরা নদী-ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে — সবচেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানা দিকে নানারকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে — এইসব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়। এ ছাড়া বড়ো পাখিরা যে রাস্তায় চলে ছোটো পাখিরা সেসব রাস্তায় গেলে, তাদের বিপদে পড়তে হয় — হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই!

আবার বড়ো পাখিদের যে পথে কম বাতাস, সে পথে গেলে ওড়াই মুশকিল — ডানা নাড়তে নাড়তে কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়। বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠান্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না — শীত জমে যাবে। কোনো রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ ছাড়া জোয়ার-ভাঁটার মতো অনুকূল-প্রতিকূল দু-রকম হাওয়া বইছে — যেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সেজন্য যেদিক দিয়ে গেলে বন পাবে, নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দুদণ্ড বসে জিরোতে পাবে — এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল করছে; জলে ধোঁয়ায় ঝাপসা এইসব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয়; না হলে ডানা ভিজে ভারী হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে, একদিকে যেতে আর-এক দিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝনঝট বাতাসের পথে আছে; কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝারি মতো সব দলপতি পাখি থাকে। পান্ডারা যেমন দলেদলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে, তেমনই এরাও ভালো ভালো রাস্তার খবর নিয়ে দলে দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে — উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর এক ধার থেকে আর-এক ধারে নানা দেশে নানা স্থানে।

মানুষ যখন এক দেশ থেকে আর-এক দেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরিব, এমনকী সন্ন্যাসী সে-ও এক লোটা, এক কম্বল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দুটো মোয়া, নয়তো দু-মুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয়; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে
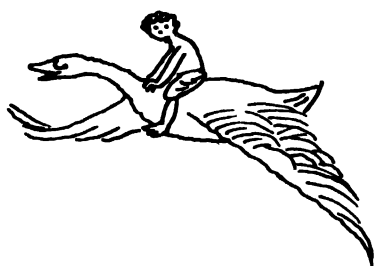
কিছু খেয়ে নিয়ে — এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিংবা জলায়, কোথাও-বা চরে, ঘাটে-ঘাটে জিরিয়ে খেয়েদেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্ছাদের জন্যে দূর থেকে পাখিরা মুখে করে, গলার থলিতে ভরে খাবার আনে; আর টিয়ে পাখি ঠোঁটে ধানের শিষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময় সময় এদিকে-ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল বেঁধে যখন তারা পান্ডার সঙ্গে দূরদূর দেশে যাত্রা করে বেরোয় তখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না — একেবারে ঝাড়াঝাপটা হালকা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়ে বাঁশি দিতে দিতে স্টেশনে স্টেশনে নতুন নতুন লোক ওঠাতে ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ দিয়ে ডাক দিতে দিতে চলে, আর এ গ্রাম সে গ্রাম, এ দেশ সে দেশ, এ বন ও বন থেকে যাত্রীপাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত এক দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে দলে যাতায়াত করে ডাকহাঁক দিতে দিতে —হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শলিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকি— ছোটো-বড়ো নানা পাখি!

খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে মানস সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে দলে বক, সারস, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, বালুহাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এইসব পাখির দল পুবে সনদ্বীপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দু-ভাগ হয়ে, এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহানা ধরে গঙ্গা-যমুনার ধারে ধারে হরিদ্বারের পথ দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে মানস সরোবরে; আর-এক দল চলেছে — মেঘনা নদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিংঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে, আসামের জঙ্গল, গারো পাহাড় খাসিয়া পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরির উত্তর-গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিমমুখে মানস সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পুবে ঘুরে পড়েছে মানস সরোবরে; আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উত্তর-পুব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস সরোবরে — যেন বেড়ির দুই মূল একটি জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দরবন আর আমতলি; মাঝখানে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র সুজলা সুফলা সোনার বাংলাদেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বেহার অঞ্চল।

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে আপনার মনেই বকতে বকতে চলল — 'উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিঁড়ে পড়ছে। কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! এত দূরে মানস সরোবর কে জানে গো — এ্যাঃ!' খোঁড়া হাঁস হাঁপাচ্ছে আর বকছে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্গু। সে অনেক কষ্টে খালধারে — যেখানে গোটাকতক বক, গোঁটাকতক পাতিহাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলুঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল!

রিদয় কী করে? একটা কচুপাতার নীচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল — দলে দলে হাঁস উত্তরমুখে উড়ে চলেছে — নানা কথা বলাবলি করতে করতে! রিদয় শুনলে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে বলতে পথ চলেছে।

সেথো হাঁসেরা বললে, 'থাকে থাকে ফলের গন্ধ লাগছে নাক।'

অমনি পান্ডা হাঁস যে সব আগে চলেছে; জবাব দিলে, 'ছুটলে খোসবো বাদলা রাখে।'

সেথোরা বললে, 'নীচে বাগে নামল তালচড়াই!'

পান্ডা উত্তর করলে, 'উপরে বড়োই ঠান্ডা ভাই!'

সেথোরা বললে, ‘জাল টেনে মাকড় দিল চম্পট!’
পান্ডার জবাব হল, ‘এল বলে বৃষ্টি—চলো চটপট!’
সেথোরা বলে, ‘ফুল সব দিল ঘোমটা টেনে।’
পান্ডা বললে, ‘এল বিষ্টি এল হেনে!’
‘ছুঁচোয় গড়েছে মাটির ঢিপি।’
‘বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।’
‘সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।’
‘ঝড়জল বুঝি এবার এল।’
‘কাক যে বাসায় একলা বড়ো?’
‘গতিক খারাপ; নেমে পড়ো, নেমে পড়ো।’

অমনি সব হাঁস ঝুপঝুপ করে খালে-বিলে নেমে পড়ে আপনার আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে-দেখতে ঝোড়ো বাতাস ধুলোয় ধুলোয় চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে বড়ো বড়ো গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডালপাতা উড়িয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল। তারপরই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল — খাল-বিল ভরতি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল; তখন দলে দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল — আকাশ-পথে আগের মতো বলাবলি করতে করতে —

‘মাকড় আবার জাল পেতেছে।’
‘আর ভয় নেই — রোদ এসেছে।’
‘মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।’
‘বাদলের ভয় নাইকো মোটে।’
‘বনে বনে ওঠে পাখির সুর।’
‘উড়ে চলো, পার যতদূর।’
‘আকাশ জুড়িল রামধনুকে!’
‘চলো — গেয়ে চলো মনেরই সুখে।’

আগে আগে পান্ডা হাঁস চলেছে, পিছে পিছে তিরের ফলার মতো দু-সারি হাঁস ডাক দিতে দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল, ‘পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!’ বুনোহাঁসের ডাক শুনে পোষাপালা খালের-বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যেখানে ছিল জবাব দিলে, ‘যে যাক, আমরা নয়।’ মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলছে—‘যাব না’, কিন্তু আকাশ এমনই নীল, বাতাস, এমনই পরিষ্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি — ওই আলো-মাখা হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে হুহু করে! যেমন এক-এক দল বুনো হাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই পালাই করছে। দু-চারটে বা ডানা ঝটপট করে এক-একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি বুড়ি হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, ‘এমন কাজ কোরো না, আকাশপথে চলার কষ্ট ভারী, পাহাড়দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না।’

বুনোহাঁসের ডাক শুনে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস উড়ে পড়তে আনচান করতে লাগল। সে বকতে লাগল, 'এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে খুঁড়িয়ে চলতে!'

সনদ্বীপ থেকে বালুহাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে; এবারে সেই দূর-দূরের যাত্রীরা, আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে চলতে ডাক দিতে থাকল টানা সুরে, 'মানস সরোবার! ধৌলাগিরি!'

খোঁড়া হাঁস অমনি উলুঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে, 'আসছি, একটু রও, একটু রয়ে ভাই, একটু রয়ে চলো!' তারপর সে তার সাদা দু-খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু-চার হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল — বেচারা কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া হাঁসের ডাক বালুহাঁসেরা শুনেছিল বোধ হয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে তারা দেখতে লাগল যাত্রী আসছে কি না! সুবচনীর হাঁস আবার চেঁচিয়ে বললে, 'রও ভাই, একটু রয়ে!' তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে — 'আমিও যাব' বলে ঝুলে পড়ল।

খোঁড়া হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময় হল না, দু-জনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠেছে — এমনি বেগে যে, মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে এত উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি — এমনটা হবে! এখন আর নামবার উপায় নেই — পায়ের তলায় মাটি কত দূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্ছে। রিদয় হাঁফাতে হাঁফাতে অতি কষ্টে গাছে চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এমনই গড়ানো হাঁসের পিঠ যে, সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায় — রিদয় ক্রমেই পিছনে পড়তে যাচ্ছে! দু-খানা সাদা ডানার ওঠা-পড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন সাদা দুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে দুলতে দুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া হাঁসের পিঠের পালক দুই মুঠোয় ধরে, দু-পায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এককুড়ি একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁকডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্য উড়ে চলা আর-এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি জোড়া দাঁতের মতো ঝপাঝপ উঠছে-পড়ছে জোরালো ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজবিজ করছে! শুনছে কেবল বাতাসের ঝপঝপ, সোঁ-সোঁ, আর থেকে থেকে হাঁসেদের হাঁকডাক! উপর আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কী মাটির কাছ দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না!

উপর আকাশে এমন পাতলা বাতাস যে হঠাৎ সেখানে উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয়, কাজেই নূতন সেথো, খোঁড়া হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালুহাঁসের দল নীচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি দুটো রেলগাড়ি পুরোদমে ছুটেছে আর তারই মাঝে এতটুকু সে দুলতে দুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে। তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছড়িয়ে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে

দেখছে যেন সবুজ-হলচে রাঙা মেটে নীল এমনি পাঁচ রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেইসময় বাখরগঞ্জের ধানখেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন শতরঞ্জ খেলার ছক নীচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে, 'বাস রে! এত বড়ো খেলার ছক, রাবণে দাবা খেলে নাকি?' অমনি যেন তার কথায় উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে, 'খেত আর মাঠ, খেত আর মাঠ—বাখরগন্‌জো!' তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধানখেত—নতুন শিষে ভরে রয়েছে! হলচে ছকগুলো সরষেখেত—সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে! মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনও সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে ধারে গাছের সার। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালি, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছক-কাটা ডোরা-টানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর ঘর, পাড়া পাড়া ভাগ করা হয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে ধারে খয়েরি রং—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান—মাটির পাঁচিল-ঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রুপোলি ডোরার নকশা—আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে-ওখানে কারচোপের কাজ!—যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্চি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলেছে, 'বাঃ, কী তামাশা!' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল, 'সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাংলাদেশ!'

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালোমানুষটির মতো পিটপিট করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিটমিট করে একটু-আধটু হাসতেও থাকল—খুব ঠোঁট চেপে। দলে দলে কত পাখি—কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এ দল ও দলকে শুধাচ্ছে—এদিকের খবর, ওদিকের খবর—'খবর কী ভাই, খবর কী?' অমনি বলাবলি চলল 'ওধারে জল হচ্ছে।' 'এ-ধারে রোদে পুড়ছে।' 'সেধারে ফল ফলেছে।' 'এধারে বউল ধরেছে।' রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ওধারে এখনও কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে; জল হিম; গাছে এখনও ফল ধরেনি! অমনি তারা ঢিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে লাভ কী, বলে তারা এ গ্রাম সে গ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে করতে ধীরে-সুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। 'কোন গ্রাম?' 'তেতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি—খটখটে।' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুরানির মাঠ—জলে থইথই।' 'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট—গুগলি ভরা।' 'কোন হাট?' 'উলোর হাট—খড়ের ধুম।' 'কোন নদী?' 'বিষনদী—ঘোলা জল।' 'কোন নগর?' 'গোপালনগর—গয়লা ঢের।' 'কোন আবাদ?' 'নসীরাবাদ—তামুক ভালো।' 'কোন গঞ্জ?' 'বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।' 'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার—পলতা মেলে।' 'কোন বন্দর?' 'বাগা বন্দর—হুক্কাহুয়া।' 'কোন জেলা?' 'বুবুলি জেলা—সিঁদুরে মাটি।' 'কোন বিল?' 'চলন বিল—জল নেই।' 'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর—

'কোন গ্রাম?' 'তেঁতুলিয়া,' 'সাবেক তেঁতুলিয়া।'
'কোন শহর?' 'নোয়াখালি — খটখটে।'
'কোন মাঠ?' 'তিরপুরানির মাঠ — জলে থইথই।'
'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট — গুগলি ভরা।'
'কোন হাট?' 'উলোর হাট — খড়ের ধুম।'

কেবল কাদা।' 'কোন দিঘি?' 'রায় দিঘি—পানায় ঢাকা। 'কোন খাল? 'বালির খাল—কেবল চড়া।' 'কোন ঝিল?' 'হিরা ঝিল—তীরে জেলে।' 'কোন পরগনা?' 'পাতলে দ—পাতলা হ।' 'কোন ডিহি?' 'রাজসাই—খাসা ভাই।' 'কোন পুর? 'পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।' 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুরবাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।' 'কার কাচারি?' 'নাম কোরো না, ফাটবে হাঁড়ি!'

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো সব যেমন যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কী পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ — কোথায় কী খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত! মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর' কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ; লোকগুলোও চোয়াড়; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল — 'নরককুণ্ড'। কোনো দুঁদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নাম দিয়েছে, 'অলকাপুরী'; কিন্তু সেখানে কোনোদিন কারু পাত পড়ে না; শেয়াল-কুকুর কেঁদে যায়; পাখিরা মিলে সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়াবাড়ি'। হয়তো একটা পাড়া — সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা; তারা দিনে মালা জপে, রাতে বাড়ি বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে; সে জায়গাটার নাম মানুষ দিলে 'বৈরিগি পাড়া'; কিন্তু পাখিরা তাকে বললে নিগিরিটিং — ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনিই সার! হয়তো এক ভালো পরগনার জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে 'খোলা মুচি'; কিন্তু পাখিরা দেখছে সেখানে ধান খুব, ফল ভালো, ভালো জমিদার; বন্দুক-হাতে শিকারে বেরোয় না; অমনি সে পরগনার নাম তারা হাঁকলে, 'রাজভোগ — সাবেক রাজভোগ — হাল রাজভোগ।' হয়তো 'রাজভোগ' যেমন, তেমনই কোনো ভালো পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল — সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠিসোটা; মানুষ সে পরগনার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশালচুলি'।

কোনো কোনো জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভালো মানুষ, ভালো আবহাওয়া, ভালো খাওয়াদাওয়া, খাল-বিল হাট-বাজার গুলজার; সেখানকার কুঁকড়ো বুক ফুলিয়ে হাঁকলে, 'মনোহরনগর — সাবেক মনোহর-নগর — হালে মনোহর।' এমনি যেখানে পাখিদের সুখ, সেসব জায়গায় নাম এক-এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে — যেমন যেমন হাঁসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, 'সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ!' যেখানে ফলফুলুরি ফসল ঢের, সেসব জায়গার কুঁকড়োরা হাঁকছে, 'দানাসিরি, লাঙলবাঁধ, উলুর হাট, আমতাজুড়ি, জাঙ্গিপুর।' হাঁস — পদ্মনাল এমনি সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এসব জন্মেছে, সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে, 'সাতনল, নলচিটে, পাতের হাট, বেতগাঁ, বেতাজি সোলাভাঙা, শাকের হাট।' যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে, 'ঝালকাটি, কাটিপাড়া, আশাশূন্যি, সন্ন্যাসীহাট।' যেখানে ছায়া-করা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো, 'কমলাবাড়ি, ফুলঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলামুখ।' যেখানে ছোটো-বড়ো নদী, ছোটো-বড়ো মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে, 'চাঁদপুর, ইলশেঘাট, ব্যাঙধুই, বোরালিয়া, বোয়ালমারি।'

রিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তরমুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ গ্রাম সে গ্রাম, এ খেত ও খেত, এ বিল ও বিল, করে হরিংঘাটা, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে দেখতে চলেছে — বাংলাদেশের সুন্দরবন, ধানখেত, পদ্মদিঘি, বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না।

বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল — পুবমুখো।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু-জাতের হাঁস — এরা কোনোদিন কোথাও যেতেও চায় না, নড়তেও চায় না — ভারী কুনো! বুনো হাঁস এদের দেখলেই তামাশা করতে ছাড়ছে না। তারা উপর আকাশ থেকে একের পর একে ডেকে চলল, 'পাহাড়তলি, কামরূপ, ধৌলাগিরি, মানস সরোবর — চলেছি, চলেছি!' অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে, 'যেয়ো না যেয়ো না, বড়ো শীত যেয়ো পরে, যেয়ো পরে।'

বুনোহাঁসের দল আরও নীচে নেমে একসঙ্গে বলে উঠল — 'ভারী মজা, উড়তে মজা — শীতে মজা — পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব; চলে এসো না!'

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারী চটবে; এবারে বুনোহাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালুহাঁসের দল একেবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল, 'ওরে হাঁস নয় রে — ভেড়া!' তারপর হাঃ-হাঃ করে হাসতে হাসতে ডানায় তালি দিতে-দিতে আবার আকাশে উঠল। নীচে থেকে ঘোরাহাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে, 'মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শিল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভুঁয়ে মর!'

এমনি হসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দুরবস্থা ভেবে — সে যে মা-বাপ ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সেকথা মনে করে — এক-একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হুহু করে উড়ে চলায় কী মজা, কত আনন্দ! বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা ফুলের খোসবো, কোথাও পাকা ফলের কী মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি! মেঘের উপর দিয়ে জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে চলতে চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই — কেবলই আনন্দে উড়ে চলা দিন রাত!

চকা-নিকো ব

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস এইসব বুনোহাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, আর এ গ্রামের, সে গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মশকরা করতে পেয়ে, ভারী খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এতকাল পালা-হাঁসই ছিল — ওই সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে। বুনোহাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়! খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না। মধ্যে থেকে এক-এক করে প্রায় আট হাঁস পিছিয়ে পড়ছে। সেথো হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পান্ডা হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে, 'চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!'

চকা উড়তে উড়তেই শুধোলে, 'ক্যাঁন্-ক্যাঁন্ কও ক্যাঁন্?'

সেথোরা বললে, 'পিছিয়ে পোলো খোঁড়া ঠ্যাং!'

আগের মতো সোঁ-সোঁ করে চলতে চলতেই চকা বলে উঠল—

'জোরে চলায় নাই কোনো দায়,
আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!'

অমনি সব হাঁস একসঙ্গে বলে উঠল, 'চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।'

চকার কথামাফিক খোঁড়া হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দু-গুণ হাঁপিয়ে পড়ল; আর সে আস্তে আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো হাঁসরা আবার ডাক দিলে, 'চকা-নিকোবর—চকা-চকা-চকা!'

এবার চকা গরম হয়ে বললে, 'ক্যেন্ করো ভ্যেন্ ভ্যেন্?'

সেথোরা বলে উঠল, 'খোঁড়া হাঁস তলিয়ে যায়!'

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল তেমনি পুরোদমে যেতে যেতে বললে, 'বলো ওকে হালকা হাওয়ায় উঠে আসতে।

'নীচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,
ডানা নেড়ে নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।
উপর বাতাস পাতলা ভারী,
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।'

খোঁড়া হাঁস চকার কথায় উপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু এবার বাতাস ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার জোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিলে, 'চকা! চকা!'

'কেনে? চলতে দিবে না নাকি!' বলে চকা গোঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে, 'খোঁড়া বেচারার প্রাণসংশয়!'

চকা রেগে উত্তর দিলে—

'উড়তে না পারে ঘরে যাক,
খাকদাক বসে থাক।
কে বলেছে উড়তে ওরে,
ভিড়তে দলে রঙ্গ করে?'

খোঁড়া হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনোহাঁসরা কেবল তামাশা দেখবার জন্যে তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে—মানস সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কী আপশোশ! ডানা যে তার আর চলছে না! না হলে খোঁড়া হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার বুনোহাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা-নিকোবর—এমন হাঁস নেই যে একে জানে না; এই একশো বছরের বুড়ো হাঁস, যার সঙ্গে পয়লা-নম্বর হাঁসও উড়ে পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারই পাল্লায়! যে চকা পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারই সামনে! এ দুঃখু সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে ভাবতে চলল — বাড়ি ফিরবে, কি, প্রাণ যায় তবু সমানে বুনোহাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সে-ও জানে উড়তে! রিদয় এইসময় খোঁড়াকে বললে, 'সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছ, আর কেন? এইবার ফেরো। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে দম ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের মতলব ভালো বুঝছিনে!'

রিদয় কিছু না বললে হয়তো খোঁড়া আপনা হতেই বাড়িমুখো হত; কিন্তু এই বুড়ো-আংলা, এ-ও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল, 'ফের কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে ফেলে চলে যাব।' বলেই রেগে ডানা আপসে খোঁড়া এমনি তেজে উড়ে চলল যে বুনোহাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে গোঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে তেজ থাকত কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠিক সেইসময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। অমনি হাঁসরা সবাই জমিমুখো হয়ে ঝুপঝাপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদি-চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজে কাদা তখনও কালো প্যাচপ্যাচ করছে— মাঝে মাঝে ডোবায় এখনও জল বেঁধে আছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে, এরই উপরে সন্ধের হিম-হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায় যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সেদিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সেদিকে মানুষ কী গোরু কিছুই নেই। চারিদিক সুনসান! মেঘনার মাঝে লাল ফানুসের মতো রাঙা সুয্যি পশ্চিম আকাশে রামধনুকের রং টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল সে যেন কোথায় কত দূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়েছে! বেচারা সমস্ত দিন খেতে পায়নি। তার কেবল কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই— কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় সে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘরবাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়! ওধারে বনের তলাটা যেন নিঝুম হয়ে আসছে! ঝিমঝিম সেখানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুস-খাস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফুর্তিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারা মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে! কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই চোখ বুজে সে কেবলই জোরে জোরে শ্বাস টানছে— যেন আধমরা!

রিদয় তার সঙ্গের সাথি খোঁড়া হাঁসকে বললে, 'একটু জল খেয়ে নাও — এই তো দু-পা গেলেই নদী!' কিন্তু খোঁড়া সাড়াশব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্টু নেই। এই খোঁড়া হাঁস এখন আর শুধু হাঁস নয় —তার বন্ধু, সাথি সবই। সে আস্তে আস্তে তার গলাটি ধরে উঠিয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোটো, হাঁস বড়ো; কিন্তু প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে-কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুকচুক করে জল খেয়ে নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনোহাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল, খোঁড়া হাঁসের কোনো খবরই নেয়নি; দিব্যি চান করে ডানা ঝেড়ে গুগলি-শামুক শাকপাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়ের হাঁস জলে নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাঁকাল মাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা!'

হাঁসের কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল সেই খোঁড়া হাঁসের গলা ধরে তার দু-ঠোঁটে দুটো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে — রাঁধি কীসে? অমনি মনে পড়ল — সে যে এখন আর মানুষ নেই, যক্ হয়েছে; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদয়ের ট্যাঁকে এটা-ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে-কাঠির মতো ছোটো হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোটো ছোটো করে বানিয়ে কতক কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপিচুপি বললে যে চকা-নিকোবরের দল পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপিচুপি বললে 'তা তো দেখতে পাচ্ছি।'

খোঁড়া হাঁস গলা ফুলিয়ে বললে 'মজা হয়, যদি একবার এদের সঙ্গে সমানে আমিও মানস সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা হাঁস কী করতে পারে তবে ওরা টের পায়।'

'তা তো বটেই!' বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল 'আমার মনে হয় একলা আমি এতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চলো, তবে আমি সাহস করি।'

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকেই সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে বললে, 'দেখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জ্বালাতন করেচি।' কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে—জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই সে খোঁড়া হাঁস মনে রেখেছে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে, 'কোনো ভাবনা নেই, আসছে শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না—প্রতিজ্ঞা করছি!'

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক্ হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো! কী জানি, মানস-সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলো ডানার ঝটাপট শোনা গেল। এক-কুড়ি বুনোহাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপর মাঝে চকা-নিকোবরকে রেখে সারিবন্দি সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। খোঁড়া হাঁস বুনোহাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস মাত্রে পোষা হাঁসের মতো দেখতে; আর ধরন-ধারণও সেইরকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনোহাঁসগুলো বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোঁট্টা কাটখোট্টা-গোছের। এদের রং তার মতো সাদা নয়, কিন্তু ধুলোবালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরি, খাকির ছোপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয় — হলুদবর্ণ — যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে এসেছে হাঁস চলে হেলতে-দুলতে — পায়ে পায়ে; কিন্তু এরা চলছে খটমট চটপট — যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী — চ্যাটালো, কেটো-কেটো, ফাটা-চটা—হতকুৎসিত!

দেখলেই বোঝা যায় যেখানে-সেখানে শুধু পায়ে এরা ছুটে বেড়ায় — জলকাদা কিছুই বাছে না। তাদের ডানার পালক, গায়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝকঝক করছে বটে কিন্তু ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে — যেন সে কে, কী বৃত্তান্ত, এসব কথা বুনোহাঁসদের না বলে। তারপর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা-নিকোবর, খোঁড়া হাঁস আর বুনোহাঁসদের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘাড় নেড়ে নমস্কার প্রতি-নমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে, 'এখন বলো তো, তোমরা কে? কোন জাতের পাখি?'

খোঁড়া আস্তে আস্তে বললে, 'কী আর পরিচয় দেব? গেল বছর ফাগুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টি খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।'

চকা-নিকোবর নাক তুলে বললে, 'তুমি তবে নেহাত সাধারণ হাঁস দেখছি। খেতাব, মানসম্ভ্রম, বোলবোলা — কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি?' খোঁড়া হাঁস খোঁড়া পা-টি নাচিয়ে বললে, 'আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।'

চকা হেসে বললে, 'সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজি তুমি?'

এক হাঁস অমনি বললে, 'ওড়ার কাজে কেমন যে তুমি মজবুত তা তো দেখিয়েচ!'

অন্যে বললে, 'হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।'

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।' খোঁড়া হাঁস ভেবেছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছেকথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভালো—যা থাকে কপালে!

চকা শুধোলে, 'সাঁতার জানো না, তবে দৌড়তে মজবুত বোধ হয়?' বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া হাস গম্ভীর হয়ে বললে, 'রাজহাঁস কোনোদিন ছুটে চলে না, তাই ছোটা আমার অভ্যেসই হয়নি।' বলে সে খোঁড়া পা আরও খুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি, 'তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।' কিন্তু ঠিক তার উলটো হল। চকা-নিকোবর দু-চারবার ঘাড় নেড়ে বলল, 'তুমি তো বেশ সাফ সাফ জবাব দিলে — একটু ভয় না করে! ভালো, ভালো, তোমার সাহস আছে — সময়ে লায়েক হতে পারবে — বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত। দু-দিন এ দলে থাকো, দেখি তোমার হিম্মৎ কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কী বলো?'

খোঁড়া হাঁস ঘাড় নেড়ে বললে, 'আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি!'

এইবার চকা-নিকোবর বুড়ো-আংলা রিদয়ের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে 'একী, এ কোন জানোয়ার? ভারী তো অদ্ভুত!'

খোঁড়া হাঁস তাড়াতাড়ি বললে, 'এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাজে লাগতে পারে।'

চকা নাক তুলে উত্তর করলে, 'বুনোহাঁসের কোনো কাজে লাগবে না। — পোষা হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কী?'

মানুষের নাম বললে পাছে বুনোহাঁসেরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া হাঁস অনেক ভেবে বললে, 'ওর নাম অনেকগুলো। আমরা ওকে ডাকি বুড়ো-আংলা বলে। আঃ, বড়ো ঘুম পাচ্ছে।' বলেই খোঁড়া দুবার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছে, 'মাগো, চোখ আপনা হতেই ঢুলে আসছে! চলরে বুড়ো-আংলা, ঘুমোবি চল।'

চকা-নিকোবর বড়ো পাকা হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে ল্যাজের পালক পর্যন্ত রুপোর মতো সাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চুনের হাঁড়ি; পা দুটো যেন চ্যালাকাঠ—বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা দুটো যেন দু-খানা ঝরঝরে বাঁশের কুলো; ঠোঁট ভোতা; গলা ছিনে-পড়া; কিন্তু চোখ এখনও জোয়ান হাঁসের চেয়েও ঝকঝকে —যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে, 'আমি কে, জানো তো? আমার নাম—চকা-নিকোবর! আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখেছ, ইনি আমার ডান হাত বললেও চলে, এঁর নাম পাঁপড়া নান্‌কৌড়ি। এই আমার বাঁ-হাত, এঁর নাম নেডোল-কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা, আন্ডামানি; বাঁয়ে হলেন—চোক-ধলা ডানকানি। তারপরে পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারগুই চপড়া, তিরশুলি আকায়ব, সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগনার সরাল। আরও ডাইনে-বাঁয়ে দেখো—লুসাই, তিব্বতি, তাতারি—এমনি সব বড়ো বড়ো খেতাবি হাঁস—কেতাবে যাদের নাম উঠেছে! আমরা কি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে-তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠা-বসা করতে চাও তো পষ্ট করে ওই বুড়ো-আংলাটির গাঁইগোত্তর পদবি-উপাধি বলো, নয়তো নিজের পথ দেখো!'

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারলে না; সে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার নাম ছিল—ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুণ্ড, ফুলুরি গাঁই, কাশ্যপ গোত্র—পুষ্যিপুত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি—হাঁসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলেম, সকলে এখন —' আর বলতে হয় না; মানুষ শুনেই চকা-নিকোবরের দল দশ হাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললে—'যা ভেবেছি তাই! সরে পড়ো। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারী বজ্জাত তারা!'

খোঁড়া হাঁস আমতা আমতা করে বললে — 'এইটুকু মানুষ, ওকে আবার ভয় কী? কাল ও তো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না! এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল-কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর মানুষ নেই—যক্ হয়ে গেছে!'

চকা 'যক্' শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'বাপু, মানুষজাত খারাপ, বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাকো, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে ও যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ি আমরা হব না—এইবেলা বুঝে দেখো!'

খোঁড়া হাঁস পিছোবার পাত্র নয়; সে বললে, 'সে ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটলেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভালো জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড়ো জোর-কপাল যে চকা-নিকোবরের সঙ্গে এক চরে শুতে পেয়েছে! চকার বাছা বাগদি চর; এতে শুয়ে আরাম কর।' বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে।

চকা খোশামোদে খুশি হয়ে বললে, 'তা হলে কাল কিন্তু ওর বাড়ি ফেরা চাই— কেমন?'

খোঁড়া বললে, 'ওর সঙ্গে তা হলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওকে ছাড়ব না!'

চকা-নিকোবর উত্তর দিলে, 'তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পার, ইচ্ছে হয় ফিরতে পার।' এই বলে চকা চরের মধ্যিখানে উড়ে বসল।

একে-একে বুনোহাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া হাঁস রিদয়ের কানে কানে বললে, 'চরে বড়ো হিম; যত পার শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।' রিদয় দু-বোঝা শুকনো কুটোকাটা হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নামিয়ে বললে, 'ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও; আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে ঢুকে পড়ো, আর ঠান্ডা লাগবে না।' রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস, 'এই আমায় তুমি আরামে রাখো, আমি তোমায় গরমে রাখি'—বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল. রিদয়ের মনে হল যেন সে পালকের তোশকে শুয়েছে; সেও একটিবার হাই তুলেই চোখ বুজলে।

* * * * *

একথোকা শিরীষ ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো-আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একট কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর-একটা কাক, তারপর আর-একটা, আর-একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোমকাকের দল রিদয়কে চোখে-মুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না—'যকা-যকা' বলে এর মুখ থেকে ও তার মুখ থেকে সে, এমনি রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুড়ে দিতে দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে করতে চলছে দেখে বুদি গাই 'ওমা-ওমা' করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা কাকগুলোকে শিং দিয়ে গোঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে বেচারা মাটিতে—বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছোটাছুটি করতে লাগল।

খোঁড়া হাঁসও আকাশে কাক দেখে—'ক্যা-ক্যা' বলে একবার ডাক দিলে, কিন্তু দেখতে দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতিজলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে ঝুলতে চলা অন্য একরকম। রিদয় দেখলে জলাজমি যেন একখানা ফাটাফুটো গালচের উলটো পিঠের মতো পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কালো কতরকমের যেন শুঁয়ো-ওঠা পশমে বোনা, বাংলাদেশের পরিষ্কার ছককাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো আয়না-ভাঙা।

দেখতে দেখতে সুর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রুপো আর নানা রঙের উলে-বোনা কাশ্মীরি শালের মতো দেখাতে লাগল। তারপরে জলা পার হয়ে বনজঙ্গল মাঠঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল! কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়া হাঁস, কোথায়-বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি!

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাক ডাক দিলে, 'খবরদার!' অমনি সব কাক রিদয়কে নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল! চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঠিয়ে তার চারদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, 'তোরা যে আমাকে বড়ো ধরে আনলি!'

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে, 'চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব!'

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি! গোলযোগ করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কী করে, শুকনো মুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারালো ঠোঁট বাড়িয়ে এক চোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না কোট-পরা নতুন উকিল কৌঁছিলের মতো, চালাকচতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলো রুখো মড়মড়ে, যেন কালিতে ছুপানো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে-গেঁটে কাদামাখা খরখরে, ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো; একটা চোখ যেন ছানি-পড়া আর-একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো! কোথায় সাদা ধপধপে সুবচনীর হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব!

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপরে অনেক দূর থেকে হাঁসের ডাক এল, 'কোথায়—কোথায়—' রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বালিহাঁসও ডাক দিয়ে গেল, 'সেঙাত—সেঙাত!' বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাঁক দিলে, 'ওগোঃ ওগোঃ!' রিদয় বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে 'হেথায়' বলে চ্যাঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে, 'কিও! আয় দিই চোখ দুটো খুবলে!' রিদয় অমনি মুখ বুজে গোঁ হয়ে বসল!

হাঁসেরা চলে গেল, বুদি-গাইও ডেকে ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে, 'উঠাও!' দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে, 'বাপু তোমাদের মধ্যে কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে নিয়ে চলো, অমন ঝোলাঝুলি করলে আমার হাত-পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!'

ডোমকাক ধমকে বললে, চলো চলো, অত বাবুগিরিতে কাজ নেই। কাগে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব!'

এবারে ঝোড়োকাক এগিয়ে এসে বললে, 'মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙে দ করে নিয়ে গেলে ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কী বলেন?'

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে, 'তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি-বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখো পালায় না যেন?'

রিদয় দেখলে ঢোঁড়াকাকটা ওর মধ্যে দেখতে-শুনতে ভদ্দররকম, সে আস্তে আস্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণমুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকেরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বউ-কথা-কও পাখি বকুল গাছের আগডালে বসে বউকে শুনিয়ে কেবলই গাইছে—'কথা কও বউ কথা কও, মাথা খাও বউ কথা কও!' রিদয় অমনি বলে উঠল, 'কথা কইবে কী ছলে, কথা শুনলে গা জ্বলে!'

'কে রে?' বলে হলদি-পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে, 'কাকে-ধরা যক্! কাকে-ধরা যক্!'

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল, 'আবার কথা!'

আরও দক্ষিণমুখো গিয়ে রিদয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বউকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে, 'বুবু ওঠো দেখি ম্‌ম্‌।'

রিদয় অমনি বলে উঠল, 'আদর দেখো উহুঃ।'

ঘুঘু গলা তুলে বললে, 'কে রে কে রে?'

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে, 'কাকে-ধরা যক্!'

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে, 'ফের বকচিস, চুপ!'

টোঁড়াকাক বলে উঠল, 'বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা-তামাশা শিখেছি।'

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সব পাখিকে জানিয়ে দিতে দিতে চলল — তাকে কাকে ধরেছে!

এমনি বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিবমন্দির, তারই চুড়োয় ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বউকে শুনিয়ে রাগরাগিণীতে গলা সাধছে; বউ তার পঞ্চবটির বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে — 'সা রে গা মা পা — চারটে ডিমে তা, ধা নি সা — দুই জোড়া ছা।'

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল, 'কাগে খাবে গা!' শালিক 'কে ও?' বলে মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে, 'কাকে-ধরা যক্।'

যতই দক্ষিণদিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড়ো বড়ো নদী খালবিল, খেত, মাঠঘাট, গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর-একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলই ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, 'চেয়ে দেখ আমি তোরই চিরদিন আমি তোরই।'

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দু-জনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল, 'এয়সা দিন রহে থোড়ি রহে থোড়ি!'

'কে ও — কে ও?' বলে হাঁস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে, 'কাকে-ধরা যক্!' অমনি যাকে দেখে, তাকেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে দিতে রিদয় চলেছে!

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মঠের জমিতে নেবে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কি না সেদিকে কারু লক্ষ নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় টোঁড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বললে, 'মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক!' ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা টোঁড়াকাক জানত — ডোমরাজ নাক তুলে বললে, 'ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ!' টোঁড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভালো ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে টোঁড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে; সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্যসব কাক খেয়েদেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গান-গল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়কাককে শুধোলেন, 'দাদা চুপচাপ ভাবছ কী শুনি!'

দাঁড়কাক গলা খাঁকনি দিয়ে বললে, 'ভাবছিলেম এই তল্লাটে এক মিয়াসাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ওই মোছলমানের বিবিকে এত ভালোবাসত যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটে করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সেই লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল, না? তার নামটা কী মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোড়োকাক?'

পাতিকাক বলে উঠল, 'ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টমবাড়ির সেই কালো বেড়ালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টমবোয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত, কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে-কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?'

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে, 'মাছ-চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোশের ল্যাজ ঠুকরে দিয়েছিলাম; আর-একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কী, এমন সময় সেটা তার গর্তে সেঁধিয়ে গেল!'

আর-এক কাক বলে উঠল, 'আরে বাবা খরগোশছানা বেড়ালছানা এদের নিয়ে খেলা করছ—মানুষের কাছে কখনো এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিঙ্গির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবেলের রুপোর কাঁটা-চামচে চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি!'

রিদয় থেকে, থেকে বলে উঠল, 'এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এইবেলা ওসব চুরিচামারি ছাড়ো, না হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!'

'কী বলিস?' বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনই তাকে ছিঁড়ে খাবে।

টোঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠান্ডা করে বললে, 'ছেলেমানুষ কী বলতে কী বলেছে। থামো হে ওকে মেরো না, রাজা তা হলে ভারী দুঃখিত হবেন। মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই। ছোঁড়াটা না হলে সে কাজটা করে কে? তা ছাড়া এটা মানুষ, একে মারলে পুলিশ হাঙ্গামা হতে পারে।'

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে টোঁড়াকেই ধমকাতে লাগল, 'হাঃ মানুষ, ভারী তো উনি বড়োলোক যে ভয় করতে হবে, ঢের-ঢের অমন মানুষ দেখেছি—'

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে, 'চালাও! এবারে কাকের দল রিদয়কে নিয়ে কাকচিরার পতিত জমির দিকে চলেছে— গ্রাম-নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধু-ধু বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই গোরু নেই— কেবল আগুনের মতো রাঙা সূর্যটা পশ্চিমদিকে ডুবছে— সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভর সন্ধেবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দূত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকনি 'বা-বা-বা তোবা-তোবা' বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল আহ্লাদে ল্যাজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে, 'হুয়া—কয়েদ হুয়া, তোফা হুয়া!' চারদিকে হইচই ক্কা-ক্কা-হুয়া শব্দ উঠেছে, তারই মধ্যে টোঁড়া রিদয়ের কানে কানে বললে, 'আমি তোমার দিকে আছি, দেখো খবরদার ওদের কথা শুনে কোনো কাজ কোরো না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।'

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে টানতে শেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনিভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ডোমরাজা ডাকলে, 'ওঠো, যা বলি তা করো।' রিদয় যেন শুনতেই পেলে না, চোখ বুজে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটরার কাছে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে, 'খোল্ এটা।'

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে, 'খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।'

'খোলো আভি!' বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটরার গায়ে ঠেলে দিলে; রিদয় গোঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে — 'বাবা, যে মরচে-ধরা তালা। এ তো খোলা সহজ নয়, আজ খেয়েদেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে!'

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে এক ঠোকর বসিয়ে বললে, 'খোল বলছি!'

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কষিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে, 'ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!'

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না, 'তবে রে' বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দু-বার ডানা ঝটপট করেই অক্কা পেলে।

'হত্যা হুয়া, হত্যা হুয়া,' বলে শেয়াল চ্যাঁচাতে লাগল, 'ক্যা-ক্যা' বলে কাকেরা গোলমাল করে তেড়ে এল। ঢোড়া বোকা সেজে কেবলই রিদয়কে আড়াল করে করে ডানা ঝাপটাতে লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায়-পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু-চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে!

এতক্ষণ কাকেরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালি বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক-একটা তুলে বাসার দিকে দৌড় — চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে-যার ঘরে গেছে, তখন ঢোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে, 'তুমি জানো না আমার কী উপকার করছে। এসো আমার পিঠে চড়ো আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।'

এত হুটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে, ঢুলে পড়তে লাগল! ঘুমের ঘোরে তার যেন মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মতো হয়ে যাচ্ছে — কাক, বগ, হাঁস, শেয়াল সব একসঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমন সময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে, 'কোথায়?'

'হেথায়,' বলে যেমন রিদয় চেয়েচে অমনি দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন, 'কিছু ভাঙিসনি তো?'

রিদয় ভয়ে ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে—দু-বার মাথা চুলকে রিদয় একদৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোঁড়া হাঁস পাকুরপাড়ে একটা বুনোহাঁসের

সঙ্গে ভাব করছে—আর একটা ঝোড়োকাক চালে বসে 'কা-কা' করে ডাকছে—গোয়ালঘর থেকে কপলে গাই ডাক দিলে 'ওমঃ', ঠিক সেইসময় একটা গুগলি পুকুরঘাট বেয়ে আস্তে আস্তে জলে নেমে গেল।

রিদয় পুকুর পাড়ে হাঁ করে কী ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে, 'কী হল তোর?'

রিদয় মাথা চুলকে বললে, 'মা, আমি কি সত্যিই বড়ো হয়ে গেছি?' বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেইসময় ডালিম গাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল, 'ওকী! রিদয় হল কী!'

'মাথা আর মুন্ডু হল!' বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে, 'এত বড়োটি হলি তবু তোর ছেলেমানষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যা।'

ভূতপতরির দেশ

'মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলেন না যে খইমোয়াটা ধর।'

কিন্তু এবারে মাসি-পিসি দু-জনেই ডেকেছেন। আগে মাসির বাড়ি এসেছি পালকি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপতরি লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয় আলোয় যেতে।

হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে; ধপড়ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপতরির মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনো যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে ভূতপতরির মাঠ! দেখেই ভয় হয়। এই মাঠ ভেঙে দুপুর-রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেইছি; 'হুঁইয়া মারি খপরদারি!' 'বড়া ভারী খপরদারি!'

মাঠের মাঝে একটা শেওড়া গাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তারপরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়াতলা পর্যন্ত; তারপরে আর হাটও নেই, বাটও নেই; কেবল মাঠ ধুধু করছে।

এই শেওড়াতলায় পালকি এসেছে কী আর যত ঝিঁঝিঁ পোকা তারা বলে উঠেছে—'চললে বাঁচি!' 'চললে বাঁচি!' কেন রে বাপু একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? চললে বাঁচি! চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝিঁপোকার সরদার দুই লম্বা লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে, 'ওই আসছে চিঁচিঁ ঘোড়া চিঁচিঁ!' ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়াভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে! ওঠা রে পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়াভূত তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে!

ভয়ে তখন ভূতপতরির লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি, 'জগবন্ধু, রক্ষে করো, মাসিকে বলে তোমায় খইয়ের মোয়া ভোগ দেব।' বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খই জুঁইফুলের মতো ফুটন্ত ধবধব করছে খই—রাস্তা যেন আলো করে। ঘোড়াভূত কি সে লোভ সামলাতে পারে? খই খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়াভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কী অমনি তার ভূতুড়ে নিশ্বাসে খইগুলি উড়ে পালাচ্ছে! যেমন খইয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালায়! খইও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়াভূত চায় খই খায়, খই কিন্তু উড়ে উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খইয়ের পিছে খই উড়েছে বাতাসের আগে আমি চলেছি পালকিতে বসে ঘোড়াভূতের

ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটায় বড়ো অন্ধকার, বড়ো হাওয়া—যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লন্ঠনের মিটমিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খইও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি—আলো জ্বালো; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়; কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপতরির লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার জোগাড়। লন্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।

সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না—পালকিসুদ্ধু আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলাপুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! পথে জল খেতে দ্-মুঠো খই ছিল, তা তো ঘোড়াভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি, ভয়েও কাঁপছি। পালকি ধরে বীর-বাতাস এক-একবার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর হাঁক দিচ্ছি, 'সামাল, সামাল।' ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পালকিখানা ছাতার মতো বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধু নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। পিছনে 'ধর! ধর!' করে পালকি-বেহারাগুলো ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড়ো বড়ো কাঁটার বঁড়শি ফেলে বালির উপর মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখির পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শিতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শিতে গেঁথে। আর যাব কোথা? পালকিসুদ্ধু বালির উপর উলটে পড়েছি। বেহারাগুলো একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পালকির ডান্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে, কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা ছ-টা, তাদের আর টিকিও দেখা গেল না!

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে, মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপতরি লাঠি আছে তা তো বুড়ো জানে না! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে—সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পালকিটা ঠেলে তুলে বিছানাপত্তর পোঁটলাপুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে চুপটি করে বসে আছি—কখন বেহারাগুলো ফিরে আসে। মনসাবুড়োর গা বেয়ে দরদর করে সাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে। সে-ও কোনো কথা বলছে না, আমিও সাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো আমার দিকে চেয়ে বলছে, 'দেখছ কী? বড়ো আমোদ হচ্ছে, না? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে বসে তামাশা দেখছ, লজ্জা নেই! যাও না, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাজে যাও না!'

আমি বললুম, 'যেতে পারলে তো! পালকি-বেহারা নেই যে! তারা আসুক তবে যাব।'

শুনে বুড়ো হোহো করে হেসে বললে, 'কেন পা নেই নাকি? হেঁটে যেতে পার না? নবাব হয়েছ?'

আমার ভারী রাগ হল। বুড়োর বঁড়শির আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনও আমার ঝরঝর রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বললাম, 'পা দুটো কি আর রেখেছ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে!'

'লেগেছে নাকি?' বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বললে, 'একটু দই দাও, সেরে যাবে।'

আমি বললুম 'এই মাঠের মধ্যে দই! তামাশা করছ নাকি?' 'আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুলবাটা হলেও চলতে পারে।'

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখছে। 'বলি, ও দাদা! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছিনে, আর-একবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি?' বলেই ভূতপতরি লাঠিটা যেমন একটু বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে, 'রও রও, করো কী দাদা! বুড়োমানুষ কখন কী বলি, রাগ কোরো না। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানারকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কত কালের কথা; সে নদী শুকিয়ে জল সরে চড়া পড়ে গেছে, কিন্তু এখনও ঝোঁক কাটেনি; মনে হচ্চে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি। আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে?' বলেই বুড়ো ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়াভূত আর ঝিঁঝিঁপোকা দেখে এলুম, ওদের কথা তুমি কিছু জানো কি?'

'জানি বইকী! ওরা তো সেদিনের ছেলে!' বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলে :

'দেখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মতো দু-চারটি গাছ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই;—নদী নেই, পাহাড় নেই, এমনকী বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই; কেবল বালি ধুধু করছে—ঠিক এই জায়গাটির মতো। আমার তখন সবেমাত্র কচিকচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে—ছোটো ছেলেব কচি কচি দুটি দাঁতের মতো। সেইসময় তারা গান বড়ো ভালোবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ফড়িংগুলোর মতো তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মতো পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ-বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কী চমৎকার তা তোমাকে আর কী বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি—আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে আমরা বড়ো হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কী খেয়ে তারা বাঁচে? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না; ছিল কেবল আমাদের মতো বড়ো বড়ো গাছ, কাঁটা আর লতা আর পাতা; নদীতে মাছও ছিল না, আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়। তবু তারা অনেকদিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি যে গান বন্ধ হয়ে গেছে—তারা সবাই মরে গেছে—শুকনো পাতার মতো তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেক দিন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মতো, এদিকে-ওদিকে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে খুঁজে যারা গান গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গান গাইছে না—কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়েস ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি! তখন জলে মাছ দু-একটি দেখা দিয়েছে; আমি কাঁটা আর বঁড়শি ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—'

বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল! আমি যত বলি, 'এমন সময় কী হল দাদা? আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মতো মানুষগুলো ঝিঁঝিপোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মতো ঘোড়াগুলো ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল?' বুড়োর আর কথা নেই; কেবল একবার 'হুঁ' বলেই চুপ করলে।

আমি ভাবছি দিঁই আর-এক ঘা লাঠি বুড়োর মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি দূর থেকে একটা আলো আসছে—যেন কে লণ্ঠন-হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা কজন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। একবার ভাবছি, কী জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলুম আলোটা এসে পালকির খানিক দূরে থামল; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পালকিটা কাঁধে নিলে। উড়েদের একেই একটু ভুতুড়ে চেহারা, কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত না মানুষ! একবার তাদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মতো তাদের পায়ের গোড়ালি উলটো কি না। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বললুম, 'দাদা, তবে যাচ্ছি।'

দাদা আমার তখন ঝিমোচ্ছেন; চমকে উঠে বললেন, 'যাবে নাকি? গল্পটা তো শেষ হল না?'

পালকি তখন চলেছে, মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার চুল হলদে আর তোমার রক্ত সাদা কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।'

'মাস্টারমশায়ের কাছে জেনে নিয়ো—' বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হুহু করে পালকি আবার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু ভয় ভয় করছে; বেহারাগুলো মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে পালকির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—মানুষ-উড়ে পালকি-কাঁধে হুম্মা হুম্মা ডাক ছাড়ে, এরা তো হাঁক দিচ্ছে না। পড়েছি ভূতের হাতেই! পড়েছি, আর কোনো ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপতরি লাঠি তো আছে। তেমন তেমন দেখি তো দু-হাতে লাঠি চালাব।

ভূতপতরি লাঠির কথা মনে করেছি কী অমনি ধপাস করে পালকিটা তারা মাটিতে ফেলেছে, কোমরটা আবার খচ করে উঠেছে। 'তবে রে ভূত-উড়ে, আমাকে এই মাঠে একলা নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল পালকি, ওঠা সোয়ারি,' বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব, কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল। ভূতগুলো দেখেই খিলখিল করে হেসে অন্ধকারে মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার ওপর কোমর ভেঙে গেল! লাঠি ধরে যে গুড়িগুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসাকাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। 'দূর কর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে!' বলে পালকির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। খিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

একলা থাকতে থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না-বুজেছি অমনি খস করে একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির ওপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে ঘুরে সেই তাল গাছে ঠেকছে, আবার সড়সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না-রাম না-গঙ্গা! কাঠ হয়ে পড়ে আছি কেবল দুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ গাছ সে গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে

গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় যে আলোটা টিপটিপ করছিল সেটা জোনাকিপোকার মতো উড়ে গিয়ে সেই গোলাটার ওপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল!

গেছি, পালকিসুদ্ধ গোলাটার ভেতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভেতরে মাছের মতো আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি—বনবন করে লাঠিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে। সে কী ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভেতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে! কখনো মাঠের ওপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোশের মতো লাফিয়ে, গড়িয়ে, কখনো জোরে, কখনো আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁকোঁ চরকা কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোশ তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, যে চাঁদের ভেতরে বসে থাকে! আর ওই তার চরকা, ওই খরগোশ! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়! ইনিই আমাদের চাঁদামামা, আর বুড়ি তো আমাদের মামি! আর এ খরগোশ তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোশটি, বিলিতি ইঁদুরের আর গিনিপিগগুলির বড়োমামা!

'বলি মামি, এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!' বলেই আমি খরগোশটাকে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছি।

'ওরে ছাড়, ছাড়! আমার চরকা কাটা বন্ধ করিসনি, দেখচিসনে এই চরকার জোরেই চাঁদামামার সংসার চলছে!'

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদামামা গড়াতে গড়াতে থেমে গিয়ে লাঠিমের মতো মাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছেন! আমি খরগোশটি মামির হাতে দিয়ে বললুম, 'কই মামি, চালাও দেখি মামাকে।'

খরগোশ চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদামামা গা ঝাড়া দিয়ে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে, 'দে পাক, দে পাক!' খরগোশ ততই পাক দিচ্ছে আর চাঁদামামাও তত ঘুরপাক দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রবারের বলের মতো নাচতে নাচতে চলেছেন। যত বলি, 'মামি আর পাক দিয়ো না, মামাকে আমার অত ঘুরিয়ো না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোনদিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে-বসে চালাও, শেষে বুড়োবয়সে মামার কি মাথা-ঘুরুনির রোগ ধরিয়ে দেবে?' জানি কি [illegible] মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কানে যায়নি। সে কেবল বলছে, 'দে পাক, দে পাক!' আমি যত ইশারা করে বলি, 'আস্তে, আস্তে!'—বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে, 'দে পাক, দে পাক!'

মামা রেলের গাড়ির মতো হুহু করে ছুটে চলেছেন। 'ওরে থামা, থামা! মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে'—বলেই লাঠি তুলেছি খরগোশটাকে মারতে। যেমন লাঠি তোলা অমনি খরগোশটা খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদামামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

'কী করলে গো মামি!' বলেই চমকে দেখি নদীর ওপারে পালকিসুদ্ধ আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায়-বা সে খরগোশ! নদীর জলে দেখি একরাশ কাচের টুকরোর মতো চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চকচক করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলাম আর কী! বড় তেষ্টা পেয়েছিল। নদী থেকে এক ঘটি জল খেয়ে ঠান্ডা হয়ে তবে বাঁচি!

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম—আজ রাত্তিরে ওই গাঁয়ে কারু গোয়াল-ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখান থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি যাওয়ায় আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। ডাকহাঁক করে কারও সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পা-ও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, আর ঘুম—অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসাতলার লণ্ঠনভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। 'তবে রে!' বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে, 'দেখো বাবু, ফের যদি লাঠি দেখাও কী মারতে আসো, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালোমানুষটি হয়ে পালকিতে বসে থাকো, তবে ওই—কী বলে ও কী তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।' বুঝলুম ভূতগুলো ভয়ে রামনাম মুখে আনতে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে—কী বলে ও কী তলা।

ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হল; পালকিতে আবার উঠে বসলুম।

এবারে আর ভয় করছে না— ভোর হবার এখনও দেরি আছে কিন্তু এরই মধ্যে ভূতগুলো যেন একটু ঠান্ডা হয়ে এসেছে, মাঠে আর ঘন ঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না, কোথাও মনসাগাছের ছায়াটি পর্যন্ত আর দেখা যায় না। পুবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু একটু আসছে; ভূতগুলো হাওয়া পেয়েই যেন জড়সড়। আমি কিন্তু বেশ আরামে পালকিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে চলেছি!

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে, কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহ্লাদও হয়েছে। চার ভূত চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিটখিট, টিকটিক করে গান গাইতে গাইতে চলেছে—ঠিক যেন কতদূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কটকট করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন 'কুহু-কেকা'র ঠিক সেই পালকির গানটা! কিন্তু কথাগুলো সব উলটোপালটা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া—বেজায় ভূতুড়ে। কেবল হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল! ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি :

চলে চলে
হুমকি তালে
পংখি গালে
মাসিপিসি
বাঘবেড়ালে।

ভূতপেরেতে
চলেছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূতপেরেতে।

পালকি দোলে
উঠতি আলে
নালকি দোলে
নামতি খালে।

আলো-আঁধাবে
শেওড়াগাছ
কালায সাদায়
বেডাল নাচ।

মরা নদী
বালিব ঘাট
মনসাতলায
মাছেব হাট।

ভূতেব জমি
ভূতের জমি
ভূতপেরেতেব
নাইকে' কমি।

উডছে কতক
ভনভনিযে
চলছে কতক
হনহনিয়ে
হঁনহঁনিয়ে।

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাতদুপুরে
হুতুম থুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাকিপোকা
আরশোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল!

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
ঘুরনি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে

জগৎজুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে

ভুঁত পেরেত চলেছে রাতে
হুন্ হনিয়ে ভুঁত পেরেত।
মরা নদী বালির ঘাট
মনসা তলায়
দিন দুপুরে বাদুড় ঘুমোয় বাদুড়পুরে
হুতুম ঘুমোয়
ভাম
ব্যাঙ ব্যাঙাচি
আরশোলা
ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁক শেয়াল
শুকনো পাতা

আলো আঁধারে
কালোয় সাদায় বেরাল নাচ
ঘুমোয়
ভূতের খেলা

সব ভূতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইটের ঢেলা...

গানটা শুনছি একবার—'ছুঁচো ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড় প্যাঁচা, টিকটিকি, খ্যাঁকশেয়াল।' গানটা শুনছি দু-বার—'গঙ্গাফড়িং, জোনাকপোকা, আরশোলা, বাদুড়!' গানটা শুনছি তিনবার—'আলো-আলেয়া, ঘূর্ণি-হাওয়া, খেজুরগাছ, ইটের ঢেলা।' একবার, দু-বার, তিনবার, বারবার তিনবার ইটের ঢেলা পড়েছে কী আর পালকিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুরগাছের তলায় একটা মরা গোরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে—টংটং, টংআ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডীতলা, সেখানে রাম-সীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান, পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপতরির লাঠিরও জোর সেখানে খাটবে না। কাজেই পোঁটলা পুঁটলি, লাঠি-ছাতা সমস্ত পালকিতে রেখে কোমর ধরে, খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডীতলায় রাম-সীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কী জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা?

'রাম-রাম' বলতে-বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক-একবার পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলো আসছে কি না। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার ওপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না; টুপ করে হয়তো একটা খেজুর-আঁটি এসে গায়ে পড়ল, হয়তো দেখছি খেজুরতলায় যেন একটি কচি ছেলে ওমা-ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি—বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে; হয়তো আমার নাম ধরেই পেছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই! অন্ধকারে হয়তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত বালি তুবড়িবাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ—একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে তবে ছাড়বে, নয়তো মট করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিক কোনোদিক না দেখে 'সীতারাম-সীতারাম' বলতে বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের ওপরে পঞ্চবটীর বন, বনের মাথায় রাম-সীতা মন্দিরের চুড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর-একটু গেলেই পৌঁছে যাব, কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে সরে যাচ্ছে—আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির ওপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরের খোল-করতাল বাজছে; দেখতে পাচ্ছি জাম্ববানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে; হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মতো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আর ভয় কী!

বলে যেমন রামচণ্ডীতলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একী নাক ঠুকল কীসে? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে; তবে নাক ঠোকে কীসে?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সামনে হাতড়ে দেখি প্রকাণ্ড কাচ, তার ভেতর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটী বন, হনুমানের ল্যাজ, সবই দেখা যাচ্ছে; কেবল তার ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে না! ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে কেবল নাক ঠুকে ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল, কাচে লেগে লেগে ক্রমে চ্যাপটা হয়ে গেল, তবু ভেতরে ঢোকবার রাস্তা কিন্তু পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি, বালির ওপরে বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। ভারী রাগ হল, রাগে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। 'জয় রাম!' বলে দিয়েছি এক লাফ সেই কাচের ওপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম—গেছি! হাত-পা কেটে, সকল গায়ে কাচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মতো কাচ কেটে একেবারে ভেতরে গিয়ে পড়েছি—হনুমানের জাম্ববানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারদিকে রব উঠেছে— 'জয় রাম! জয়-জয় রাম, সীতারাম!' সমুদ্দুরের ডাক শুনছি— 'জয়-জয় রাম!' বাতাসে শব্দ শুনছি 'জয় রাম!' চারদিকে 'জয় রাম সীতারাম!'

কেউ আমাকে একটি কথাও বললে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! আমি রাম-সীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি, ছটা বেহারা আমার পালকিটি নিয়ে বসে আছে— দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে।

'কে হে বাপু তোমরা পালকিটি নিয়ে?'

'বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝাপুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে!'

'আচ্ছা বাপু, চলো তো পিসির বাড়ি'—বলেই আমি পালকি চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোনো ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পালকির দুই দরজা খুলে, মনের আনন্দে চারদিক দেখতে দেখতে চলেছি। কেমন তালে তালে এবার পালকি চলেছে—কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পালকি চলেছে—আমকাসুন্দি, জামকাসুন্দি! যেন জলের ওপর দুলতে দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পালকি চলেছে—ধর কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড়া ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে। পালকির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সরদার—কালো কিচ্‌কিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকা চুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচ্‌কিন্দে কালো মিশ—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির ওপরে মনসাগাছ—খাড়া খাড়া, খোঁচা খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লটপট করছে। কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো, খানিক আলো, খানিক অন্ধকার—একদিকে ধপধপ করছে শুকনো বালি আর-দিকে টলমল করছে জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলছি, না, সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির ওপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপধপ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে

কিচকিন্দে—জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে। আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনেমনে দু-জনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের ওপর কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে-মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে—ধুলেও যায় না, মুছলেও যায় না—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

হারুন্দের কথা

'আমার নাম হারুন্দে নয়—হারুন-অল-রসিদ, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা! এখন হয়েছি হারুন্দা।'

বোগদাদের হারুন-অল-রসিদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের থিয়েটারেও তাকে দেখেছি—কখনো সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনো ফকির, কখনো-বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে-বেহারা সেজে এলেন দেখছি!

অবাক হয়ে হারুন্দের মুখের দিকে চেয়ে আছি—কখন আবার সে ফকির হয়, কী বাদশা হয়! আমাকে হাঁ-করে থাকতে দেখে বলছে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা দেখো!' বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে-গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথায় বকের পালক-গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বাকাব্বা, পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির লপেটা পরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুন বাদশা! ফিক করে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস করে দেশলাই জ্বেলে ফেলেছি! বাদশার হাতে, গলায়, মাথায় হিরে-মানিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। কিচ্‌কিন্দে ছিল পাশে; সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা? যে হারুন্দে সেই হারুন্দে!

আলো জ্বালতে হারুন্দে ভারী রেগে গেছে, কিছুতে আর গল্প বলতে চায় না। অনেক হাতে-পায়ে ধরে তাকে ঠান্ডা করেছি তবে সে আবার গল্প বলছে, 'দেখলে তা আমিই ছিলুম বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা হারুন-অল-রসিদ! আর ওই যে কালো কিচ্‌কিন্দে উড়েটা তোমার ওপাশে চলেছে, ও ছিল মসুর—আমার কাফ্রি চাকর। তুমি ফস করে যেমন আলো জ্বেলেছিলে ও তেমনি খপ করে তোমার মাথা কেটে ফেলতে পারে যদি আমি হুকুম দিই। দেখবে? মসুর—'

'না! না!' বলেই আমি হারুন্দের মুখ চেপে ধরেছি, পাছে হুকুম বেরিয়ে পড়ে। কিচ্‌কিন্দে আমার গা টিপে বলছে, 'শোনো কেন! ওটা একটা পাগল, আমি কোনো পুরুষে ওর চাকর নই।'

একটা ভারী মজা দেখছি—কিচ্‌কিন্দে আমার গা-টি ছুঁয়েছে আর তার মনের কথা পষ্ট পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কিচ্‌কিন্দেকে মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে হচ্ছে না।

কিচ্‌কিন্দের কথায় সাহস পেয়ে হারুন্দের মুখ ছেড়ে দিলুম। ছাড়তেই শুনলুম, হারুন্দের মুখের হুকুমটা গোঁ করে তার বুকের ভেতর নেমে গেল; হারুন্দেও আর রাগটাগ করলে না।

'দেখলে তো!' বলেই সে আবার গল্প শুরু করল: 'একদিন আমি আমার বসরাই-গোলাপবাগ বলে যে

বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে বসে ওই মসুর আমার পোষা বুলবুল বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে-মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধবাদ নাবিক সাত সুমুদ্দরের জলে সাতখানা জাহাজডুবি করে এসে হাজির—ভিজে কাপড়ে দু-হাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে। মসুরকে বলেছি আনতে একখানা চৌকি, না, মসুরটা এমন গাধা যে এনেছে একটা টুল। আমি রেগে মসুরের মাথা কাটতে যাব আর অমনি সিন্ধবাদ আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'হুজুর মসুরকে মাপ করুন অনেকদিনের পুরোনো চাকর। শুনুন, এবার কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি। এবারে আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলুম, কাচের বাসনের বদলে অনেক হিরে-জহরত হিন্দুস্থানের বোকা লোকগুলোর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে আসছি, এমন সময় জাহাজ আমাদের ঝড়ে পড়ল। এমন ঝড়ও কখনো দেখিনি, সমুদ্দুরে এমন ঢেউও কখনো পাইনি! পাল, দড়ি, হাল, দাঁড় ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই! সাত দিন-সাত রাত আমাদের জাহাজ মোচার খোলার মতো জলে ভাসতে ভাসতে শেষে এসে কালাপানিতে পড়ল; সেখানে সমুদ্দুরের জল, হুজুর, ওই মসুরের মতো কালো, আর যেন রেগে টগবগ করে ফুটছে! যেমন কালাপানিতে জাহাজ পড়েছে আর মাঝিমাল্লা সবাই আল্লা আল্লা করে কেঁদে উঠেছে। যত বলি—কাঁদিস কেন? কী হয়েছে বল?—কেউ আর কথার উত্তরই দেয় না, কেবল ডাঙার দিকে একটা কাফেরদের মন্দির দেখায় আর ভেউভেউ করে কাঁদে। এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন আমার কাছে এসে বললে—কর্তা আর দ্যাহেন কী? আল্লার নাম ল্যান! ওই যে কাফেরদের মন্দির, ওর মাথায় একটা জাঁতার মতো চুম্বুক পাথর আছে, তারই টানে জাহাজের যত লোহার পেরেক সব একটি একটি করে খুলে ওই মন্দিরের গায়ে যেয়ে লাগবে আর জাহাজের কাঠগুলি ভুস করে আলগা হয়ে মাঝিমাল্লা-মালমাত্তা সব জলে যাবে! কত্তা সব জলে যাবে! বলতে বলতে দেখি, জাহাজ থেকে পেরেকগুলো খুলে খুলে বিষ্টির মতো গিয়ে সেই মন্দিরের চুড়োয় চুম্বক পাথরটায় লাগছে। দেখতে দেখতে আমাদের মুরগি রাঁধবার লোহার হাঁড়ি আর রুটি সেঁকবার তাওয়াখানা গেল উড়ে। আমার হাতে আমার হিরে-জহরতের লোহার সিন্দুকের চাবিটা ছিল, সেটাও দেখি পালাই পালাই কচ্ছে। আমি—না আল্লা, না খোদা—চাবিটাকে মুখে পুরে আমার লোহার সিন্দুকটা জাপটে ধরেছি। এদিকে ভুস করে জাহাজটি ডুবে গেছে। আমি কিন্তু ঠিক ভেসে আছি; চুম্বকের টানে লোহার সিন্দুক আমার ঠিক ভাসতে ভাসতে গিয়ে ডাঙায় ঠেকেছে। আমি টপাস করে বালিতে লাফিয়ে পড়েছি আর অমনি হুজুর—আমার সেই লোহার সিন্দুক, আমার অনেক টাকার সিন্দুক হুজুর, অনেক কষ্টে ঠকিয়ে নেওয়া হিরে-জহরতে-ভরা সিন্দুক হুজুর, বোঁ করে উড়ে পালিয়েছে—উড়ে-মেড়াদের সেই মন্দিরের চুড়োয়!'—বলেই সিন্ধবাদ মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠান্ডা করে টুলে বসিয়ে বললেম, 'সিন্ধবাদ, শোনো। জানো আমি হারুন-অল-রসিদ, আমার সামনে মিথ্যা কথা বললে তোমার মাথা কাটা যাবে জানো!'

সিন্ধবাদ বললে, 'জানি হুজুর, সেইজন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না। ওরে আমার লোহার সিন্দুক!' বলেই সিন্ধবাদ টুল থেকে ঘুরে পড়েছে। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। মসুর অমনি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল দিতে এসেছে। আমার ভারী রাগ হল, মসুরকে এক লাথি মেরে বললুম, 'গাধা! আগে ওর মুখ থেকে সিন্দুকের চাবিটা এইবেলা বার করে নে। জেগে উঠলে কি আর দেবে?'

মসুর অমনি সিন্ধবাদের মুখে আঙুল দিয়ে বলছে, 'কই কত্তা চাবি তো পাইনে!'

'পাসনে কী রে, দেখ জিবের নীচে!'

'পাইনে তো কত্তা!'

'দেখ দেখ গলায় আটকেছে!'

'চাবি তো নেই কত্তা!'

'খেয়ে ফেলেছে রে গাধা, খেয়ে ফেলেছে, পেট চিরে দেখ পাজি!'

মসুর অমনি ঝট করে তার পেট চিরে ফেলেছে আর দেখি পেটের ভেতর বজ্জাত সওদাগর তার লোহার সিন্দুকের চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে! নিশ্চয় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলত — 'যেমন আল্লা বলে কেঁদেছি হুজুর, অমনি চাবিটাও উড়ে পালিয়েছে।'

মসুর চাবিটা গোলাপজলে ধুয়ে আমার হাতে এনে দিলে। আমি মসুরকে হুকুম করলুম, আমার সেই উড়ো-সতরঞ্চি আর মুড়ো-দূরবিনটা আনতে — যাতে পাখির মতো উড়ে উড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াই আর স্বগ্গ-মত্ত-পাতালের জিনিস ঘরে বসে দেখি।

সতরঞ্চি আসতেই আমি তার ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দূরবিন হাতে উঠে বসেছি, মসুরও আমার পায়ের কাছে বসেছে—পা টেপবার জন্যে। যেমন হুকুম দেওয়া — 'চলো কালাপানি!' অমনি সতরঞ্চি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তামাক খেতে গিয়ে হাতের কাছে নল পাইনে! মসুরটা এমনি গাধা যে গুড়গুড়িটা তুলে নিতে ভুলে গেছে। ভাগ্যি পকেটে কটা সিগারেট ছিল, তাই রক্ষে! মসুরও বেঁচে গেল, আমিও তামাক খেয়ে আরাম পেলুম।

বোগদাদ থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক এসেছি কি না, এমন সময় মসুর বলছে, 'হুজুর, একটা কালো মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওই ডানদিকে।'

তাড়াতাড়ি দূরবিন কষে দেখি সেটা মক্কার মসজিদ। মসুর এত বড়ো মসজিদ কখনো চক্ষেও দেখেনি। সে তো অবাক।

আবার খানিক পরে কাফ্রিস্থানের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। তখন মসুরের হাসি দেখে কে। সে বলছে, 'ওই দেখা যাচ্ছে সাহারা, হুজুর! ওটা একটা সমুদ্দুর শুকিয়ে গিয়ে চড়া পড়ে গেছে। ওরই ওদিকে দেখুন একটুখানি নোনা জল, তারই ওপারে ফিরিঙ্গি মুলুক আর আমাদের রুমের বাদশার কস্তুন্‌তুনিয়ার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই দেখুন হুজুর, বালির ওপর দিয়ে সার বেঁধে উটের কাফিলা চলেছে; ওই খেজুরতলায় ফালহানি জল তুলছে, ওই মিসির শহর আর ওই দেখুন সেকেন্দ্রিয়ার কুতুবখানা, হুজুর! ওখানে দুনিয়ার কেতাব জমা আছে। হুজুর ওই যে দেখেন দুটো পব্বতের মতো, ও দুটো হচ্ছে কাফ্রিস্থানের বাদশার কবর। এত বড়ো কবর আর জগতে নেই। কেবল সোনা, রুপো, হিরে, জহরতে ঠাসা আর তারই মাঝে সব মরা মানুষ শুয়ে আছে — হাজার বরষ ধরে, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন এই মরেছে, নয়তো ঘুমিয়ে আছে। কিমিয়াবিদ্যার জোরে এখনও হাজার হাজার বরষের মরা-মানুষগুলো টাটকা রয়েছে হুজুর! যদি দেখতে চান তো নেমে চলুন।'

আমি মসুরকে ধমকে বললুম, 'ওসব জীবনের কারখানা আমি দেখতে চাইনে। ওদিকে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

'হুজুর ওটা নীল নদী, ওখানে নীল পদ্ম পাওয়া যায়। হিন্দুদের যমুনা—আর কাফ্রিদের ওই নীল নদী! হুজুর, ওর ওপর একবার নৌকোয় করে হাওয়া খেয়ে দেখুন, দিল খুশ হয়ে যাবে। ওই নদীর ধারে আমার বাড়ি দেখা যায়, ওই আকের খেতের ধারে হুজুর, ওই আমাদের বুড়ো গাধাটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে হুজুর! আমি হিন্দুস্থানে হিরে-জহরতের খোঁজে যেতে চাইনে, আমাকে আমার দেশের এই আকের খেতে ছেড়ে দিয়ে যান হুজুর!'

আমি দেখলেম বিপদ। মসুরকে ছাড়লে আমার তো একদণ্ড চলবে না। তামাক দেয় কে? পা টেপে কে? হিন্দুস্থানে একলাই-বা যাই কী করে—সিন্ধবাদের জহরত লুঠ করতে?

আমি মসুরকে কিছু না বলে সতরঞ্চির ওপরে পুবমুখো হয়ে ঘুরে বসেছি—হিন্দু রাজাদের মতো। এতক্ষণ আমি মোছলমানি কেতামতো পশ্চিমমুখো বসেছিলুম, সতরঞ্চিও তাই পশ্চিমমুখো চলছিল; পুবমুখো বসতেই সতরঞ্চি পুবে ঘুরেছে আর হুহু করে নীল নদী পেরিয়ে একেবারে সিস্তান ঘুরে ইস্পাহানে হাজির। সেখানে বুলবুল-বোস্তাঁর ঝাক, হাফেজের গান গাইতে গাইতে আমাদের সঙ্গে সব উড়ে চলেছে; মাটি থেকে সিরাজি শরবত আর ইস্তাম্বুল আতরের খোসবো আসছে। আমারও তেষ্টা পেয়েছে—মসুরেরও খিদে লেগেছে; দু-জনে একটা মেওয়ার বাগানের ধারে আকাশ থেকে নেমে এসেছি। মসুরকে দুটো মোহর ফেলে দিয়েছি—দু-বোতল সিরাজি শরবত আনতে। মসুরটা এমনি গাধা! দেখি, খানিক পরে দু-মোহর দিয়ে এক ঝাঁকা বেদানা আর আঙুর এনে হাজির।

'সিরাজি কই রে? কতকগুলো শুকনো বেদানা নিয়ে এলি যে!'

'হুজুর, খোদাবন্দ, জাঁহাপনা! সিরাজি আর পাওয়া যাবে না। দোকানে যে কটা ছিল, একা মসুর—হুজুরের পেয়ারের গোলাম এই মসুর—তা শেষ করেছে!'

ভারী রাগ হল, ধাঁ করে মসুরের নাকে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলুম। মসুরটা সিরাজি খেয়ে একেই টলছিল, ঘুঁষি খেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। মেওয়ার ঝাঁকাটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর দেখি তার ভেতর একটা সিরাজির বোতল। আমি সেটা কুড়িয়ে মসুরকে বললুম 'মসুর, যেমন আমার সঙ্গে চালাকি তেমনি থাকো তুমি এইখানে পড়ে, আমি চললুম।' বলেই যেমন আকাশে উড়তে যাব আর মসুর ধরেছে আমার গুড়গুড়িটা চেপে, আর বলছে, 'হুজুর, আমি মসুর হুজুর, [illegible]র মাপ করুন হুজুর, আমি আপনার পুরোনো চাকর হুজুর, গুড়গুড়ি হুজুর, পায়ের জুতো হুজুর, গোলামের গোস্তাকি মাপ হোক হুজুর!'

গুড়গুড়ি যায় দেখে মসুরকে সেবারের মতো সঙ্গে তুলে নিলুম। তখন আকাশের ওপর দিয়ে সতরঞ্চি হুহু করে উড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে কাবুল ছাড়িয়ে কান্দাহারে পৌঁচেছে। মসুর বলছে, 'হুজুর, মেওয়াগুলো ফেলে আসা হল—অমন বেদানা!'

আমি অমনি কান্দাহারের একটা মেওয়ার বাগানে সতরঞ্চি নামিয়েছি; সেখানে মানুষের মাথার মতো এক-একটা বেদানা ফলে আছে। মসুর তো দেখেই অবাক।

'কেমন মসুর, এমন বেদানা কখনো দেখেচিস?'

'হুজুর, না।'—বলেই মসুর একটা বেদানা ভেঙেছে আর অমনি চারদিক থেকে কাবুলিওয়ালা মোটা লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। আমি অমনি মসুরকে টেনে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠেছি; মসুর তো রেগেই লাল। বলে, 'হুজুর, কেন পালিয়ে এলেন? কাবুলিদের আচ্ছা করে ঘা-কতক দিয়ে আসতুম।'

আমি মসুরকে সাবধান করে দিয়ে বললুম, 'মসুর, খবরদার আর এমন কাজ কোরো না। মসুর, ওরা যদি আজ তোমাকে ধরতে পারত তবে মমিয়াই করে ছেড়ে দিত, জানো। মমিয়াই দেখেছ মসুর?'

'হ্যাঁ হুজুর, হাকিমসাহেবের কাছে যে কালো মলম তাকেই তো বলে মমিয়াই।'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতনই কালো। মমিয়াই হয় কীসে জানো?—কালো মানুষের চর্বিতে।'

'সেকী হুজুর!'

'হ্যাঁ, শোনো তবে—কাফ্রিদের ছেলে কিংবা যে কোনো কালো ছেলে কিংবা দুষ্টু যদি সুন্দর ছেলে হয় তাদের ওই কাবুলিওয়ালারা ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে এনে একটা মেওয়ার বাগানে ছেড়ে দেয়! সেখানে মনের আনন্দে ছেলেগুলো বেদানা কিশমিশ খোবানি আঙুর খেয়ে বেড়ায় আর মোটা হতে থাকে; শেষে মোটা হতে হতে তাদের গা থেকে চর্বি গড়াতে থাকে, তখন সেই কাবুলিওয়ালাদের হাকিম একটা আগুনের কুন্ডুর ওপর গরম জল চাপিয়ে সেই মোটা ছেলেগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগির মতো নীচে মুখ ওপরে পা করে ঝুলিয়ে রাখে; আগুনের তাতে তাদের সেই চর্বি গলে টপটপ করে সেই কড়ায় পড়তে থাকে। যতক্ষণ একফোঁটা চর্বি থাকবে ততক্ষণ কিছুতে তাদের ছেড়ে দেবে না—তাতে তারা মরুক আর বাঁচুক। এমনি করে মমিয়াই তৈরি হয় মসুর। তোমার মতো মিশকালো ওরা কটা পায়? ধরতে পারলে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না; নিশ্চয়ই মমিয়াই করে ছেড়ে দিত।' ভয়ে দেখলুম মসুরের ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে, ঘুরে পড়ে আর কী! আমি তাকে একটু সিরাজি খাইয়ে ঠান্ডা করলুম।

বলতে বলতে পেশোয়ারে এসে পড়েছি। সেখানে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কাবুলিওয়ালার ভিড় দেখে মসুর কিছুতে সেখানে রাত কাটাতে চাইলে না। আমি কত বোঝালুম যে এখানে ইংরেজের রাজ্য—কাবুলিদের কিছু উৎপাত করার জো নেই, কিন্তু মসুর কিছুতে বুঝলে না। কাজেই আরও এগিয়ে উড়ে চলতে হল; একেবারে দিল্লির কুতুবমিনারে এসে সতরঞ্চি নামালুম। মসুরটা এমনি ভয় পেয়েছে যে দিল্লির চাঁদনিচকে গিয়ে দুটো দিল্লির লাড্ডু কিনে আনতেও তার সাহস হল না। কী করি, আমরা কুতুবমিনারের চুড়োয় সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। চাঁদ না উঠলে অন্ধকারে আর ওড়া যাবে না।

রাত নটার সময় চাঁদ উঠল। অত বড়ো চাঁদ—এমন পরিষ্কার চাঁদ হিন্দুস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই চাঁদনিতে দিল্লির চাঁদনিচক আলো হয়ে গেছে; রাস্তায় সব লোক বেরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, গান-বাজনা করছে। মসুর দেখি দিল্লির জুম্মা মসজিদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'দেখছ কী মসুর?'

'হুজুর, এমন মসজিদ কোথাও দেখিনি।'

'তবু মসুর, ওর আধখানা রেল-কোম্পানি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ওটা কী হুজুর?'

'ওটা শাজাহান বাদশার কেল্লা। ওখানে একটা দরবার-ঘর আছে, সে দেখলে চোখ ঠিকরে যেত—এত হিরে-মানিক দিয়ে সেটা সাজানো ছিল। সেইখানে ময়ূর-সিংহাসনে বাদশারা বসে দরবার করতেন।'

'ছিল বলছেন কেন হুজুর? এখন কি সেসব নেই?'

'না মসুর, শুনেছি ময়ূর-সিংহাসন নাদির শা কেড়ে নিয়ে কাবুলে চলে গেছে, আর দেয়ালে যেসব হিরে-পান্না ছিল তা মোগল-বাদশারা বাড়ি ছাড়বার পর কাচ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কী জানো মসুর, ও

দেয়ালে কাচই লাগানো ছিল কিন্তু মোগল-বাদশার ভয়ে লোকে বলত সেগুলো হিরে-মানিক! নইলে অত টাকা গরিব হিন্দুস্থানের বাদশা শাজাহান কী করে পাবে? এ কি বোগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ যে ঘরখানা হিরে দিয়ে মুড়ে ফেললে? আমি বেশ জানি মসুর, বুড়ো শাজাহান এক তাজমহল আর ময়ূর-সিংহাসন তৈরি করতে সব টাকা, যা কিছু তার বাপ-দাদা জমিয়ে গিয়েছিল, ফুঁকে দেয়। সেই রাগে তার ছেলে ঔরঙ্গজেব তাকে কয়েদ করে সিংহাসন কেড়ে নেয় — এ আমার উজির জামায়ের নিজের মুখে শোনা, নিজের কানে শোনা, জানো মসুর —'

মসুর দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে; আমার কিন্তু ঘুম আসছে না, দিল্লির হাওয়া বড়ো গরম লাগছে। আমি আস্তে আস্তে কুতুবমিনারের ওপর থেকে নেমে বাদশাদের একটা তহ্‌খানার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছি। মাটির নীচে তহ্‌খানা, তার চারদিকে জলের ফোয়ারা। এখন আর ফোয়ারার জল উঠছে না, কিন্তু তবু ঘরখানি বেশ ঠান্ডা।

খানিক বসে থাকতে থাকতে শুনছি ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল। অমনি দেখি সব ফোয়ারাগুলো খুলে গেছে — আর ফরফর করে গোলাপজলের ছিটে আমার গায়ে পড়ছে। তহ্‌খানার মাঝখানে একটা মখমলের বিছানা ছিল, আমি তারই ওপর শুয়ে একটু চোখ বুজেছি আর দেখি বুড়ো ঔরঙ্গজেব একটা লাঠি ধরে ঠকঠক করে এসে হাজির! এসেই আমাকে লাঠির খোঁচা দিয়ে বলছে, 'কৌন হ্যায় রে?' আমিও অমনি তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি, 'তুম কৌন হ্যায় রে?'

'হাম হিন্দুস্তান কি মালিক ঔরঙ্গজেব বাদশা হ্যায়!'

'ম্যায়নে তুর্কিস্তানকে পাশা হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ খাঁজাহান-ই-জাহান্দর শা বাদশা বোগদাদি হুঁ!'

'আও লড়েঙ্গে!'

'আও লড়ো!'

বলেই আমরা দু-জনে তাল ঠুকতে ঠুকতে পাঞ্জা কষতে কষতে একেবারে কুতুবমিনারের ওপরে এসে হাজির। সেখানে এসে বুড়ো ঔরঙ্গজেবটা আমাকে এমনি জাপটে ধরেছে যে ফেলে আর কী ঠেলে ওপর থেকে নীচে! এমন সময় মসুর ছুটে এসে মেরেছে তার মাথায় এক কিল। যেমন কিল মারা অমনি তার পাগড়িটা পড়েছে ঠিকরে লাহোরের কেল্লায়। সেখানে রণজিৎ সিং খাটিয়া পেতে ছাতে ঘুমুচ্ছিল; পাগড়িটা পড়বি তো পড় একেবারে তার মুখের ওপরে, আর পাগড়ির কোহিনুর হিরেটা গেছে তার একটা চোখে বিঁধে!

এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বুলুচ্ছে, ওদিকে রণজিৎ সিং একগাল হাসতে হাসতে কোহিনুর হিরেটার দিকে এক চোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি তাজবিবির কবরটার চারদিকে বুড়ো শাজাহানটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুর সিক্রির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের ওপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারী খুশি। 'এসো ভাই বোগদাদি!' বলে আমায় পাশে বসালে। তার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি বলি তাকে আগারওয়ালা। অনেকদিনের পর দু-জনের দেখা। দেখি আকবর কেমন বুড়িয়ে গেছে। চুল সব সাদা হয়ে

গেছে। গোঁফ-দাড়ি সব ফেলে দিয়ে লোকটা কেমন যেন কাটখোট্টা রকমের দেখতে হয়ে গেছে। তার আর সে চেহারা নেই।

দু-জনে অনেকক্ষণ ছেলেবেলার গল্প করে আমি বললুম, 'তবে এখন আসি ভাই, অনেক দূর যেতে হবে।'

'আঃ বসো না। মসুর কিছু খেয়ে নিক। ওরে, মসুরকে ভালো করে খাইয়েদাইয়ে নিয়ে আয়। আর ভাই, বুড়োবয়সে মনের সুখ নেই। বড়ো ছেলে জাহাঙ্গিরটা হয়েছে বেজায় মাতাল, কাজকর্ম কিছুই দেখে না, সেই এলাহাবাদের কেল্লায় বসে কেবল টাকা ওড়াচ্ছে। ভেবেছিলুম নাতি শাজাহানটা একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখবে, কিন্তু ভাই আমার কপালের দোষে নাতবউ মরে-ইস্তক স্ত্রীর শোকে সে-ও গেল পাগল হয়ে। ঔরঙ্গজেবটা এদিকে চালাকচতুর, কিন্তু হিঁদুদের ওপর তার বিষদৃষ্টি। হিঁদু প্রজা নিয়েই আমার কারবার অথচ তাদেরই সে চটাতে চায়! এমন কল্লে কি রাজত্ব থাকে দাদা? আমি সেই ষোলো বছর থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু জমিজমা টাকাকড়ি করেছি সব আমার কটা নাতি-পুতি মিলে বরবাদ কল্লে দেখছি। কী যে করব ভেবে পাইনে। এখন ভালোয় ভালোয় মানে মানে মরতে পারলে বাঁচি ভাই বোগদাদি।'

আমি বললেম, 'দেখো জাহাঙ্গির যতই মাতাল হোক, ও তোমার রাজ্য একরকম চালিয়ে নেবে; শাজাহানও যতই পাগলামি করুক কিন্তু দেখো একদিন তোমার নাম রাখবে; ছেলেটি বেশ ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান। কিন্তু ওই যে তোমার শাজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেবটি, ওটি ভাই, তোমার গোলাপবাগে কাঁটাগাছ। ও তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। আমার সঙ্গে পথে আসতে তার দেখা হয়েছিল, একেবারে গোঁয়ার। আমি বেশ করে তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ ভাই বোগদাদি! তুমি শিক্ষা না দিলে আর দেবে কে! দেখো, তুমি তো এলাহাবাদ হয়ে যাবে, পার তো জাহাঙ্গিরটাকে একটু বুঝিয়েসুঝিয়ে মদ খাওয়াটা ছেড়ে যাতে সে এখানে এসে একটু কাজকর্ম দেখে সেইটে করো ভাই।'

'আচ্ছা তাই হবে।' বলে মসুরকে নিয়ে আবার সতরঞ্চি উড়িয়ে চললুম, যমুনার কিনারা দিয়ে। যাবার আগে আগারওয়ালা ছেলেদের জন্যে একরাশ পাথরের খেলনা সতরঞ্চিতে তুলে দিলে।

তখন রাত প্রায় দুটো। এলাহাবাদে পৌঁচেছি। ভেবেছিলুম জাহাঙ্গির ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গঙ্গাযমুনার ওপরে নৌকোর পুলের কাছে এসে দেখি কেল্লাটা একেবারে আলোয় আলোময়; এক ক্রোশ থেকে মদের গন্ধ, গান-বাজনার আওয়াজ, আর আতর-গোলাপের খোসবো পাওয়া যাচ্ছে। কেল্লায় একটা জলসা দেখে আমাকেও একটু সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে নিতে হল। তারপর একেবারে গিয়ে জাহাঙ্গিরের খাস মজলিশে হাজির।

জাহাঙ্গির আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে গেল! তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে একেবারে নুরজাহানের কাছে নিয়ে বললে, 'অনেক পথ এসেছেন এইখানে বিশ্রাম করুন; আমার বন্ধুবান্ধবদের বিদায় করে আমি এলেম বলে!' — বলেই জাহাঙ্গির সরে পড়ল।

আমি নুরজাহানকে বললেম, 'দেখো, আমায় এখুনি আবার রওনা হতে হবে, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আজ রাতে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, কালও হয় কি না সন্দেহ। তোমায় একটি কথা বলে যাই—জাহাঙ্গিরকে একটু সাবধান হয়ে সমঝে চলতে বোলো, নইলে তোমার শ্বশুর তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর

করবেন বলেছেন। তোমার শ্বশুর আমাকে এই পাথরের খেলনাগুলো দিয়েছেন; এগুলো তুমি নিয়ে খেলা কোরো, আমি এসব নিয়ে কী করব? এখন তবে আসি।'—বলে আমি আবার সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

মসুরটাকে আমি গাধা বলি, কিন্তু সে একেবারে নির্বুদ্ধি নয়। এরই মধ্যে সে জাহাঙ্গিরের ভিস্তিখানা থেকে পোয়াটাকে খাস অম্বুরি তামাক জোগাড় করেছে। মসুরটাকে বাহাদুরি দিতে হবে। কীসে আমার কষ্ট না হয় সেদিকে তার খুব নজর আছে।

ভোর নাগাদ একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি মসুর 'হুজুর, দেখুন! দেখুন!' বলে ঠেলে তুলেছে। দেখছি ডানা উঠলে পিঁপড়েগুলো যেমন মাটি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে ওঠে, তেমনি দলে দলে ষাঁড় হুহু করে উত্তরদিকে উড়ে চলেছে, আর দক্ষিণদিকে কেবল গাধা টঙ্গস টঙ্গস করে লাফাতে লাফাতে চলেছে।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! এত গোরু, এত গাধা আসে কোথা থেকে? দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে দেখছি একটা নদী আধখানা চাঁদের মতো বেঁকে চলেছে তারই দুই পারে দুই শহর; একটা শহরে কেবল হিঁদুদের মঠ আর মন্দির, পূজারি, পান্ডা, গুন্ডা আর সন্ন্যাসীর আড্ডা, আর-এক দিকে কেবল যত মোটা মোটা লক্ষপতি ক্রোড়পতি—তাদের বড়ো বড়ো মোটা মোটা থাম-দেওয়া বাড়ি আর যত টিকিধারী সভাপণ্ডিতের বাসা! এই দুই শহরের মাঝে দুটো বড়ো বড়ো চিতা জ্বালানো রয়েছে, আর শহরের যত লোক দিনরাত কাঠের বোঝা, তেলের কুপো এনে সেই চিতায় ঢালছে। যেমন এক-একবার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আর অমনি লোকগুলো তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর অমনি এক দল গোরু হয়ে বেরোচ্ছে, আর অন্যদল গাধা হয়ে দৌড় দিচ্ছে! এমন সময় দেখি দু-পার থেকে দুটো হিঁদুদের বুজরুগ আমাদের হাত নেড়ে ডাকাডাকি করছে, 'গোলোকে যাবে গো? গন্ধর্বলোকে যাবে গো?'

জাফরের মুখে শুনেছিলুম এরা নতুন মানুষ পেলেই ভেড়া বানিয়ে দেয়। আমি আর তাদের দিকে না দেখে বোঁ করে সতরঞ্চি চালিয়ে দিয়েছি! একেবারে গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা হাজির! মসুরটা তো আজব শহর কলকেত্তা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মসুরকে বললুম, 'এখানে বুজরুগি বড়ো কম চলে না—মানুষ ধরে এরা পাঁঠা করে রাখে, আর সময়মতো সেগুলোকে বলি দিয়ে বাজারে তাদের মাংস বিক্রি করে, নিজেরাও পাঁঠার ঝোল রেঁধে খায়।' বলতে বলতে দেখি দলে দলে ছেলে-বুড়ো যত বাঙালি—কেউ কানে কলম গুঁজে, কেউ কেতাব-বগলে 'ওই দেখা যায় বরানগর, সামনে কাশীপুর, কলকাতা কদ্দূর।'—বলতে-বলতে ছুটে এসে এক-একটা বড়ো বড়ো কেতাবখানা-দপ্তরখানায় গিয়ে ঢুকছে বেশ মনের ফুর্তিতে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে দেখি এক-একটা বোকা ছাগল!

'মসুর, জানো একে বলে কামরূপ কামিখ্যের ভেলকিবাজি। আর এই শহরে বাঙলার যত বড়ো বড়ো বুজরুগের আসল আড্ডা। ওই দেখো গড়ের মাঠে একটা জাদুঘর, আর ওই আলিপুরে একটা চিড়িয়াখানা, আর ওই পুবদিকে দিঘির ধারে একটা গোলামখানা। আলিপুরে মানুষ-পাঁঠা জিয়োনো থাকে, ওই গোলামখানায় তাদের পোষ মানায়, আর মরবার পরে ওই জাদুঘরে তাদের হাড়গুলো আর ছালগুলো জমা রাখে। এখানে পা দিয়েছ কী বোকা বনেছ!'— বলেই আমি একদণ্ড আর সেখানে না থেকে একেবারে কালাপানির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

আকাশের ওপর দিয়ে পাখির মতো সোঁ সোঁ উড়ে চলেছি, দেখি বাংলাদেশের বুজরুগ তাদের দূরবিনগুলো উঠিয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা ভালো হল না মসুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, তখন সিন্ধবাদি হিরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মসুর এসো, এইখানেই নেমে পড়া যাক। এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভালো।'

বলে আমরা রূপনারায়ণ নদীর ধারে নেমে তলপিতলপা বেঁধে হেঁটে গিয়ে রেলে চড়লুম। আমি হলুম হিরানন্দ বাবাজি আর মসুর হল কিচ্‌কিন্দা—আমার উড়ে চেলা। গাড়িতে দেখি কেবল মাড়োয়ারি, মাদ্রাজি আর বাঙালি। বাবাজি দেখে তারা আমাকে আদর করে বসালে, কত কথা পুছতে লাগল। জবাব দিতে পারিনে; কাজেই আমি সাজলুম বোবা আর মসুর হল কালা। আর কোনো গোল রইল না।

ছ-মাস পুরীতে আছি, রোজ মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু চুড়োর ওপর কোথায় যে সিন্ধবাদের সিন্দুকটা গিয়ে আটকে আছে তার সন্ধান পাইনে। শেষে একদিন একটা ফন্দি মাথায় এল। মসুরকে বললুম, 'দেখ মসুর, প্রায়ই দেখি এক-একটা লোক ওই মন্দিরের চুড়োয় নিশেন বাঁধতে ওঠে, তুই ওদের দলে ভিড়ে যদি একদিন মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বেশ করে সিন্দুকটা কোথায় আছে দেখতে পারিস তবে তোকে একখানা হিরে বকশিশ দেব।'

মসুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, বলে 'পড়ে মরব কত্তা!' কিন্তু শেষে দেখি একদিন গেছে! বেশ করে চুড়োটা দেখে মসুর এসে বলছে, 'কত্তা! সিন্দুক এখেনে নেই। ওই চুড়োর ওপর থেকে বিশ ক্রোশ তফাতে আর-একটা মন্দির দেখা যায়, সেইখানে আমি পষ্ট দেখলুম সিন্দুকটা যেন পাথরের গায়ে ঝুলচে। কিন্তু অনেক দূরে কত্তা! এইখান থেকে বালির ওপর দিয়ে ঠিক সোজা একেবারে পুবমুখো যেতে হবে কত্তা।'

মসুরের কথাই ঠিক। আজ ছ-মাস দেখছি এই কালাপানি দিয়ে কত জাহাজ এল, গেল; কিন্তু একটি পেরেকও দেখলুম না যে এই মন্দিরে এসে লাগল। সেইদিনই সতরঞ্চি উড়িয়ে একেবারে মসুরের সেই মন্দিরে হাজির। গিয়ে দেখি মন্দিরের সব আছে কেবল চুড়োটি নেই।

'যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে মসুর! সিন্দুক সরিয়ে ফেলেছে মসুর! এত কষ্ট করে আসা সব বৃথা হল মসুর!' বলেই আমি অজ্ঞান।

'কত্তা গো, কী হল!' বলেই মসুরও অচৈতন্য।

যখন আবার চোখ খুলেছি দেখি একটা ছোটো ঘরে কে আমাদের বন্ধ করে গেছে—একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে। দেখি পিদিমের কাছে একটা বাকসো রয়েছে। বাকসোটা লোহার, আর তার ওপরে পেতল দিয়ে লেখা রয়েছে—'সিন্ধবাদ।' তাড়াতাড়ি বাকসোটা টেনে নিয়ে খুলতে যাব, দেখি পকেটে চাবিটা ছিল সেটা কে চুরি করেছে!

'মসুর চাবি নিলে কে? নিশ্চয় তোর কাজ!'

'না কত্তা চাবি তো আমি নিইনি।'

'মিথ্যেবাদী, পাজি!'—বলেই সেই লোহার বাকসোটা ছুড়ে মেরেছি। যেমন মারা অমনি মসুর—'বাপরে!' বলে ঘুরে পড়া; আর বাকসোটা খটাং করে খুলে একটা এক-বেগ্‌দা মানুষ বেরিয়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

সিন্দবাদ
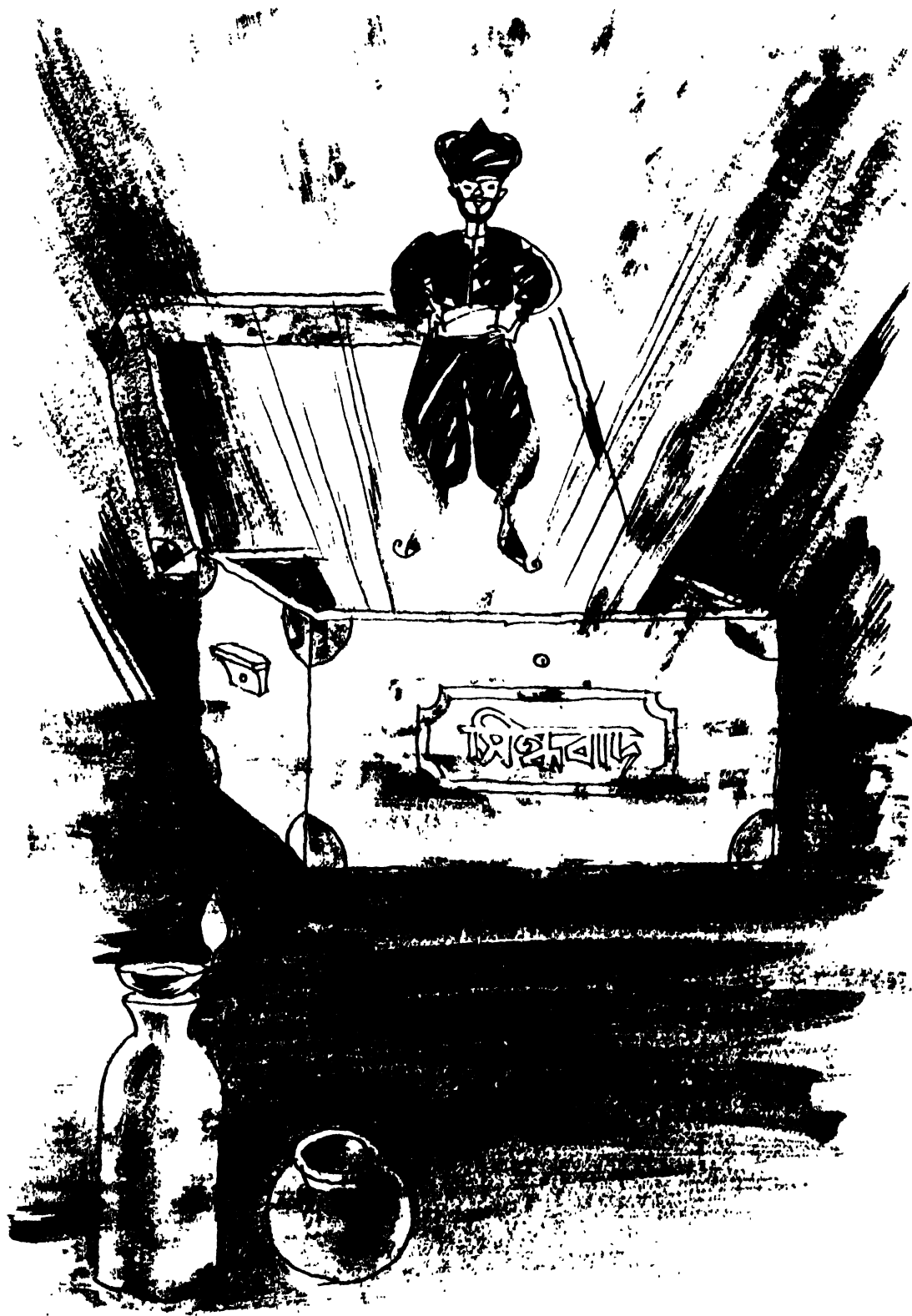
একী সিন্ধবাদ যে! হাতে তার সেই চাবিকাঠিটি। সিন্ধবাদ সামনে এসেই বলছে, 'কী হারুন-অল-রসিদ!—হিরানন্দ বাবাজি! সিন্ধবাদের হিরে পেলে কি? চাবিটা তো তার পেট থেকে খুঁজে বার করলে! এখন হিরেগুলোও বার করো।'

'আমার সঙ্গে তামাশা!'—বলেই যেমন সিন্ধবাদকে ধরতে গেছি আর সে একেবারে চম্পট! যেন নিভে গেল!

আমার বড়ো ভয় হল; এত বুজরুগি কাটিয়ে এসে শেষে কি উড়ে-বুজরুগের পাল্লায় পড়লুম!

'মসুর! কথা কসনে যে মো-সু-উর?'

মাথার ওপরে চামচিকে কিচকিচ করে বলছে, 'মঁসুঁর কি আর আঁছে সেঁ কালো কিঁচ্‌কিন্দে মঁরে ভূঁত হয়ে গেঁছে, এই অঁন্ধকারে তোঁমাকেও ভূত হয়ে থাকতে হঁবে। হিঃ-হিঃ-হিঃ।'—বলেই চিকচিক করে আমার চারদিকে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল।

মসুরটা হঠাৎ মরে গিয়ে আমায় ভারী বিপদে ফেলে গেল! তার মতন এমন নেমকহারাম চাকর আমি দেখিনি!

রাগে-দুঃখে আমি গোঁ হয়ে বসে আছি; চামচিকেটা ঘুরতে ঘুরতে যেমন আমার হাতের কাছে এসেছে আর অমনি আমি খপ করে তাকে ধরে ফেলেছি। ধরেই দেখি সেটা সেই এক-বেগ্‌দা সিন্ধবাদ!

'তবে রে পাজি! এখন তোকে কে রাখে! বল কোথায় হিরেগুলো রেখেছিস? নইলে তোকে ওই সিন্দুকে বন্ধ করে কালাপানির জলে ফেলে দেব!' বলেই আমি তার হাত থেকে বাকসের চাবিটা কেড়ে নিলুম।

তখন সিন্ধবাদ আর কী করে? চুপিচুপি আমাকে যেখানে তার হিরে-জহরতগুলো পোঁতা আছে সেই জায়গাটার নাম বলে দিল।

'জায়গাটা কোথায় জানো?'

'চামচিকেটা যদি আমায় আগে সেটা বলত তবে আমাকে এত কষ্ট পেতে হত না। জায়গাটা হচ্ছে ওই— সে কী-বলে কী— সেই যেখানে জগন্নাথের যত যাত্রী ঘুরপাক দেয়!'

'অক্ষয় বট?'

'আরে না বাবু, গাছটাছ সেখানে কোথা!'

'তবে দোলমঞ্চ হবে।'

'সেখানে তো দুলতে হয়। ঘুরতে হয় কোথায়?'

'তবে চানবেদি!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরই কাছাকাছি, ঠিক মনে হচ্ছে না এখন, খানিক বাদে মনে হবে।'—বলেই হারুন্দে চুরুট ফুঁকতে লাগল!

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করি, 'হারুন্দে, নামটা মনে পড়ল কি? আমার যে ভারী শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে কোথায় হিরেগুলো লুকোনো আছে।'

কথা নেই!

'বলি ও হারুন্দে, মনে পড়ল কি?'

'একটু-একটু পড়ছে।'

'বলে ফেলো।'

'রোসো বলছি— ''ল'' না না, ''র'' আর ''ন''; ''র'' হল না তো! ''র'' আর 'ন''-র মাঝে কী হয় বাবু?'

'কী হয় হারুন্দে?'

'মনে পড়ছে না। মসুর, ''র'' আর ''ন''-র মাঝে কী হয়? ওহো তুই কেমন করে জানবি? তোকে তো আমি সেই লোহার বাকসোতে পুরে জলে ভাসিয়ে দিলুম। ''র'' আর ''ন'' তার মাঝে হল—'

'তোমার মাথা আর মুন্ডু! শোনো কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনোকালে হারুন-অল-রসিদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য উপন্যাস আর ডিটেকটিভ গল্প পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কখনো একটুকরো ইতিহাস, কখনো উপন্যাস, দু-ছত্তর বা কবিতা, দুটো-বা সত্যি কথা, দশটা-বা মিছে কথা। কখনো হাততালি দিচ্ছে, কখনো গালাগালি। মাথাটা যেন বাংলা খবরের কাগজ।—মূল্য দুই পয়সা মাত্র! আমি কিচ্‌কিন্দে এই কিচ্‌কিন্দায় থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম সিন্ধবাদকে তো কখনো এ তল্লাটে দেখিনি। একটা কথা বললেই হল— সিন্ধবাদ এল, চুম্বকে তার সিন্দুক টেনে নিলে! জাহাজ টেনে নেয় এত বড়ো চুম্বক পাথর— সে পাথর গেল কোথায়?'

হারুন্দের কথা নেই।

'দেখলে বাবু, গল্পের খেই ধরতে জানে না, গল্প বলতে আসে। ও তো সেদিনের ছেলে। গল্পের ও জানে কী? বোগদাদ-ফোগদাদ তো সেদিনের কথা; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের গল্প আমি জানি। গল্প শুনতে চাও তো শোনো—'

খাতাঞ্চির খাতা

ছেলেমেয়েরা যদি জেগে থাকতে পারত তবে তারা দেখতে পেত, সব কচি ছেলেকে তাদের মা চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে সবার মনের মধ্যেকার ছোটোখাটো সিন্দুকগুলি খুলে তার পরদিনের জন্যে বেশ করে গুছিয়ে রাখছেন। ঠিক যেমন করে পেঁটরার কাপড় গোছানো হয় তেমনি! সমস্ত দিন খেলায়-ধুলোয় ছেলেরা যে কোথায় কী ছড়িয়ে ফেলে তা তাদের মনেও থাকে না, মা সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেন মনের সিন্দুকে, যাতে সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের আর কিছু খুঁজতে না হয়। মনের সিন্দুকে যদি কোথাও পোকার মতো দুষ্টুবুদ্ধি দেখেন তো মা সেটি আস্তে আস্তে টেনে ফেলেন, ভালো বুদ্ধিগুলিকে যত্ন করে কাগজে মুড়ে মলমলের কাপড়ের মধ্যে ঝেড়েঝুড়ে পোঁটলা বেঁধে তুলে রাখেন। রোজ রোজ কত টুকিটাকি মনের সিন্দুকে ছেলেরা যে জমা করে, তা দেখে মা এক-এক সময় অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। রাতের বেলায় যদি কচি ছেলেরা জেগে থাকতে পারত তবে এ সবই দেখতে পেত, কিন্তু তারা কচি ছেলে কিনা তাই যেমন মা সুর করে তাদের চাপড়ান, 'খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়োল' বলেন, অমনি তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো কোনো ছেলে, 'বর্গি এল দেশে' এটুকুও শুনতে পায়, তারপর বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল তাও দেখে, কিন্তু তারপর যে কী কাণ্ড ঘটে খুব কম ছেলেই সেটা দেখেছে। সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুশকিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজে চাবি নেই, একটা করে কীল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি! সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমনকী রাতের স্বপ্নের ছবিও, এই ছোট্টো খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে। এ খাতা এমনই চমৎকার এমনই চকচকে যে ছেলেরা হাতে পেলে তার মলাট চিবিয়ে সন্দেশ বলে সেটাকে খেয়েই ফেলত। তাই মা মনের লুকোনো দেরাজ রোজ রাতে উলটেপালটে দেখে চুপিচুপি বন্ধ করে রাখেন। যতদিন না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোনো ছেলেমেয়ে এই লুকোনো খাতার সন্ধান পায় না।

অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজ খাতা-লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেল না; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে একদিন সবুজ খাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি জানি তখন সে খাতার গুণ! আর একটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদল করেছিলাম আর কী! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কী রং দিয়েই সেসব ছবি লেখা! বাজারে সে রঙ পাবার জো নেই।

প্রথম পাতাতেই লেখা, কমলাপুলির দেশে সকাল হচ্ছে, আকাশে কমলানেবুর রং, গাছে গাছে সোনালি

সব ফুল ফল পাখি, তার মাঝে কনকরাজার মেয়ে কপলে গাই দুইতে বসেছে, নদীতে সব সোনালি রঙের হাঁস, মাছ আর নৌকো ভাসতে ভাসতে চলেছে, মাঠে মাঠে সোনালি ধানের শিষ বাতাসে ঝিকমিক করে দুলছে, তার মাঝে ছোট্ট একটি রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে, রাজকন্যের হরিণ সোনার ছিকলি ছিঁড়ে সেইদিকে ছুটে চলেছে বাঁশির গানে ভুলে। আর শেষ পাতায় ফটিকজোছনার দেশে রাজকন্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নীল আকাশে মস্ত চাঁদ হিঞ্চেবনের আড়াল থেকে রুপোর থালার মতো দেখা দিয়েছে, আর সেই রাখাল পরানের কাটিটি আস্তে আস্তে রাজকন্যার বুকে ছুঁইয়ে দিচ্ছে। এই দুই ছবির মাঝে রয়েছে কোন্নগড় আস্তাকুঁড়ে বেড়াল বসে আছে, খেলাঘরে ছেলেরা ইকড়িমিকড়ি খেলছে, হিঙুল গাছে মাদারের ফুল, আঁকড়ফুল বেঁচফুল ফুটে রয়েছে, ট্যাপোর ভিতর সব ঝিঙে ঝুলছে, নটেশাগের গুড়িতে নেজঝোলা পাখি উড়ে বসে চাটিমকলা খাচ্ছে, চালতাতলায় ঝিঁঝি ডাকছে আর প্যাখনাবিবি নাচছেন, সোনার আঁচিলে-পাঁচিলে হড়মবিবি খড়ম-পায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর হলদেগুড়ির মাঠে গামুর-গুমুর ঢোল বাজছে; চেঙা খেতে নৈ ছাগল ঝেঙাফুল ছিঁড়ে খাচ্ছে, বনকাপাশি গাছে নোটনপায়রা ডিমে তা দিচ্ছে, রামছাগল আতাপাতা খেতে লেগেছে, মুড়ো নটেগাছের তলায় গালফোলা গোবিন্দর মা বসে বসে তাই দেখছে, আর চুবড়ি মাথায় দিয়ে ভোম্বল দাস হাটে চলেছে। তারপর বাপ-মায়ের দেশের ছবি—সেখানে পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে মাছ ধরছে, বাঁশতলায় বুড়ি শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছে, জোড়পুতুলের বিয়ে হচ্ছে, কাঁচনিপাড়ার নাচনি নাচ্ছে, জটাধারী ভিক্ষে চাইছে, 'হাতে পো কাঁখে পো' ছেলে ধরে বেড়াচ্ছে, জোয়ান গুরু জোড়া বেত হাতে বসে, গোয়ালের শোভা নেহাল-বাছুর হামা দিচ্ছে, শিব সদাগর অগ্রদ্বীপে বাণিজ্য করতে চলেছেন, ভাঁতকাঁদুনে ফেউয়ার মা ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে, আর মাসি-পিসি বনগাঁয়ে বসে খয়ের মোয়া পাকাচ্ছেন। ময়রাবুড়ো সন্দেশ খাচ্ছে, কামারশালে হাতুড়ি পড়ছে ঠকাঠক, খাটের খুড়ো নলের হুঁকো নিয়ে তালপুকুরের ঘাটে চুপটি করে বসে আছেন, কানকাটার মা তাঁর কান চুলকে দিচ্ছে, রামের বাঁশিতে তুলো জড়িয়ে। রামতুলসীতলায় দুখপাসরা নয়নতারার পিদিম জ্বলছে, আর ভুঁড়োশেয়ালি অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে সেদিকে চেয়ে আছে; মন্দিরে দেবশঙ্খ বাজছে। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছবি সব—বেড়াল কোমর বেঁধে পালকির সঙ্গে চলেছে। তারপর বর্ষাকলের ছবি সব—অভদ্রা বর্ষাকালে হরিণ বাঘের ছাল চাটছে, আকাশজুড়ে মেঘ করেছে, সুয্যি পাটে বসলেন; খুকু জল আনতে পদ্মদিঘির ঘাটে চলল, সেখানে পদ্মদিঘির কালো জলে হরেকরকম ফুল ফুটেছে। খুকুর গোছা-ভরা চুল বাতাসে হোটোর নীচে দুলছে, মা দূর থেকে ডাকছেন :

'বৃষ্টি এল ভিজবে সোনা, চুল শুকোনো ভার,
জল আনতে খুকুমণি যেয়ো নাকো আর।'

তারপর একটি ছবি সে যে কী চমৎকার কী বলব! ছোটো নাতনি তার বুড়ো দাদামশায়ের গলা ধরে বাপের বাড়ি যেতে বলছে—

'ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে,
ওগো দাদাভাই আমার মন কেমন করে!'

দাদাভাই তার পিঠে হাত বুলিয়ে কইছেন—

'এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে কঁকিয়ে
ও মাসেতে লয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।'

আর বলছে তারপর দু-জনে দু-জনের গলা ধরে কাঁদছে—

'হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

এমন সব ছবি যা দেখে হাসি চাপা যায় না, আবার এমন সব ছবি যা দেখতে দেখতে চোখে জল আসে।

এমনি আমার খাতা, তেমনি সব ছেলের খাতা আছে, তাদের আপনার আপনার মনের লুকোনো দেরাজে। আমার খাতায় একরকম ছবি পড়েছে, তাদের খাতায় অন্যরকম ছবি পড়েছে। কোনো ছেলের খাতায় শিব সওদাগরের ছবিই বেশি, কেবল বাণিজ্য আর দেশবিদেশে ঘোরা। কোনো মেয়ের দেরাজ কেবলই পুষিবেড়ালে ভরা; কারু কেবল জাদুমণির ছবিতেই পোরা; কারু-বা একানড়ে, কানকাটা, উদবিড়াল, চোরের মা পাঁদারু-মাচারু, আঁকড়াবাড়ি, এমনি সব বিকট ভয়-পাওয়ানো ছবিতেই অর্ধেক খাতা ভরে গেছে। কারু তাকতুড়াতুড়, চড়ুই-মড়ুই তালপাতার সেপাই, এমনি সব মজার ছবিতে বারো আনা পোরানো। কোনো ছেলের আরব্য উপন্যাসের ছবি দিয়ে খাতা ভরতি; কারু-বা ননিগোপাল-রাখাল ছাড়া কিছু নেই; কারু ঘটিবাটি খেলাঘর আর খেলনা, কারু হিজিবিজি চাঁচিমুচি; কারু কেবলই ফুটবল আর মার্বেল, ঘুড়ি আর বেলুনে ভরা; কারু কেবল গহনা, কাপড়, চুলবাঁধা পালকি-চড়া, কারু লাফালাফি মারামারি ছাড়া কিছু নেই। কারু-বা কেবল উনুন-হাতা-বেড়ি, মাছ তরকারি, কারু ছিপ মাছ পাখি, পাখিধরা ফাঁদ, খাঁচা, খরগোশ, পায়রা, প্রজাপতি ছাড়া খাতায় আর কিছু নেই; কারু খাতায় বালিশ তোশক পাখা আর ঘুমের ছবি। কারু—যেমন আমাদের টোটোর—দুধ রসগোল্লা সন্দেশ জিলিপি বুঁদিয়াতে ভরা ছিল আগে, এখন আবার সেগুলোর ওপরে পড়েছে নতুন সব ছবি—বেলুন, ঢোলক, হিন্দুস্থানি গান, অছিলাল দরোয়ান, টমা কুকুর, মোটর গাড়ির ভেঁপু, দুলো ড্রাইভার, বড়োদাদার পাকানো চোখ, ডাক্তারের হাতের চোঙা। কিন্তু কী ছেলে, কী মেয়ে সবারই খাতার মলাটের ভিতরে বাবা আর মায়ের ছবি দুটি। আর মলাটের আর-এক পিঠে যত ভাইবোন তাদের ছবি। সে ছবিগুলি কখনো বদলায় না, মোছেও না, বড়োজোর মাথার কালো চুলের রঙ ফিকে হয়ে সাদা হল, এইমাত্র। এই সবুজ বইগুলি দেখতে ছোটো, কিন্তু সব ছবি পাশাপাশি ছড়িয়ে সাজালে, ইয়োরোপের চেয়েও বড়ো দেখাবে মনের লুকোনো দেশের এই ম্যাপটা।

পুতুর বই

ছাতের উপর থেকে শহরের বাড়িঘর দেখে ভাবছ কী?

দিনের বেলায় শহরের এই যে হাজার হাজার ইটের বাড়ি, তার কলের চিমনি দেখছ, রাত নয়টার তোপ যেমন পড়বে, সব অমনি বাগান আর বাজার, মাঠ আর পুকুর হয়ে যাবে। থাকবার মধ্যে থাকবে

রাজার কেল্লা, রায়মশায়দের বৈঠকখানা আর এই জোড়াসাঁকো আর এই তেতলা বাড়ি। বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি? আচ্ছা সকালবেলা পুবদিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও, সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে, আবার সেটা কখনো দেখাবে রুপোর বাটি যেন কাত হয়ে পড়েছে, কখনো-বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দিনের বেলায় আকাশে নীল রং, পাখি আর মেঘ, এ ছাড়া কিছু তো দেখো না, রাতের বেলায় আকাশে দেখো, সব তারা ফুটেছে দেখবে। এ যদি হতে পারে, তবে আর রাত হলেই শহরটা বাগান হতে পারবে না কেন? দুপুর-রাতে ভূতের ভয়ে ছাতে উঠতে পার না, তাই বলো, না হলে দেখতে পেতে, সব বাড়ি ঘর দুয়োর কোথায় মিলিয়ে গেছে, কেবল চারদিকে সব সারিসারি আলোর নিশেন ঝুলছে, চৌকো, লম্বা, চওড়া, সরু, তর-বেতর। আর কেবল রাজার বাড়ির চুড়ো, রায়মশায়দের বৈঠকখানার বারান্ডা, আর আমাদের চিলের ছাতটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে, আর কিছু নেই। পুকুরে সব ব্যাঙ করর্ করর্ করছে, বনে বনে ঝিঁঝি ঝিমঝিম করছে। খানিক রাত পর্যন্ত একটু একটু ঢোলের আওয়াজ কিংবা একটু একটু মানুষের গলা শোনা যায়, তারপর সব চুপ।

রাত দুটোর পরেও যদি কোনোদিন জেগে থাকতে পার, তবে বুঝবে আমার কথা সত্যি কি না। তখন যেমনি শেয়ালদার দিকে একপাল শেয়াল হুয়া-হুয়া বলে ডাক দিলে, সব অমনি বাগান আর বন হয়ে গেল, একটিও আর ইট থাকল না। পুতু তার বাঁশি বাজাতে শুরু করলে আর সব পরিরা জোনাক-পিদিম জ্বালিয়ে একে একে বেরিয়ে, বিশ্বাস হল না বুঝি? ভাবছ ইট কাঠ পাথর কখনো গাছ হতে পারে? এই তো? যেয়ো দেখি জাদুঘরে, দেখবে গাছ পাথর হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে গাছ। আকাশের তারা তো দেখো, যেন আলোর ফুলকি! একটা তারা সেদিন মাটিতে খসে পড়েছিল, জাদুঘরে কাচের বাকসোয় সেটা বন্ধ আছে, একেবারেই আগুনের ফুলের মতো নয়, শুধু একতাল চকচকে লোহা! দেখবে, যে শিকলিতে তারাটা আকাশে ঝাড়ের মতো ঝোলানো ছিল, এখনও সেটা তেমনিই আছে। জাদুঘরে রাত্তিরে যদি ঢুকতে দিত তবে হয়তো অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাওয়া যেত।

দিনের বেলা ঘরবাড়ি চাপা পড়ে, তাই বলে বাগান যে থাকে না মনে কোরো না। আমাদের ওই গোলবাগানের ওধারে যে ফুটবল খেলার জমি দেখছ, ওর তলায় একটা মস্ত পুকুর আর বটগাছ আছে, ছেলেবেলায় আমরা সেই বটতলায় বসে পুকুরে মাছ ধরেছি। এখনও এক-এক দিন আমি সে বটগাছ আর পুকুরটা পষ্ট দেখতে পাই। পুকুরটা নিশ্চয়ই আছে, না হলে ওই বকটা ওখানে ঘুরবে কেন? বক কখনো গোরুর মতো ঘাস খেয়ে বাঁচে না, নিশ্চয়ই রাতের বেলায় যখন পুকুরটা বেরিয়ে আসে মাটির নীচে থেকে, তখন বকটা সেখানে মাছ ধরে ধরে বেড়ায়, তাই এতদিন বেঁচে আছে।

এইবার পুতুর বইখানিতে হালিশহরের পুরনো ছবি-দেওয়া ম্যাপখানার দিকে চেয়ে দেখো। শহর কোথায়? সবই বাগান, পুকুর, ঘাট, মাঠ। আর পশ্চিমে দেখো বড়োগঙ্গার ধারে তিনটে বড়ো বড়ো ঘাট; মাঝে বাবুঘাট, দক্ষিণে কয়লাঘাট, উত্তরে জগন্নাথঘাট। বাবুঘাটে শৌখিন বাবুদের বজরা, কুটির বাবুদের পানসি, ছেলে বাবুদের বাচ খেলার নৌকো; কয়লাঘাটে সদাগরদের কয়লার জাহাজ, পালের জাহাজ, ওলন্দাজ দিনেমারি বোম্বেটের জাহাজ; জগন্নাথের ঘাটে মহাজনদের গাধাবোট, বড়ো ডিঙি আর নাখোদার জাহাজ। দক্ষিণে রয়েছে আদি গঙ্গা, সেখানে কালিঘাটে খালি কিস্তিমার হল। পুবে থেকে

টালার নালা উত্তরে গিয়ে পড়েছে, সেখানে বর্গি ধরার জন্যে সারিসারি সব ছিপ রয়েছে। তারপর বাগবাজারের খাল, সেখানে খালি ধোঁয়া এত যে, কিছু দেখবার জো নেই।

এই ম্যাপখানায় হাবড়ার পুলের নামগন্ধ নেই, রয়েছে কেবল কতকালের বাঁধা জোড়াসাঁকো। এই দুই পুল হচ্ছে একটি রাজার, একটি রায়দের। এই জোড়াসাঁকো পেরিয়ে রাস্তা চৌমাথায় গিয়ে মিলেছে। চৌমাথা থেকে দক্ষিণমুখো গেলেই চৌরঙ্গি হয়ে রাজাবাগান পাবে, আর উত্তরমুখো গেলে পাবে রায়বাগান। এই দুই বড়ো বাগানের ঠিক মাঝে দুটো সমুদ্রের মতো প্রকাণ্ড দিঘি। রাজাবাগানে চৌকানো লালদিঘি, তার মাঝে শ্বেতদ্বীপ, আর রায়বাগানে হল গোলদিঘি তার মাঝে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে থাকেন ভুষুন্ডিকাগ, কাগের ছা বগের ছা পাখিরা আর শ্বেতদ্বীপে থাকে সব ডানাকাটা পরি আর পর। লালদিঘির পারেই রাজার গড় আর গোলদিঘির ধারেই দেখো বাবুদের বৈঠকখানা, গড়ের মধ্যে কামান লেখা রয়েছে আর বৈঠকখানায় হুঁকো আঁকা রয়েছে দেখো।

এইবার প্রথমে রায়বাগানটা ঘুরে দেখো কীরকম। পায়ে হেঁটে ঘুরতে হলে আমার মতো পঞ্চাশ বছরেও বাগান দু-খানা দেখে শেষ করতে পারতে না, ম্যাপে বলে চটপট হচ্ছে। তারপর এই রায়বাগানের মধ্যে দেখো পাথর আর নুড়ি দিয়ে ঘাটবাঁধানো জোড়াবাগান, একটায় কেবল কলাগাছ আর-একটায় কেবল কলমের চারা, কচুগাছ। একটাতে লাফাচ্ছে হনুমান আর-একটাতে বসে জাম্বুবান। আর একটু এগিয়ে, জোড়াসাঁকোর বড়ো রাস্তার ধারে রয়েছে দেখো সিংহীর বাগান। পাছে সিংহী বেরিয়ে পড়ে সেজন্যে তার চারদিকে শিক দেওয়া রয়েছে দেখো শিকদার বাগান। সেখানে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে সিংহীকে দেখতে পারে। শ্যামপুকুর আর মনোহরপুকুর, এই দুই পুকুরের মাঝে, শানবাঁধানো মানিকতলায় সোনার গাছে চড়ে মুক্তোর ফল মানিকের ফুল নিয়ে, রায়দের ছেলেরা বড়ো হয়েও দিনরাত খেলা করে। আর একদিকে ফুর্তির জন্যে মোহনবাগানের ফুটবল গ্রাউন্ড, নিত্তু রায়দের ছেলেরা সেখানে গ্রান্ড কাপ না হলে যায় না—পাড়ার ছেলেরাই সেখানে খেলে।

গোলদিঘির দক্ষিণ ধারেই পেয়ারাবাগান, তারপরে ফড়েপুকুর পুকুরের ধারে ফড়েদের ঘর, তারা পেয়ারা গাছ জমা নিয়েছে। পুকুরের পাশে পটলডাঙার খেতে পটল হয়েছে। তারপরে বউবাজার, মেছোবাজার— রায়গিন্নিদের মাছ আর দশহাত কাপড় এই দুই বাজার থেকে তোলা হিসেবে কেনা হয়। এরই পাশে বাঁশতলা, সেখানে কেবল মোটা মোটা রায়বাঁশের ঝোপঝাড়, গুন্ডারা এখান থেকে বাঁশের লাঠি সংগ্রহ করে এখনো। বাঁশতলার ধারেই বড়োবাজার, সেখানে জলের খেলা থেকে আবির খেলা পর্যন্ত না পাওয়া যায় এমন জিনিস সেই। তার পাশে আমা-ইট দিয়ে গাঁথা এমো পোস্তাতে ফল বিক্রি হচ্ছে। তারই কাছে বড়োবাজারের পরেই ছাতুবাবুর মাঠ, বাগবাজার পর্যন্ত সেখানে এক চড়কগাছ ছাড়া আর একটি গাছ নেই দেখ। এ ছাড়া নালার ধারে মাড়েদের বাগানের পাড়ে ধোপাপুকুর, কাপড় কাচবার জন্যে, নাপতে-বাজারের ধারে ঝামাপুকুর, রায়গিন্নিদের আলতা পরবার পা ঘষবার জন্য; তারপর মুচিপাড়া কুমোরটুলি এমনি সব। বড়োবাজার আর বাগবাজারের মাঝে শোভাবাজার সেখানে রায়বাবুদের বিয়ের শোভাযাত্রার সোলার কাগজের পাহাড় মউরপঙ্খি, কদমঝাড়, খাসগেলাস, চতুর্দোলা, মহাপায়া, আসাসোঁটা, সমস্ত ঠোসা রয়েছে; ইচ্ছে করে ভাড়া করো, চাও তো কিনে নাও। নয়তো বাবুদের কাছে চেয়ে আনো। এরপর বাগবাজার, সেখানে বাঘের দুধ, বাঘের চর্বি এমনি সব আজগুবি জিনিস

বিক্রি হয়। তা ছাড়া রায়মশায়ের রায়বাঘিনি গিন্নি বাগবাজারের মেয়ে, বাগে পেলে তিনি সিংহীকেও জব্দ করে ছাড়েন।

এর ইদিকে বাদুড়বাগান, সেখানটায় আদুরে ছেলেমেয়েদের যাওয়া মুশকিল, কেন না, গেলেই আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খেয়ে ফেলবে। তাই বলি জগন্নাথঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে জোড়াবাগানের হনুমান আর জাম্বুবানকে, 'ও হনুমান কলা খাবি, ও জাম্বুবান কচুপোড়া খাবি, জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি' বলে চলো হাতিবাগানে রাজহস্তী দেখতে।

কী খুঁজছ? আমাদের তেতলা বাড়িটা? ওই দেখো জোড়াসাঁকোর দুটো পুল, তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ওখানে লেকা রয়েছে 'পীরবাগান'। ওই 'র'য়ের মাথার যে শূন্যটি, ঠিক তারই মাঝে দেখো আমাদের বাড়ি। খুব ছোট্ট দেখা যাচ্ছে।

চলো এইবার রাজাবাগানে হাতি-ঘোড়া, গোর-গোরা দেখে আসি। কিন্তু বলি, চৌরঙ্গি এত বড়ো রাস্তা যে, সেখানে পায়ে হেঁটে সব দেখতে চেষ্টা করেছ কী 'চৌরঙ্গি-বাতে' পঙ্গু হয়ে তার পরদিনই বিছানায় পড়েছ। চলো বাবুঘাটে পানসি চড়ি, পা বাঁচবে—চারটে পয়সা গেলেই-বা।

ওই যে গঙ্গার ধারে ধারে কেল্লার সামনে সারি সারি সব, ওগুলো গাছ নয়, জাহাজের মাস্তুল। দেখছ জাহাজের যেন বন একটা। ওই যে কেল্লার মধ্যেখানে মস্ত একটা মোটা থামের মতো, যার মাথায় একটা শিকে প্রকাণ্ড একটা কামানের গোলা গাঁথা রয়েছে, ওইটে হচ্ছে তোপ। ওই গোলা যেমন পড়বে দিনের বেলায় দুম করে মাটিতে অমনি সবার ঘড়ি খুলে দেখতে হবে ঘড়ি চলছে কি না।

আবার ওই গোলাটা শিক বেয়ে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে দুপ করে যেমনি রাত নটায় নীচে পড়বে, অমনি যে যেখানে আছ হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিতে হবে, এ না করলে তোমার নিন্দে হবে।

জোড়াসাঁকো হয়ে রায়বাগানে ঢুকতে হলে মহড়ায় যেমন পীরের দরগা, তেমনি কালীঘাট হয়ে রাজাবাগানে ঢুকতে হলে প্রথমেই আলিপুর। সেখানে হাতিবাগানে দেখবে গজহস্তী শুঁড় দোলাচ্ছে, একটি পয়সা দাও অমনি টুপ করে সেটি কুড়িয়ে নেবে। মাহুতকে বকশিশ দিলে এই হাতির পিঠে চড়িয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবে। চিড়িয়াখানার দরজায় একটা হাঁসকল পাতা আছে, একজনের বেশি দু-জন মানুষ গেলেই ধরা পড়ে যায়। এই বাগানের পিছনে পাতিপুকুর, ডিমের বদলে, চিনে-পাতি কলম্ব নেবু, যারা নিরামিষ খায় তাদের জন্যে হাঁসেরা পাড়ছে। এক-একটা বাগানকে-বাগান জাল দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে পাখিরা মনের সুখে উড়ে বেড়াচ্ছে, বাসা বাঁধছে, ডিম পাড়ছে, আবার কত কী পড়ছে। এত বড়ো এই চিড়িয়াখানা যে দিনের পর দিন দেখে গেলেও শেষ হবে না। তারপরেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর গড়ের মাঠ। এই মাঠের ধারেই জাদুঘর, সেখানে সব মরা মানুষ জন্তু জানোয়ার। সেখানে দরজায় পাহারা নেই, ওমনি যেতে পার আসতে পার, কেবল ছাতা-লাঠি যাবার হুকুম নেই।

এরই কাছেই জানবাজার আর মুরগিহাটা। কোম্পানির বাগান হচ্ছে ঠিক বাবুঘাটের উপরেই, সেখানে গড়ের বাদ্যি বাজে। এই বাগানে টিকিট না থাকলে যে-সে ঢুকতে পারে না, দরজায় কনস্টেবল রয়েছে, খালি গা খালি পা দেখলেই বুল ওঠাবে। বুল ওঠালে লাটসাহেবের গাড়ি পর্যন্ত থেমে যায়—তুমি তো তুমি! এই বাগানের ফটকের ধারেই একটা ছেলে বেলুন ধরে পাঁচিলে চেপে বসে আছে ফটকের থাম জড়িয়ে। পাছে থাম

ছেড়ে দিলে বেলুন তাকেসুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যায়। আগে এখানে দেখেছি একটা বুড়ি থাকত, একদিন ভুলে যেমন সে থাম ছেড়েছে অমনি বেলুন তাকে উড়িয়ে নিয়েছে। সেসময় থাকলে মজা দেখা যেত।

এই বাগানের এদিকে কাছারি, সেদিকে কেরানিরা দিনরাত খেটে মরছে; আবার ওদিকের কোণেই নবাবি আমলের অন্ধকূপের একটা থাম। চৌমাথার কাছে রাজার বাড়ির সিংদরজা, সেখানে সান্ত্রি পাহারা, ঢোকবার জো নেই। ফটকের উপর যে সিংহী বসে আছে কামানের গোলা হাতে, দেখেছ তো? উত্তরে গোয়াবাগান, সেখানে ফৌজের ছাউনি, তারই পাশে গোরাবাজার জাহাজি-গোরার আড্ডা সেখানে। লালবাজার পেরিয়ে চিনেবাজার, সেখানে সারি সারি জুতোর দোকান আর আরশোলা-ভাজা।

শ্বেতদ্বীপ আর জম্বুদ্বীপ দেখতে চাচ্ছ? কিন্তু ওদিকে যার ডানা নেই সে-তো যেতে পারবে না! এ পর্যন্ত যত ছেলেমেয়ে জন্মেছে, তার মধ্যে কেবল আমি পুতুই সেখানে যেতে পেরেছি। কেন জানো? আমি বড়ো হয়ে উঠতে চাইনি বলে। দুধে-দাঁত উঠতে না উঠতে সব ছেলেরা ঠোঁটের উপর লুকিয়ে লুকিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে, গোঁফ উঠল কি না। কিন্তু আমি কেবল ঠোঁটে হাত বোলাতুম আর ভাবতুম—এই রে! বুঝি গোঁফ উঠে পড়ল। বড়ো হবার ভয় আমার এমনি ছিল যে দুটি দুধে-দাঁত যেমন ওঠা অমনি আমি দুধের বাটি ফেলে উড়ে পালাবার চেষ্টায় রইলুম। ডানার জায়গাদুটো এমনি চুলকোতে আরম্ভ করলে যে পিঠের দু-দিকে লাল হয়ে সেখানে পালকের বদলে 'মাসিপিসি' বেরিয়ে পড়ল। অমনি আমি জানালা দিয়ে ভোঁ দৌড়।

এমন ছেলেমেয়ে কে আছে যে ওড়বার চেষ্টা না করেছে? ওড়বার জন্যে তাদের পিঠ সুড়সুড় করে কিন্তু ভুলে গেছে কেমন করে উড়তে হয়। তা ছাড়া, কচি ছেলেদের পায়ে তাদের মা এমনি ভারী ভারী মল পরিয়ে দেন, সে নিয়ে ওড়া ভারী শক্ত। দেখতে দেখতে সব পালক শক্ত দুধে-দাঁত হয়ে যায়, তখন আর পালকও ওঠবার আশা থাকে না, মাসিপিসিও বার হয় না। তার ওপর ডাক্তার টিকে দিয়ে পালকের জড় মেরে দেয়, তখন দুধে-দাঁত পড়ে গজদাঁত গজায়। গজদাঁত দিয়ে খোঁড়া যায়, ওড়া তো হতে পারে না।

ডানার বদলে মাসিপিসি নিয়ে যদিও পাখির মতো আমি উড়তে না পারি, কাগজের মতো হাওয়ায়, গায়ের কাঁথাখানাসুদ্ধু উড়ে চললুম। তখনও আলো রয়েছে। বাড়ি ছেড়ে উড়ে পড়েই প্রথমটা ভারী ভয় হল, দেখলুম বাড়ির পর বাড়ি সব জানলাগুলো খুলে যেন হাঁ করে আমায় গিলতে চাচ্ছে। আমি সোঁ করে আকাশে উঠে পড়লুম, সেখানে একটা কলের চিমনির কালো ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। খানিক ধোঁয়ার সঙ্গে উড়তে উড়তে ছাতুবাবুর মাঠে চড়কগাছটা দেখে যেমন বসতে যাব, অমনি সেটা কেঁক করে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে সাতপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, একেবারে গোলদিঘির মাঝে জম্বুদ্বীপে। পড়েই খানিক আমি চিৎপাত হয়ে ঘাসের উপর গড়িয়ে নিলুম। আমার ঠিক মনে হচ্ছে যেন পাখি হয়ে গেছি, ভুলেই গেছি যে মানুষ ছিলুম। খিদে পেয়েছিল—টপ করে একটা ফড়িং ধরতে গিয়ে দেখি, হাত ফসকে সেটা পালিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল পাখিরা যে ঠোঁটে করে ফড়িং ধরে। গোলদিঘির জল দেখেই অমনি আমার, সব ছেলেদের যেমন তেমনি, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেল। আমি টিয়েপাখির ঠোঁটের মতো ছোট্ট নাকটা জলে ডুবিয়ে জল খেতে গেছি আর সোঁ করে নাকে-মুখে জল ঢুকে হেঁচে বাঁচিনে। আমার চান করতে ইচ্ছে হল, যেমন জলে নামা অমনি ঝুপ করে কাদায় পড়ে গেছি। তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে, মনে হল কী যেন করা উচিত, কিন্তু জল লাগলে পালকগুলো ঝেড়েঝুড়ে ঠোঁটে করে খুঁটে খুঁটে যে শুকিয়ে নিতে হবে, সেটা আমার মনেই এল না।

তখন রাত হচ্ছে। ওপারে জগন্নাথঘাটে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আর এদিকে রায়দের বৈঠকখানায় সারেঙ্গি আর তবলা বাঁধার শব্দ পাচ্ছি। আমি বিরক্ত হয়ে জামগাছের ডালে ঘুমোতে গেলুম। প্রথমটা ডালে বসে ঘুমোতে আমার ভয় করতে লাগল। বুঝি-বা পড়ে গেলুম। কিন্তু একটু পরেই অভ্যাস হয়ে গেল। গুটিসুটি হয়ে জামগাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়লুম। আমার গায়ে তখন তো পালক ছিল না, রয়েছে খালি পাতলা কাঁথাখানি; রাত্তির থাকতেই শীত করতে লাগল, জেগে উঠলুম। আমার মাথা যেন ভার বোধ হল আর নাকটা সুড়সুড় করতে লাগল। বুঝলুম কী যেন অসোয়াস্তি হচ্ছে; কিন্তু সর্দি ঝেড়ে দেবার জন্যে যে মাকে ডাকতে হবে সেটা তখন মনেই এল না। কাজেই আমি ভাবলুম কাউকে শুধাই কী করতে হবে, নাকটা নিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলুম।

দু-জন জোনাক-পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ভোর-রাত্তিরে ঘরে ফিরছিল, যেমন আমায় দেখা অমনি ফস করে আলো নিভিয়ে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। পাখিদের সঙ্গে পোকার ঝগড়া আছে বলে, রাতবিরেতে একটা কথা শুধোতে গেলে যে তারা এমন অভদ্রতা করবে তা কে জানে। এক ছুঁচো গায়ে বিদঘুটে রকম এসেন্স মেখে একটা থিয়েটারের প্রোগ্রাম থেকে কিচমিচ করে একটা গান গেয়ে চলেছিল, তার কাছে যেতেই সে একটা থলপদ্মের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। যাকে শুধোতে যাই সেই দেখি পালায়। পাখিদের ডোমপাড়ায় একদল ব্যাঙ হোগলাতলায় বসে রোদ ওঠবার আগেই যতগুলো পারে ছাতা বানিয়ে ফেলছিল, আমাকে দেখেই তারা চম্পট দিলে, ছাতাগুলো ফেলে। পাখিদের গোয়ালা যত গোসাপ, তারা রাত থাকতে দুধে জল মেশাচ্ছিল গোলদিঘির ধারে, তারা আমাকে পুলিশম্যান ভাবলে বোধ হয়, যেমন দেখা অমনি দুধের কেঁড়েগুলো উলটে দিয়ে একেবারে সাঁতরে ওপারে পালাল। এ ওদিকে পালায়, ও সেদিকে; ওখানে কেউ পিদিম নিভিয়ে অন্ধকারে লুকোয়, সেখানে কেউ বাসার দরজা ঝপ করে বন্ধ করে দেয়; আমাকে দেখে যেন চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল—বাগানে মানুষ এসেছে রে! মানুষ!

ওদিকে শুনলুম কেল্লার মধ্যে দামামা বাজছে। আমার ভয় হল এইবার তেলেঙ্গি-সেপাই সব আমাকে ধরতে আসছে। আমি যে মানুষ কোনখানটায়, তা তো আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে। দেখলুম তেলাপোকার মতো খয়েরি রঙের সব তেলেঙ্গি বন্দুক ঘাড়ে চৌরঙ্গি বেয়ে আসছে। কিন্তু যেমন দূর থেকে আমায় দেখা, 'ওই ওদিকে, ওই ওদিকে' বলে, 'রাইট লেপ্‌ট্‌, রাইট লে ' করতে করতে তারা লালদিঘির চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

নাক সুড়সুড় করলে কী করতে হয়, আমি আমার জাতভাই পাখিদের শুধোতে যাব মনে করলুম, কিন্তু তখনই মনে পড়ল, যখন আমি ঝুপ করে জম্বুদ্বীপে এসে পড়লুম তখন পাখিগুলো ভয়ে কিচমিচ করে বাসা ছেড়ে পালিয়েছিল। সবাই আমাকে দেখে সরে যাচ্ছে, তবে তো আমি এখনও মানুষ আছি। ভেবে আমার কান্না এল। আমি দুই হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারে যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চললুম।

দুঃখের কথা কাকে জানাই ভাবছি— এমন সময় গাছের উপর থেকে ভুষুণ্ডিকাগ আমায় দেখে বলে উঠল, 'কও ক্যা কও ক্যা...'

আমি সেই গাছের তলায় বসে কাগমশায়কে আমার নালিশ জানালুম, 'কেন সব পাখি আর পরি আমায় দেখে পালাবে? আমি কি মানুষ?'

কাগ খানিক এক চোখ বুজে ভেবে বললেন, 'পুতু, তুমি গায়ে ওটা কী পরে আছ? পাখিরা কি তোমার মতো গায়ে কাঁথা জড়ায়?'

আমি চেয়ে দেখলুম কোনো পাখিরই গায়ে কাঁথা নেই, খালি গা। কাক আবার বললেন, 'পুতু, তোমার পায়ে ওগুলো আঙুল, না আঁকড়ি?'

আমি দেখলুম পায়ে আমার দশটাই আঙুল, একটাও আঁকড়ি নেই।

কাগা বললেন, 'আচ্ছা দেখি পালক ঝাড়া দাও তো?'

আমার কেবলই গা ঝাড়াই সারা হল। তবে তো আমি এখনও মানুষ আছি। যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে কাককে বললুম, 'আমি মায়ের কাছে যাব।'

গম্ভীরভাবে কাক বললেন, 'এসো', কিন্তু আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে আবার বললেন, 'যাও।'

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, 'আমার মনটা কেমন কেমন করছে।'

কাক বললেন, 'মনটা কীরকমটা করছে শুনি!'

আমি যেমনি উত্তর দিয়েছি, 'মন ভারী খারাপ হয়েছে।' অমনি দাঁড়কাগ তাড়াতাড়ি, 'কই দেখি দেখি' বলে, আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'ইস ভারী গরম! দেখি হাতটা।'

আমার হাতের কড়ে আঙুলটা একবার ঠোঁটে করে তুলতে চেষ্টা করে কাক বললেন, 'মন ভারী কী বলছ? তোমার যে আঙুলসুদ্ধু ভয়ানক ভারী হয়ে গেছে।'

আমার ভয় হল। কেঁদে বললুম, 'কী হবে তবে?'

কাক বললেন, 'মন ভারী হয়ে গেলে কি কেউ উড়তে পারে? মন হালকা রাখা চাই বাতাসের মতো। পাখিদের মন কখনো ভারী হয় না। যে পাখিটার দেখবে ডানা দুটো ভারী হয়ে ঝুলে পড়ল সে পাখিটা মলো আর তার ওড়ারও শেষ হল জানবে।'

আমি দেখলুম যতই আমার ভয় বাড়ছে, ততই যেন হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। একবার উড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পা দুটো যেমন মাটি-ছাড়া অমনি আমার মাথাটা গিয়ে মাটিতে পড়ল দুম করে। কাক বললেন, 'মিছে চেষ্টা। আর তোমার ওড়া হচ্ছে না, পড়াই তোমার কপালে আছে দেখছি। ভারী লোক হয়েছ, পায়া ভারী হবে না এখন। না বসন্তের দখিন বাতাস, না শীতের উত্তর বাতাস, না সকালের আলোগোলা পুব হাওয়া, না কোনো বাতাসেই আর তোমাকে ওড়াতে পারছে। মহা ঝড় এলেও নয়। বড়ো গোল। তোমাকে গোলদিঘির জম্বুদ্বীপেই চিরকাল কালোজামের বাগানে থাকতে হবে। পালাবার জো নেই।'

আমার কান্না পেল। আমি শুধোলুম, 'শ্বেতদ্বীপে, যেখানে পাউডার মেখে পরিরা থাকে, আর ওই রাজাবাগান, ওই হাতিবাগান, আলিপুর, জাদুঘর, সিংহীবাগান, এসব দেখতে যেতে পাব না।'

উত্তর হল, 'না।'

'ছাতুবাবুর মাঠে চড়ক, গড়ের মাঠে গোরার বাদ্যি, রামবাগানের রামলীলে, সাতপুকুরের গোলকধাঁধা, এসব কিছুই দেখতে পাব না।'

'না, তুমি গোলদিঘি পেরিয়ে ওপারে যাবে কেমন করে? যখন উড়তেই পার না?'

আমি শুধালেম, 'আমি তবে করব কী?'

কাক বললেন, 'খাওদাও, বাঁশি বাজাও।' এই বলে তিনি একটা ছেঁড়া মোজা তাঁর বাসার কাছে ঝুলছিল,

সেটা থেকে একটা ছোট্ট বাঁশি আমাকে বার করে দিলেন; আমি বাঁশির দাম কোথা পাব বলতে কাক বললেন, 'দাম সময়মতো দিয়ো।'

বাঁশিটা চমৎকার বাজত। পাখিরা, পরিরা, এমনকী সাপ ব্যাঙ মাছ টিকটিকি ফড়িং প্রজাপতি সিংহী বাঘ, তারাও ভালোবাসত সেই বাঁশি শুনতে। কিন্তু তবু আমার রকমসকম দেখে তারা আমার খুব কাছে আসতে চাইত না, উলটে বরং ডিম ফুটে পাখির ছানাগুলো আমায় দেখে হাসাহাসি করত, যেন আমিই নতুন জানোয়ার, তারা কেউ নতুন নয়। আমি বসে বসে দেখতুম, ডিম ফুটে বেরিয়ে দিনকতক পরে পাখির ছানাগুলো উড়ে উড়ে ওপারে চলে যায়। শুনলুম তারা সব মানুষ হতে যাচ্ছে। পাখির মায়েরা ডিম ফোটাতেই জানে, মানুষ করতে হয় কেমন করে তা তারা ভালো জানে না। বাচ্ছাগুলো বড়ো হলেই তারা ঠেলে তাদের বাসা থেকে ফেলে দেয় আর উড়তে উড়তে তারা যেখানে পারে মানুষ হতে চলে যায়। যখন ডিম ফুটতে দেরি হচ্ছে, তা দিয়ে দিয়ে আর পারে না তখন আমি শুনেছি পাখির মায়েরা বলছে, 'ওরে দেখসে, পুতু কেমন করে চান করছে আর জল খাচ্ছে।' অমনি হাজার হাজার পাখির ছানা তাড়াতাড়ি ডিম থেকে বেরিয়ে দেখতে আসে আমি কী করছি। আমাকে পাখিরা এটা-ওটা গাছ থেকে ফেলে দিত, আর আমি হাতে করে সেগুলো খেতুম। তখন তারা ভারী মজা পেত।

আমি তো পাখিদের মতো পোকামাকড় ফড়িং খেতে চাইতুম না, তাই কাক সব পাখিদের বলে দিয়েছিলেন, তারা সবাই আমার জন্যে রুটি, মেঠাই, সন্দেশ, এটা-ওটা মানুষদের ঘর থেকে ঠোঁটে করে নিয়ে আসত। মানুষের ছেলেরা খাবারের ঠোঙায় ছোঁ দিলে পাখিদের দোষ দেয়, সেটা বড়ো ভুল। পাখিরা সেগুলো আমার জন্যে নিয়ে আসে। পাখিরা তো কথা কইতে জানে না যে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে, তাই তারা আমার খাবার ছোঁ দিয়ে নিয়ে আসে। খাবার এনে দিত বলে পাখিদের বাসায় পাতবার জন্যে আমি আমার কাঁথা থেকে এক-এক টুকরো তাদের ছিঁড়ে দিতুম কিন্তু কাকমশায় একদিন বললেন, 'না, কাঁথাটা ছিঁড়ে নষ্ট কোরো না, ওটা কাজে লাগতে পারে।' আমি সেইদিন আমার ছেঁড়া কাঁথাটা এক জায়গায় লুকিয়ে ফেললুম।

ক্রমে আমি পাখিবিদ্যেতে পাখিদের চেয়েও পণ্ডিত হয়ে পড়লুম। আমি গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি হাওয়া পশ্চিম থেকে এল না পুব থেকে। বাঁশ বেড়ে উঠছে আস্তে আস্তে, আমি তা চোখে দেখতে পেতুম, আর গাছের ডালের মধ্যে কোথায় ফল আছে, কোথায় ফুল, কোথায় পাতা, কোথায় গর্ত করে পোকারা তার মধ্যে চলাচলি করছে, তা পর্যন্ত আমি বলে দিতে পারতুম। আর কাকমশায় মনের সুখে থাকতে হয় কেমন করে তা আমায় শিখিয়েছিলেন, আমি পাখিদের মতো সুখে বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে, সুখে খেয়ে সুখে ঘুমিয়ে, দিনরাত কাটাতে লাগলুম।

আমি এক-এক দিন সন্ধেবেলা জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে বাঁশিতে বাজাতুম, 'বাতাসের ঝিরঝির, ঢেউয়ের ঝিপঝিপ, আলোর ঝিকমিক।' জলের ধারের মাছরাঙা পাখিরা বুঝতে পারত না যে সত্যি জলে মাছ খেলা করছে না আমি বাঁশিতে বাজাচ্ছি চাঁদামাছের খেলার গান। কখনো আমি বাঁশিতে ডিম-পাড়ানো গান আস্তে আস্তে বাজাই, পাখিরা অমনি বাসার মধ্যে ডিম খুঁজতে থাকে। অমনি আমি ঘুম-পাড়ানো গান ধরি, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। গোলদিঘির ওপারেই যে আমগাছটা, সেটায় শীতকালে আমের বোল ধরে কেন জানো? যখন খুব শীতকালে আমার আম খেতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় গরম পড়লে বাঁচি, সেইসময় আমি

এক-একদিন বাঁশিতে বাজাই বসন্তবাহার সুরে, 'আমের বউল আসল নোচা-নোচা, আমের বউল আসল বাড়ি বাড়ি', আমগাছটা ওপার থেকে শুনে মনে করে বুঝি সত্যিই বসন্তকাল এসেছে, আর অমনি সবার আগে তার বোল ফুল হয়ে ফোটে। কিন্তু থেকে থেকে এক-একদিন আমার মন ওপারে যেতে, মায়ের কাছে যেতে, সব ছেলেমেয়ে যেমন খেলে তেমনি করে খেলে বেড়াতে, কেমন কেমন করতে থাকে, সেদিন আমার বাঁশিতে কান্নার সুরে, কেবলই দুঃখু বাজে, 'পারে চলো পারে চলো, মায়ের কোলে, মায়ের কোলে খেলাঘরে।' পাখিরা সেদিন কত মায়ের কত ছেলেমেয়ের খবর আমাকে এনে দেয় আর আমি একলাটি বসে কাঁদি।

মানুষ তোমরা আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছ আর ভাবছ, সাঁতরে গোলদিঘির ওপারে গেলেই তো গোল চোকে। কিন্তু আমি তো ঠিক মানুষটি নয়, কাজেই মানুষের বয়সের সঙ্গে যেমন বুদ্ধি বেড়ে ঢেঁকি হয়ে ওঠে, আমার তো হল না। আমার যতটুকু বুদ্ধি তাতে বুঝলুম, সাঁতরাগাছির ইস্কুলে সাঁতার না শিখে সাঁতরাতে গেলেই ভুস করে ডুবে যাব। পাখিদের মধ্যে হাঁস সাঁতার দিতে মজবুত কিন্তু হাঁস সাঁতার শেখাতে একেবারেই জানে না, তারা বলে, 'সাঁতার আবার শক্তটা কী? জলের উপর বসে পা-দুটো দিয়ে কেবল পিছনের দিকে লাথি চালাও।' একদিন হাঁসেদের বুদ্ধি শুনে সাঁতরাতে গিয়ে ডুবেছিলুম আর কী! দূরে সব রাজহাঁস ভাসত, আমি তাদের একজনকে আমার সারাদিনের খোরাক যা কিছু সব একদিন দিলুম কিন্তু রুটি যখন ফুরিয়ে গেল তখন, কী করে ভাসতে হয় শুধোতেই, দেখলুম রাজহাঁসটা ফোঁস করে উঠে আমাকেই এক ঠোকর বসিয়ে, আস্তে আস্তে ভেসে, ওপারে কেউ আমার মতো বোকা আছে কি না দেখতে গেল।

একদিন একখানা রুইতনের মতো কাগজের একটা কী পাখি আকাশ থেকে লাট খেতে খেতে যেন ডানাভাঙা পায়রার মতো এসে পড়ল। পাখিরা চেঁচিয়ে উঠল 'ঘুড়ি-ঘুড়ি।' সেই প্রথম আমি ঘুড়ি দেখলুম। ঘুড়ি ওড়ানো পাখিদের কাছে জেনে নিয়ে আমি ঘুড়িটা দখল করলুম। আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখে একদিন পাখিরা ঘুড়ি ওড়াতে চাইলে, আমি তাদের লক ধরতে দিলুম। তারা ঠোঁটে সুতোগাছা ধরে উড়ে চলল আর ঘুড়ি তাদের সঙ্গে দেখতে দেখতে আকাশে উড়ল। সেই দেখে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি পাখিদের বললুম আমি ঘুড়ি ধরে ঝুলব আর তোরা সুতো ধরে ঘুড়িসুদ্ধ আমাকে ওড়া। একশো পাখি ঘুড়ির সঙ্গে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। আমি ভাবছি একবার ওপারে পৌঁছুলে হয়, ঝুপ করে ঘুড়ি ছেড়ে নেমে পড়ব। এই ভেবে আমি ঘুড়ির কাঠি চেপে ধরেছি, অমনি ঘুড়িটা ফস করে ফেঁসে গেছে। আমি একেবারে আকাশ থেকে জলে পড়লুম। পড়বি তো পড় দুই রাজহাঁসের ঠিক মধ্যিখানে, কাগজ লক কাটাকুটি নিয়ে। পড়েই আমি দুই রাজহাঁসের গলা এমনি চেপে ধরলুম যে তারা গজগজ করতে করতে আমাকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেইদিন থেকে পাখিরা বললে, 'আর আমরা ঘুড়ি ওড়াব না। তুমি ওপারে যেতে পার ভালো, না পার তো আমাদের কী?' কিন্তু তাই বলে ওপারে যাবার মতলব যে আমি ছাড়লুম তা ভেবো না।

কানকাটা রাজার দেশ

এক ছিল রাজা আর তাঁর ছিল এক মস্ত বড়ো দেশ। তার নাম হল কানকাটা রাজার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গোরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড়োমানুষ, সকলেরই কান কাটা। বড়োলোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীবজন্তু গরিব-দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকত। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কানকাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই কেউ লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাপ দাড়ি দিয়ে, কেউ-বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে কাটা কান ঢেকে রাখত, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে সেই ন্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দু-খানা কান সাজিয়ে সোনার রাজসিংহাসনে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক-কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কানকাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে বার হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তুজানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কানকাটা দেশের রাজা আর এক-কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীবজন্তুর শিকার-করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে থাকলেন। এমনি করে দু-জনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে, 'রাজা তুই বড়ো দুষ্টু, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ সকালে আমার কান কেটেছিস; তার শাস্তি ভোগ কর।' এই বলে রাজার দুই গালে দুটো চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন রাজা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনই মন্ত্রীর বাকি কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন; কিন্তু অমনি নিজের কানের কথা মনে পড়ল, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটি ধুলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে, তাজ-টুপির সোনার জরির ঝালর, কাটা কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কাটা কান দেখতে না পায়, তারপর মন্ত্রীর পেটে গুঁতো মেরে বললেন, 'ঘোড়া আনো।' এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাক-ডাকা হঠাৎ বন্ধ হল, আর-এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়নঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল, রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল

রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত, সেই নিয়মমতো সকালবেলা নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলে। এক গাল কামিয়ে যেই আর-এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'দুর্গা দুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত খুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে দেখলেন কান নেই। রাজা আপশোশে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে নাপিতের হাতে ধরে বললেন, 'নাপিতভায়া একথা প্রকাশ কোরো না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব।' নাপিত বললে—'কার মাথায় দুটো কান যে একথা প্রকাশ করবে!' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে আর আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইল। কাজেকর্মে, ঘুমিয়ে-জেগে, কী লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কী সকাল কী সন্ধ্যা মনে হতে লাগল — রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা; কিন্তু কাবুর কাছে একথা মুখ-ফুটে বলতে পারে না—মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজেই একটু বেশি কথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পেয়ে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কী!

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়েচেড়ে দেখছেন, আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস করে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালাল। রাজা বললেন, 'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো ধরো! কাক কান নিয়ে গেল!' তারপর রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাব।

এদিকে নাপিত খুর-ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে তো মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগল, 'নাপিতভায়া নাপিতভায়া হল কী? পাগলের মতো ছুটছ কেন?'

নাপিত না-রাম না-গঙ্গা কাকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশ্বত্থ গাছে বসে আবার উড়ে চলল, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারলে না, সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল, আর ভাবতে লাগল, 'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, তখন অনেক কষ্টে সেকথা চেপে রেখেছিলুম; এখন সেই কান কাকে নিলে একথাও যদি আবার চাপতে হয় তা হলে আমার দফা একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে এখন করি কী?' নাপিত এইকথা ভাবছে এমন সময় গাছ বললে, 'নাপিতভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বলল, 'রাজার কথা।'

গাছ বললে, 'সে কেমন?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপিচুপি বললে—

'রাজার কান কাটা
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মতো হয়ে গেল, বেচারা বড়োই আরাম পেলে, এক আরামের নিশ্বাস ফেলে মনের ফুর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চলল।

নাপিত চলে গেলে বিদেশি এক ঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড়মড় করছে—আর মাঝে মাঝে বলছে—

'রাজার কান কাটা
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

ঢুলি ভাবলে এ তো বড়ো মজার গাছ! এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।'

গাছ বললে,'ঢুলি, ঢুলি আমায় কাটিসনে!'

আর কাটিসনে! এক-দুই-তিন কোপে একটা ডাল কেটে নিয়ে, ঢোল তৈরি করে—'রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কানকাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কানকাটা শহরের রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন— 'নাপিতভায়া একথা যেন প্রকাশ না হয়!' নাপিত বলছে—'মহারাজ কার মাথায় দুটো কান যে একথা প্রকাশ করবে!' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠল—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপখোলা তলোয়ার ধরে বললেন, 'তবে রে পাজি! তুই নাকি একথা প্রকাশ করিসনি? শোন দেখি ঢোলে কী বাজছে!' নাপিত শুনলে ঢোলে বাজছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই মহারাজ, একথা আমি কাউকে বলিনি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর পেটটা ফেটে মরে যেতুম! আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন!'

রাজা বললেন, 'চল ব্যাটা গাছের কাছে!' বলে নাপিতকে নিয়ে রাজা মুড়িসুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন। নাপিত বললে, 'গাছ আমি তোমায় কী বলেছি? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা বললেন, 'আর কারও কাছে নাপিত বলেছে কি?'

গাছ বললে, 'না।'

রাজা বললেন, 'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে?'

গাছ বললে, 'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে, তাই ঢোল বাজছে—'রাজার কান কাটা'। আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন, 'গাছ, এ-দোষ তোমার; আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াব।'

গাছ বললে, 'মহারাজ, এমন কাজ কোরো না। সেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে, আমি তাকে শাস্তি দেব। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।'

রাজা বললেন, 'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায়? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে!'

গাছ বললে, 'সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দেব।' শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

রাজা ফিরে আসতেই রাজার রানি, রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে, 'রাজামশাই, তোমার কান দেখি!' রাজা দেখালেন—এক কান কাটা। তখন কেউ বললে, 'ছি ছি', কেউ বললে, 'হায় হায়', কেউ বললে, 'এমন রাজার প্রজা হব না।' তখন রাজা বললেন, 'বাছারা, কাল আমার কাটা কান জোড়া যাবে, তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দি করো। কাল সকালে তাকে নিয়ে বনে যে অশ্বত্থ গাছ আছে তারই তলায় যেয়ো।' রাজার কথা শুনে প্রজারা সেই ঢুলিকে বন্দি করবার জন্যে ছুটল।

তার পরদিন সকালে রাজা, মন্ত্রী, নাপিত, রাজ্যের যত প্রজা আর সেই ঢুলিকে নিয়ে ধুমধাম করে সেই অশ্বত্থতলায় হাজির হলেন। রাজা বললেন, 'অশ্বত্থঠাকুর, ঢুলির বিচার করো।'

অশ্বত্থঠাকুর নাপিতকে বললেন, 'নাপিত, ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিলে। চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, রাজার কান জোড়া লেগে গেল। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে, 'অশ্বত্থঠাকুর, বিচার করো—রাজামশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশ্বত্থ বললেন—'রাজা, ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। এক কান কাটা থাকলে বেচারির বড়ো অসুবিধা হত—দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু-কান কাটা হল—সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এক কোপে ঢুলির আর-এক কান কেটে হনুর কানে জুড়ে দিলেন—আবার ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। তখন অশ্বত্থঠাকুর বললেন, 'ঢুলি এইবার ঢোল বাজাও।' ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগল—ঢোল বাজছে—

'ঢুলির কান কাটা
'ঢুলির কান কাটা॥'

রাজা ফুল-চন্দনে অশত্থঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানি রাজার কান দেখে বললেন—'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন—'তা হোক, কাটা কানের থেকে কালো কান ভালো। নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।'

বাতাপি রাক্ষস

দণ্ডক অরণ্যের একদিকে অনেক মুনিঋষির আশ্রম ছিল। আর-এক দিকে অনেক ক্রোশজুড়ে অনেকখানি একটা বাতাপি নেবুর বন ছিল। সেই বনে দুটো অসুর ছিল—এক ভাইয়ের নাম ইল্বল আর-এক ভাইয়ের নাম বাতাপি। ইল্বল একখানি পাতার কুটিরে তপস্বী সেজে বসে থাকত।

বর্ষার শেষে সেই নেবুর বন সবুজ পাতায়, নেবুর ফুলে, বাতাপি নেবুতে ছেয়ে যেত। কত যে পাখি কত যে ভ্রমর কত যে মধুকর সেই বনে গান গাইত, ফুলে ফুলে উড়ে বসত, পাতার ফাঁকে চাক বাঁধত, তার আর ঠিকানা নাই। সেই সময় দক্ষিণদিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে দলে দলে ঋষিকুমার সেই বনে বাতাপি নেবু পাড়তে আসত। তারা সারাদিন সেই নেবু 'র তলায় কচি ঘাসে শুয়ে পাখিদের গান শুনত, নেবু-ফুলের মালা গাঁথত, কত খেলা খেলত, তারপর সন্ধ্যার সময় আঁচলভরে রাশিরাশি নেবু, সুগন্ধ নেবুফুল ঘরে নিয়ে যেত। যতদিন সেই বনে নেবু থাকত ততদিন তারা প্রতিদিন আসত, নেবু পেড়ে খেত, নেবুফুল তুলত। অসুর ইল্বল তপস্বী সেজে বসে বসে সব দেখত, কিছু বলত না। তারপর যখন সব নেবু পাড়া হয়ে গেছে, বনে আর একটি গাছেও নেবু নেই, গাছের পাখি উড়ে গেছে, ফুলের ভ্রমর চলে গেছে, শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা ঝরে গেছে, শিশিরে ঘাস ভিজে গেছে, সেই সময় ভণ্ড তপস্বী ইল্বলের কুটিরদুয়ারে মায়াবী সেই বাতাপি নেবুর গাছ সবুজ পাতায় থোলো থোলো ফুলে, বড়ো বড়ো নেবুতে ছেয়ে যেত। সেই গাছে কত পাখি গান গেয়ে উঠত, কত ভ্রমর গুনগুন করে তার চারিদিকে বেড়াত। সেই সময় সেই ভণ্ড তপস্বী ইল্বল গুটিগুটি গিয়ে আদর করে সেই ঋষিকুমারদের হাত ধরে সেই মায়া-বাতাপির তলায় যেত; পাকা পাকা বড়ো বড়ো নেবু পেড়ে তাদের খেতে দিত, তারা মনের আনন্দে তাই খেত। হায়, তারা তো জানত না এ ঋষি ভণ্ড ঋষি, এ ফল মায়াফল। যখন সন্ধ্যা হয়ে

আসত, বন আঁধার হত, বাপ-মায়ের কোলে ছোটো-ছোটো সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্য সেই ছোটো ছোটো ঋষিকুমারদের প্রাণ আকুল হত, তখন সেই রাক্ষস ইল্বল ডেকে বলত, 'আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়।' অমনি সেই ঋষিকুমারদের পেট চিরে বাতাপি নেবুর ভিতর থেকে মায়াবী রাক্ষস বাতাপি বাইরে আসত। তারপর সেই দুই অসুর মনের আনন্দে সেই ঋষিকুমারদের রক্ত পান করে, তাদের সেই বনে মাটিতে পুঁতে রাখত। এক-একটি ঋষিকুমার এক-একটি নেবুগাছ হয়ে থাকত।

যারা সেইসব গাছের নেবু খেত, তারা যেমন মানুষ তেমনই থাকত, আর যারা সেই ভণ্ড তপস্বীর কথায় ভুলে সেই মায়াগাছের মায়াফল খেত তাদেরই পেট চিরে রক্ত পান করে সেই দুই রাক্ষস নেবু বনে নেবু গাছ করে রাখত। এমনি করে সেই বনে কত যে নেবু গাছ হল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে তপোবনে আর একটিও ঋষিকুমার রইল না—সেই দুই রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেললে। ইল্বল, বাতাপি দেখলে বনে আর একটিও ঋষিকুমার নাই; তখন তারা সেই ঋষিদের খাবার পরামর্শ আঁটতে লাগল; সারারাত দুজনের পাতার কুটিরে মিটমিটে আলোয় ফুসফুস পরামর্শ চলল। শেষে ভোরবেলা ইল্বল যেমন তপস্বী ছিল তেমনই হল। আর বাতাপি ঘোরানো-শিং পাকানো-রোম মোটাসোটা একটা ভেড়া হল। সেই ভেড়াকে গাছে বেঁধে ভোরবেলা ইল্বল ঋষিদের আশ্রমে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ইল্বল ঋষিদের বললে, আজ আমার বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ—আপনারা সবাই আমার আশ্রমে পায়ের ধুলো দেবেন। সে ঋষিদের সঙ্গে ঠিক ঋষিদের মতো এমনি সব কথা কইলে যে ঋষিরা কিছুতে জানতে পারলেন না যে সে রাক্ষস। তাঁরা মনের আনন্দে তপোবনসুদ্ধ সব ঋষি সেই দুই অসুর ইল্বল-বাতাপির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ইল্বল আদর করে ঋষিদের আশ্রমে ডেকে নিলে—নেবুর বনে, সবুজ ঘাসে, কুশাসনে তাঁদের বসতে দিলে। তারপর বাতাপি-রাক্ষস গাছের তলায় ভেড়া হয়ে বাঁধা ছিল তাকে কেটে যত্ন করে রেঁধে সেই ঋষিদের খেতে দিলে। নেবু বনে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল, এদেরই তলায় বসে ঋষিরা বাতাপি অসুরের মাংস খেতে লাগলেন। তারা পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে ঋষিদের সেই মাংস খেতে কত বারণ করলে, কিন্তু ঋষিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না; আনন্দ মনে সেই মায়ামাংস খেতে লাগলেন। তারপর খাওয়া শেষ হলে ঋষিরা চলে যান, এমন সময় ইল্বল ডাকলে, 'আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়!' অমনি সেই রাক্ষস বাতাপি দয়ার সাগর সেই ঋষিদের পেট চিরে হাসতে হাসতে দেখা দিলে। তারপর দুই ভাইয়ে সেই হাজার হাজার ঋষির রক্তপান করে তাঁদের নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিলে। সে বনে আর একটি মানুষ রইল না।

সেই সুন্দর তপোবন কাঁটা বনে ভরে গেল। পোষা হরিণ বুনো হয়ে চলে গেল; ঋষিদের কুটিরে বনের জন্তুরা বাসা বাঁধলে। দুই অসুরে ঋষিদের তপোবন একেবারে শ্মশান করে দিলে। দিনেদুপুরে সে বনে আর মানুষ চলত না, যদি কেউ সে বনে যেত তবে সেই দুই রাক্ষস তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার রক্ত পান করে সেই নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিত। ক্রমে সেই নেবুর বন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নেবুর গাছে একেবারে মহা অরণ্য হয়ে উঠল। নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিগ্‌বিদিক ছেয়ে ফেললে, মানুষ চলবার পথ রইল না।

তখন সেই দুই রাক্ষস বন থেকে হাতি ঘোড়া বাঘ ভালুক ধরে ধরে খেতে আরম্ভ করলে। শেষে শীতকাল গিয়ে আবার বর্ষাকাল এল; নেবু বনের মাথা সবুজ পাতায় ভরে গেল। কচি ঘাসের উপর বড়ো

বড়ো নেবু ডালপালা নিয়ে লতিয়ে পড়ল; নেবুফুলের গন্ধ বন আমোদ করলে। গাছের পাখি, চাকের মধু, ফুলের ভ্রমর আবার দেখা দিলে। গাছে পাখি গেয়ে উঠল, ভ্রমর গুঞ্জন করে উঠল, মধুপ চাক বাঁধতে লাগল; কিন্তু একটিও মানুষ, একটিও ঋষিকুমার সে বনে দেখা দিলে না। পাকা নেবু ডাল থেকে খসে খসে পড়ে গেল। বাতাপি নেবুতে সবুজ ঘাস ছেয়ে গেল, তবু সে বনে একটি মানুষ এল না।

মানুষের আশায় নিরাশ হয়ে সেই দুই অসুর সেই নিঝুম নেবু বনে দিনরাত্রি মেঘের কড়মড়, বৃষ্টির ঝর-ঝর, ঝড়ের হুহু শব্দ শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে উঠল! পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল। যেদিকে চায় সেই দিকেই নেবু গাছ; গাছের পর গাছ, যত মানুষ মেরেছে, যত ছোটো ছোটো ছেলে খেয়েছে সবাই নেবু গাছ হয়ে নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিগ্‌বিদিক ছেয়ে ফেলেছে। এই ঘোর বনে পাতা, লতা, নেবুর কাঁটা ঠেলে মানুষ কি আসতে পারে? কার এত সাহস! সেই দুই অসুর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নেই, সে ঋষিরাও নেই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার—তারাও নেই। পাতার কুটির ভেঙে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাঁট ধরেছে। ধানের খেত, কুশের বন, ফুলের বাগান কাঁটাগাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন; ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রাক্ষসের কথা, সব জানতে পারলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, লাঠি হাতে গুটিগুটি ভর-সন্ধ্যাবেলা সেই বাতাপি নেবুর বনে দেখা দিলেন। বনের যত গাছ ডাল দুলিয়ে পাতা নেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে বললে! কাঁটা-ঘেরা মোটা ডালে তাঁর পথ আগলে ধরলে। ঋষি তাদের অভয় দিলেন। তখন সেই মানুষের বন শান্ত হল, পাতা নড়া, ডাল দোলা বন্ধ হল, কাঁটা-ঘেরা নেবুর ডাল পথ ছেড়ে দিলে—ঋষি চললেন। এতদিনে সেই বনে মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দুই রাক্ষসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাতাপি তখন এক ভেড়া হল, আর ইল্বল তাকে গাছে বেঁধে তপস্বী সেজে অগস্ত্যমুনির কাছে গেল। তাঁকে আদর করে ঘরে এনে কুশাসনে বসতে দিলে, হাত-পা ধুতে জল দিলে। তারপর যত্ন করে সেই মায়া-ভেড়ার মায়ামাংস কলার পাতায় গাছের তলায় সেই ঋষিকে খেতে দিলে, ঋষি খেতে লাগলেন।

রাক্ষস যত দেয় ঋষি তত খান; খাওয়া আর শেষ হয় না। শেষে যখন সব মাংস খাওয়া হল, তখন ঋষি উঠলেন। ইল্বল ডাকলে, 'আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়!' কিন্তু বাতাপি আর বাইরে এল না। ইল্বল কত ডাকাডাকি করলে তবু এল না। অগস্ত্য ঋষির পেটে আগুন জ্বলছিল, তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস ইল্বল ভাই বাতাপির শোকে পাগল হয়ে উঠল; ভয়ংকর নিজমূর্তি ধরে আকাশ-পাতাল হাঁ নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে অগস্ত্য ঋষিকে গিলতে চলল। অগস্ত্য কি সামান্য ঋষি! এক গণ্ডূষে সাগরের জল পান করেন, রাক্ষস কাছে আসতেই তাকে ভস্ম করে ফেললেন। রাক্ষসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কতক ছাই হাওয়ায় উড়ে গেল, কতক ছাই জলে ধুয়ে গেল, এক মুঠো রইল। সেই ছাই মুঠা নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য সব নেবু গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলেন। যেসব ঋষিরা যে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল তারা আবার যেমন মানুষ ছিল তেমনই মানুষ হল। আবার সেই কাঁটাভরা তপোবন, পাতার কুটির, মাটির ঘরে ছেয়ে গেল; ধানের খেত সোনার ধানে ভরে গেল, ফুলের বাগানে ফুল ফুটে উঠল। ঋষিকুমারেরা মনের আনন্দে সেই নেবুর বনে নেবু পেড়ে নেবুফুলের মালা গেঁথে মনের আনন্দে খেলে বেড়াতে লাগল; আর রাক্ষসের ভয় রইল না।

আলোয় কালোয়

পুবের পাখি, তারা বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপে চন্দন বনে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পুব আকাশে সোনার আলোয়। ধানখেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হল তাদের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কষ লেগে হল রাঙা তাদের ঠোঁট।

তার একটি পাখি একদিন ধরা পড়ল। সওদাগর তাকে জাহাজে করে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম-সাগর পার হয়ে আজব শহরে। সেখানে সবুজ নেই—কেবল বাড়ি, কেবল বাড়ি! ইট, কাঠ, চুন, সুরকি, কলকারখানা, ধুঁয়া-ধুলো আর কুয়াশায় দিগ্‌বিদিক আকাশ-বাতাস পর্যন্ত ঢাকা, দিন-রাত্রি সমান অন্ধকার। আলোগুলো যেন সেখানে জ্বলছে না। কুয়াশায় ভিজে কম্বলমুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে বসে সে জ্বরে কাঁপছে। সূর্যের রথ শহরের পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় শহর ছেড়ে। মলয়বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে কিন্তু ঘর খোলা পায় না কোনোদিন।

সবুজ পাখি সেখানে খাঁচায় রইল—কালো লোহার শক্ত খাঁচা—কলের কুলুপে চাবি-দেওয়া খাঁচা। খায় দায় পাখি, থেকে থেকে কুলুপ নাড়া দেয়; কুলুপ নড়েচড়ে কিন্তু খোলে না। কলঘরের এক কোণে পাখির খাঁচা—কলের ধুঁয়া থেকে ভুষো ছিটিয়ে যায় তার গায়ে, সবুজ পাখনা কালো হয় দিনেদিনে! পাখি সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুনতে শুনতে শেখে সব খটোমটো বুলি, যেন লোহার কলের খটখটাং। তাই শুনতে লোক জড়ো হয়। সেই কলের ছাইভস্ম-মাখা পাখনা দেখে অবাক হয়ে যায়—একী আশ্চর্য পাখি! নাচতে পারে, গাইতে পারে, বলতে পারে, কইতে পারে, পড়তেও পারে! পাখি সে থেকে থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে উড়তে পারিনে, উড়তে পারিনে রে—বেঁচে আমি মরে আছি!' থেকে থেকে রাগ করে গা ঝাড়া দেয়—লোকে তার মনের কথা বোঝে না, তামাশা দেখে হাসে, হাততালি দেয়। আজব শহরের মানুষ তারা কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের পাখির কী দুঃখ। তার দুঃখুটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোনোদিন কুয়াশা সরিয়ে কারখানাঘরের কোণটিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখির গায়ে হাত বোলায়। ভয়ে ভয়ে আসে আলো, ভয়ে ভয়ে সরে যায়। পাখি বলে, 'যদি কোনোদিন সিন্ধুপারে যাও হে আলো, তবে ভুলো না, মলয় দ্বীপের সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিয়ো; বোলো আমি বেঁচে মরে আছি!'

আলো বলে, 'যেদিন আমি বড়ো হয়ে উঠব সেদিন নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আসব।'

শীত কাটল, পরিষ্কার হল দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ বেড়েই চলল। আর সে ভয়ে ভয়ে আসে না; অন্ধকারের ঘরে আসে রানির মতো চারিদিক আলো করে, কারখানার কলকবজা ঝকঝক করতে থাকে আলো পেয়ে। পাখি আলো-মাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে 'আর কেন, এইবার।' আলো বলে — 'থাকো থাকো, আজ রাতের শেষে খবর পাবে!'

খাঁচার পাখি ছটফট করে—সকাল কখন হয় তারই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায়-ধরা ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে গেল — সেইসময় কলখানার বাঁশি ডাক দিলে কুলিদের।

পাখির কাছে আলো এসে বললে চুপিচুপি, 'মলয় দ্বীপে গিয়েছিলেম, তাদের তোমার দুঃখের খবর দিলেম!'

পাখি ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোল, 'তারা কী বলে পাঠালে শুনি?'

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বললে, 'সবাই আহা করলে, কেবল একটি পাখি সে যেমন ছিল তেমনই রইল।'

পাখি ঘাড় তুলে বলল, 'তারপর?'

আলো তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'তারপর সে ঝরাপাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়ল ধুলোতে, আর সবাই বললে, 'আহা মরে বাঁচল রে!'

খাঁচার পাখি আর কোনো সাড়া দিলে না।

কলঘরের কল চলল বেজে — খটখটাং!

যার পাখি সে খাঁচার কাছে এসে দেখলে—পাখি মরে গেছে, আলো তার উপর পড়ে কাঁদছে।

বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প
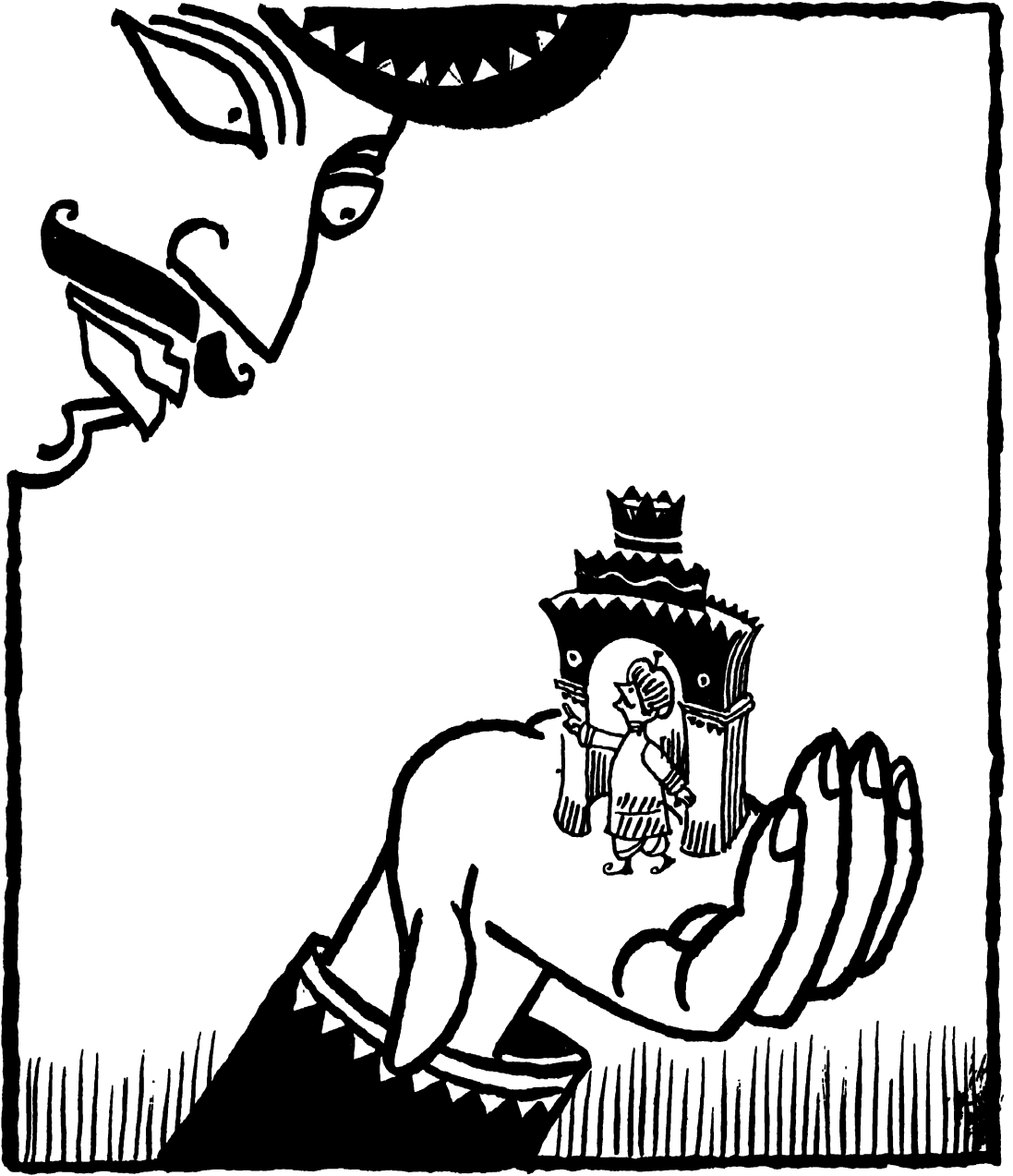
দুই রাজা থাকেন— বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা। দু-জনে একদিন দিগ্‌বিজয় করতে চললেন। বড়ো রাজা চললেন বড়ো বড়ো হাতি ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে, মস্ত মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে, বড়ো বড়ো সেনাপতির সঙ্গে, বড়ো-বড়ো রাজত্ব জয় করতে করতে। এদিকে ছোটো রাজা, তিনি চললেন ছোটোলোকের সাজে,

ছোটো ছোটো খেলবার কামান বন্দুক হাতি ঘোড়া নিয়ে ছোটো একটি পুঁটলি বেঁধে, ছোটো রাজত্ব জয় করতে—বড়ো রাজার পিছনে পিছনে।

মস্ত বড়ো এই পৃথিবী—বড়ো রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন—এমন সময় চর এসে খবর দিলে, 'মহারাজ, শুনে এলুম, ছোটো রাজা ছোটো রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছে।'

বড়ো রাজা বললেন, 'তাকে বলো, আমি পৃথিবীটা জয় করে নিয়েছি, সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।'

দূত গেল ছোটো রাজার কাছে। কিন্তু ছোটো রাজার সে রাজ্য এত ছোটো যে দূত দেখতেই পেল না কোথায়-বা রাজা, কোথায়-বা রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড়ো রাজাকে খবর দিলে—চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব; সেখানে প্রবেশ করা ভারী কঠিন!

বড়ো রাজা বড়োই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চলো আমি নিজে যাব।'

বড়ো রাজা মস্ত মস্ত হাতি-ঘোড়া রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোটো শহর এত ছোটো যে সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না, মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিলে—সবাই চোখে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো!

সেনাপতি বললেন, 'এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।'

রাজা বললেন, 'দেখাই যাক না।'

যুদ্ধ বাধল—সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোটো রাজার ফৌজ গলে পালাল। তির-কামান আন্দাজ করতে না পেয়ে বাতাসে হানা দিতে থাকল, নয়তো আকাশে ঝুপঝাপ বড়ো রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড়ো বড়ো অস্তর—সেসব বড়ো জিনিসকেই লক্ষ করে, ছোটোকে দেখতে পায় না। বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো মন্ত্রী, বড়ো বড়ো সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে ছোটো রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোটো রাজা হেসে বললেন, 'দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকো। ছোটোতে-বড়োতে সন্ধি হলে কী হয় তা জানো না কি?'

বড়ো রাজা বললেন, 'তা কি আর জানিনে?'

মন্ত্রীরা বললেন, 'তা আর জানেন না?'

সেনাপতি বললেন, 'এত বড়ো পৃথিবীটা জয় করে এলে বড়ো রাজা, ওইটুকু আর জানেন না?'

ছোটো রাজা বললেন, 'তাহলে এবারকার মতো এইটুকু জেনেই ঘরে যান সকলে। আরও কি জানতে চান?'

বড়ো রাজা বড়ো রেগে বললেন, ছোটোকে টুঁটি চেপে ধরলে সে কী করে তাই জানতে চাই। 'বলেই বড়ো রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় ছোটো রাজা, মায় তাঁর রাজত্বটা পর্যন্ত কষে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায়, তেমনি বড়ো রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক বেয়ে ছোটো রাজা, মায় তাঁর রাজসিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড়ো রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি; বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড়ো রাজার আঙুলটা ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

কোণের ঘর

তারপর চলতে চলতে সে পাখি?

পাখি আবার চলে নাকি? কী বিশ্রী গল্প তোমার

চলে না তো পাখি করে কী শুনি

পাখি ওড়ে, পাখি বলে—

পাখি—ওড়ে আর বলে সে

যাব আজ দূরদেশে—

ভারী তো তোমার গান, সুর নেই—খালি কথা—বিশ্রী!

তোমারই-বা গল্পের ছিরিটা কেমন—মাথা নেই কথা!

রাজকন্যের কথা শুনে রাজপুত্র ভারী রাগ করে উঠে চলে যান ঘরে ছেড়ে। রাজকন্যা সে গোঁসাঘরে গিয়ে খিল দিয়ে পড়ে থাকেন—তিন দিন, তিন রাত উপোস করেন, কিন্তু রাজপুত্র ফেরে না! শেষে সখী এসে গোঁসা ভাঙায় কন্যের—খায়-দায় কন্যে আর থেকে থেকে কাঁদে, রাজপুত্রের কথা মনে করে। ওধারে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে উধাও—

কে জানে কোনখানে

মন তার কে টানে!

দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, বছর গেল ঘুরে, তারপর আরও কত দিন গেল, লাখ কথার পরে লক্ষ হিরের দেশ থেকে ফকির রাজপুত্র ফিরে এলেন! এসেই রাজকন্যাকে বিয়ে—লাখ টাকা আর অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক নিয়ে!

ছেলে হল, নাতি হল, পুতি হল, সেইসঙ্গে সেই সেদিনের রাজপুত্র-রাজকন্যা বুড়ো হয়ে সংসার করতে করতে হয়ে পড়ল—এক মস্ত দাড়িওয়ালা মহারাজা সে, আর পাকা চুলে সিঁদুর-পরা মহারানি তিনি!

মহারাজা সোনার পালঙ্কে আড় হয়ে, তাকিয়া হেলান দিয়ে, নবরত্ন মালা জপ করছেন, মহারানি পুরু গদিমোড়া সুখাসনে বসে এক-দুই-তিন মেজরানি সেজরানি ছোটোরানির সঙ্গে পান্না আর মোতি চুনি আর নীলার ঘুঁটি নিয়ে দশ-পঁচিশ খেলতে আছেন, এমন সময় মহারাজার ছোটো নাতি—যেন জরির সাজ-পরা ছোটোখাটো হাতি—রাজামহাশয়ের গলা জড়িয়ে বললে, 'গল্প বলো না, আজা ভাই!'

মহারাজা দাড়ি মুচড়ে গোঁফে তা দিয়ে শুরু করলেন, সে কী আজকের কথা, তখন চাঁদটা ছিল ভারী সাদা আর সুয্যিটা ছিল ভারী লাল!

ছোটো নাতনি একটা এইসময়ে কোথা থেকে এসে গল্প শুনতে বসে গেল—ভারী সুন্দরী—সে রাজার গলা জড়িয়ে বললে, 'চাঁদ ছিল, সুয্যিও ছিল!'

ছিল বইকী! চাঁদটি ছিল ঠিক কেমনধারা, জানো!

'না' বলেই নাতনি চুপ করলে।

রাজার নাতি সে দেখতেও মোটা, বুদ্ধিতেও মোটা; বলে উঠল, আমি দেখেছি—কেমন ছিল সে চাঁদ, ঠিক আজা ভাইয়ের দাড়ির মতো সাদা—!'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হল না, রঙে মিলল, রূপকে মিলল না একেবারেই; যাও, আমি গল্প বলব না!' নাতনি রাজার গলা জড়িয়ে বললে, 'আমি বলব। চাঁদ ছিল ঠিক যেন রানিদিদির হাসি হাসি মুখটি!' রাজা বললেন, 'হল না, হল না!'—

রানি সতরঞ্চের একটা ঘুঁটি কেটে বললেন, 'কেন ঠিক হবে না, ও তো ঠিক উপমা দিয়েছে!'

রাজা বললেন, 'আগে বুঝি তুমি দেখতে ছিলে চাঁদের মতো! তোমার চোখ দুটো ছিল ঠিক ওই আমার পোষা হরিণটার চোখের মতো একেবারে কাজলমাখা, আর দাঁতগুলো ছিল ঠিক দাড়িমের বিচ, আর ঠোঁট-দুটো ছিল একেবারে তেলাকুঁচ ফল আর চুল ছিল কাকের পালকের মতো কালো মিস্ আর—'

'যাও যাও,' বলে মহারানি মাথায় ঘোমটা টেনে বললেন, 'আচ্ছা, না হয় তোমারই মতো দেখতে ছিল চাঁদটা, মিছে বোকো না, খেলতে দাও!'

ধমক খেয়ে রাজা চুপ, রাজার কোলে নাতনি পিঠে নাতি কাঠের পুতুলের মতো স্থির, কিন্তু চোখ তাদের বলছে, 'গল্প বলো, গল্প বলো, আজা ভাই!'

রাজা বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না, শুরু করলেন, 'তখন চাঁদ ছিল মস্ত, সুয্যি ছিল তার চেয়েও মস্ত, তালগাছ ছিল তার চেয়েও মস্ত আর রাজা-রানি দু-জন ছিল কিন্তু ভারী ছোট্টো, যেন পুতুল-খেলার রাজা ও রানি। একটা মস্ত আটচালা ঘরের এক কোণে ছিল তাদের একটা গোঁসাঘর, আর-এক কোণে ছিল খাজনাঘর; আর দুটো কোণ, তার একটায় ছিল খাঁচায় ধরা পাখি, অন্য কোণে ছিল একটি বীণা—সোনার তার-বাঁধা বীণা; সে যেন সোনার তারে-ঘেরা পাখি। রাজার ভাব পাখির সঙ্গে আর রানির ভাব বীণার সঙ্গে!

'রাজার পাখি রাজায় বলে—একদিন আমি চলব! বলি, কোথায় চলবে? পাখি বলে—সে অনেক দূরে—ওই সে ওকোণে, যেখানে আর-এক পাখি ডাকাডাকি করে আমায় থেকে থেকে!

'বলি ওই অতদূর! পাখি, তুমি চলতে পারবে কি? শক্ত ·'টি বেদনা বাজবে পায়ে পায়ে চলার বেলায়। পাখি তবু বলে চলব! বলি, কত আর ঠেকাই পাখিকে!

'একদিন নিরালা ঘরে যে কোণে যা-সব আছে, কেবল রাজা-রানি দুটিতেই নেই সেখানে! কেন নেই, তা এখন আর মনে পড়ে না। হয়তো বীণা বাজাত যে রাজার মেয়েটা, সে গোঁসাঘরে খিল দিয়ে ছিল, হয়তো পাখি পুষেছিল যে রাজার ছেলে, সে আপনার খাজনাঘরে বসে বসে কেবলই গুনতে ছিল মোহর আর টাকা, টাকা আর মোহর। সেইসময় পাখি খাঁচা খুলে চলতে শুরু করলে—পায়ে পায়ে পায়ে, এ কোণ থেকে ও কোণ!

'খাঁচায় ধরা নাচন-পাখি, সে উড়তে জা'ন না, এ কোণ ছেড়ে ও কোণে চলে যায় নেচে নেচে—তার সে গোপন পাখির নাগাল চেয়ে নাচন-পাখি বাঁধা-বীণার তারে তারে পাখা বুলিয়ে সাধে, এসো না, এসো না!

'গোপন পাখি, সে কি আর লুকিয়ে থাকে, বুক তার নাচন-পাখির ডাক শুনে সুরে কাঁপে রি-রি, তারই ঝিনিক লাগে বীণার তারে আর সেই নাচন-পাখির নাচনে।
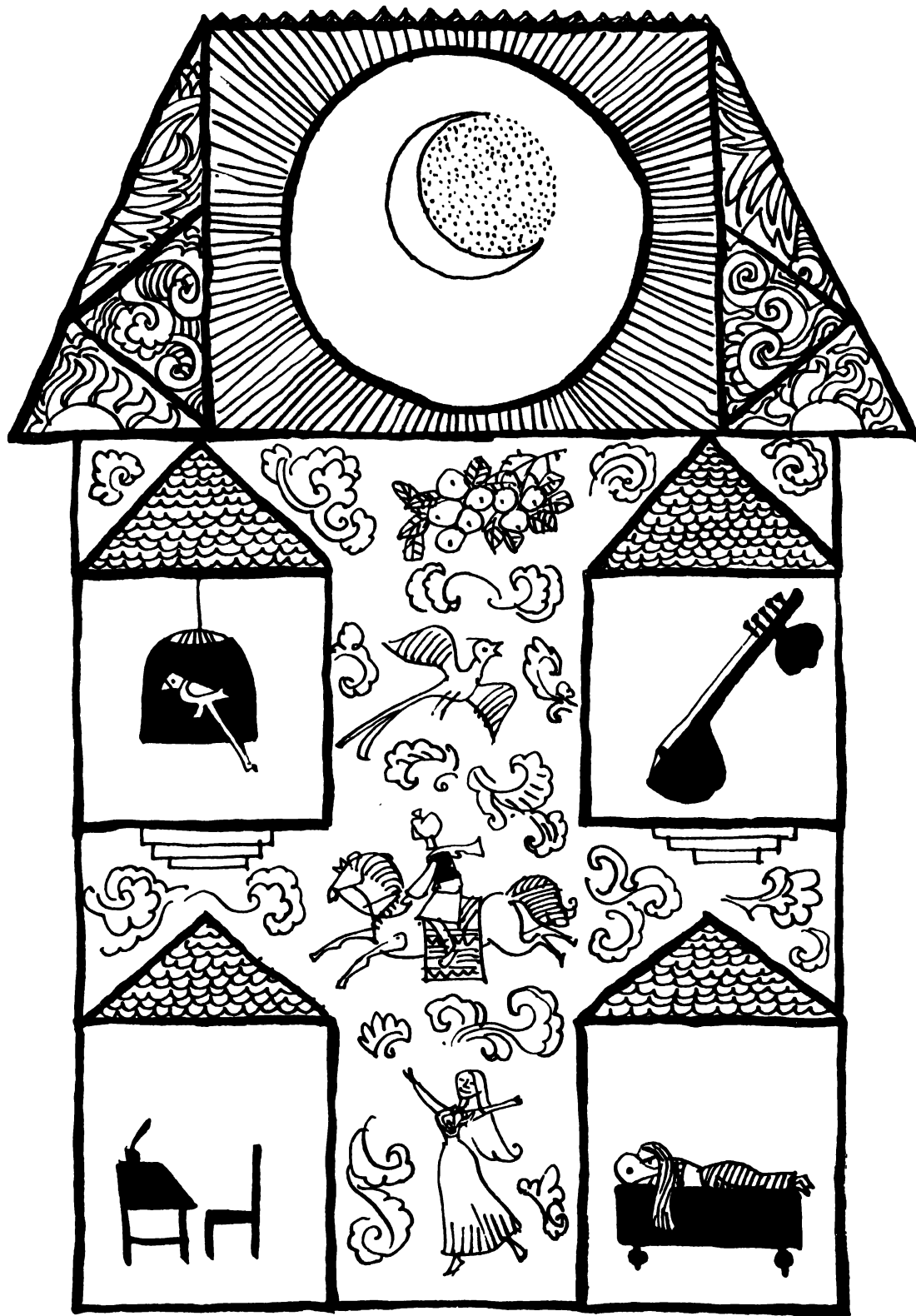
'ঠিক সেইসময় সেই কোণে খুট করে গোঁসাঘরে খিল খোলে, আর এই কোণে খিট করে খাজনাঘরের চাবি ফেরে — রাজা বার হন একদিক থেকে রানি বার হন আর-এক দিক দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হব-হব। সেই সময় আনিকে আমাদের আজা এক-আনা পয়সায় চিরকালের মতো কিনে ফেললেন, আর আজাকে তোমাদের আনি —' আর বলতে হল না, সতরঞ্চ খেলা ফেলে মহারানি ধা করে বললেন, 'এক কানাকড়িতে, এটা কি একটা গল্প না কথা, মাথা আর মুন্ডু হচ্ছে।'

রানির ঝগড়ার রকম দেখে নাতি-নাতনিরা হেসে বাঁচে না, ঠিক সেইসময় রাজার বিদূষক এসে উপস্থিত—গোলগাল নধর যেন গণেশঠাকুরটি। গল্প গেল তল, বিদূষকের চেহারা দেখেই হাসির রোল উঠল। হেলতে-দুলতে বিদূষক মোটাসোটা রাজার নাতিটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এ কেমন হল জানেন মহারাজ, এ যেন — মৌক্তিকং ন গজে গজে।'

রাজা তামাশাটা ঠিক না বুঝে বলে উঠলেন, 'তোমার রহস্য রাখো, গল্পের রসভঙ্গ কোরো না বলছি।'

মহারানি বলে উঠলেন, 'এমনি ভাঙে যা, তেমন শক্তরকম রসকথা নাই বলতে, এতক্ষণ ধরে কেবল বাঁজে বকাই হল তোমার!'

রাজা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন, 'বারেবারে বাধা দিলে গল্প কখনো চলে?'

রানি শ্লেষ করে বললেন, 'তোমার গল্প যতটা চলবার চলেছে, এ কোণ আর ও কোণ, তার বেশি আর চলবে না, গল্পের পা আছে নাকি যে চলবে?'

'আচ্ছা, পা নেই তো চলুক উড়ে এবারে গল্প,' বলেই রাজা শুরু করলেন, 'ওই যে পাখি পড়েছিল না-দেখা পাখির ভালোবাসায়, ওই যে নাচন-পাখি চলেছিল এ কোণ থেকে ও কোণ, ওই যে বলেছিল বীণার তারে ডানার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে — এসো না, এসো না, সেই পাখি আর সেই বীণা — তাদের কথা আর মনে পড়ল না, রাজা খুশি হলেন এক-আনি রানি পেয়ে, আর আনি তিনি নাতি পেলেন, স্বর্গে দেবার কত বাতি জ্বলল, ঘরে ঘরে অন্দরে-সদরে, তবে আনি খুশি হলেন কি না, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝাই গেল না! তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে পড়লেন মহারানি হওয়া মাত্রেই। রাজা ভাবেন — এ কি সেই সেদিনের যাকে আনি বললে মানেই বুঝত না, বলত, কী আনবে? — সোনার ময়ূর না পান্নার গাছে যে মুক্তোর ফল খায় পাখি, তাই? এ কি সেই না আর কেউ?

'আর রানি ভাবেন — এ কি আমার সেই রাজা, সাত-সমুদ্রপারে যেতে যে ডরাত না, এ কি সেই না আর কেউ গির্দা ঠেসান দিয়ে পড়েই আছে, নড়েও না, চড়েও না?

'এ খোঁজে সেই সেদিনের রাজা ও খোঁজে সেই সেদিনের রানি — পায় না! মস্ত বড়ো নতুন রাজবাড়ি। একখানি পাত্তর তার পুরনো নয় — সব নতুন। ঝাড়লণ্ঠন গালচে-দুলচে নতুন নতুন বদল হচ্ছে দিনে দিনে; পুরনোর একটি কুটোও পাওয়া যায় না সেখানে। তারই মধ্যে রাজা-রানির চুল পাকল খুঁজে খুঁজে সেই পুরনো দিনের রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে! রাজপুরী ভরে উঠল নতুন নতুন লোকজন আত্মীয়স্বজনে; পুরনোর স্থান হল না সেখানে একটুও।

'হঠাৎ একদিন রাজার কী হল, আধা-রাতে তিনি স্বপ্নের ঘোরে বললেন, আচ্ছা, সে ঘরটা? রানি ভয় পেয়ে বললেন, কোন ঘর কী বলছ তুমি? রাজা উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। রানির সারারাত আর ঘুম এল না, কেবলই মনে হতে লাগল — সে ঘরটা!

'সেই যে পুরনো আটচালা—যার এক কোণে গোঁসাঘর, অন্য কোণে খাজনাঘর, সে কোণে পোষা পাখি, ও কোণে বাঁধাবীণা, সে ঘর খুঁজতে রাজা বার হলেন যুদ্ধের ঘোড়ায়। রানি চললেন চতুর্দোলে। দেশে-বিদেশে খুঁজে হয়রান— কোথাও নেই সে পুরনো ঘর। হতাশ হয়ে নতুন রাজবাড়িতে বসেন বুড়ো রাজা-রানি! রাজা বলেন—হায় আমার সে সোনার খাঁচা! রানি বলেন, আহা, আমার সে বাঁধা-বীণা!'' রাজপণ্ডিত —তিনি থেকে থেকে উপদেশ দেন দু-জনকে 'গতস্য শোচনা নাস্তি।'

'রাজা-রানি পণ্ডিতের কথায় কানই দেন না; খোঁজাখুঁজি চলে সব কাজ ছেড়ে, রাজমিস্ত্রিরা মাটি খুঁড়ে পুরনো ঘরটা খোঁজে, নতুন ভিত ভেঙে দেখে— পুরনো ঘরটার নাগাল পায় কি না। রাজমন্ত্রীর বেশি বুদ্ধি, তাই তিনি চুপিচুপি রাজমজুর খাটিয়ে একটা নতুন ঘর তুলে তাকে আবার ধুলো-কাদা দিয়ে ঠিক পুরনো করে, চারকোণা ঘরটাকে ভাঙা বীণা, ভাঙা খাঁচা, মরচে-ধরা তালা, উইপোকায় খাওয়া সিন্দুক দিয়ে বেশ করে সাজিয়ে রাজা-রানিকে ভুলিয়ে দেবেন ভেবে মহাসমারোহে একদিন দু-জনকে সেখানে নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু পুরনো-করা নতুনে কাজ হবে কেন? মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ল।

'পণ্ডিত হারল, মন্ত্রী হারল, ডাক পড়ল তখন চিত্রকরের। পাকা পোটো সে, কামরূপের মন্তর-জানা পোটো, মনের মতোকে ধরার রঙিন ঝুলি কাঁধে সে ফেরে দেশে দেশে। রাজা-রানির দুঃখ দেখে সে বললে, ''মহারাজ, মহারানি, আমার সঙ্গে চোখে কাপড় বেঁধে চলে আসুন, দেখাব সেই ঘর। চোখ বেঁধে রাজা-রানি চলেন দিনের পর দিন— কিছুই দেখেন না। শুধু দিনই যায় এইটুকু জানেন তাঁরা। থেকে থেকে রাজা শুধোন, ওহে চিত্রকর, আর কতদিন? পোটো বলে, দর্শন হল বলে। এই হতে হতে হঠাৎ একদিন রাজা-রানির চোখের পরদা খুলে যায়। দু-জনেই দেখেন, সেই কতদিনের ঘরখানিতে অন্ধকারের মধ্যে চিত্রকর সে কোথায় সরে গেছে দু-জনকে একলা রেখে। রাজা রানির হাত ধরে বলেন, আনি; রানি রাজার গলা ধরে বলেন— এই যে আমি। অন্ধকারে সেই সে পাখি ডাকে—এসো না, এসো না। বীণার তার সে আর-এক গোপন পাখির ডাকে রি-রি করে, মনে হয় যেন—সে যে কী মনে হয়, কেউ বলতে পারে না।'

সাথি

তেপান্তর মাঠ—চারদিকে ধুধু করছে, তার মাঝে একটি তাল গাছ, সে একলা বাড়ল। দূরে দূরে মাঠ-ঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়—ঘন নীল ছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড়ো আকাশ—সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ঝিলমিল করছে দেখা যায়—কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথি ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথি আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিদ্যুল্লতা অপরূপ সুন্দরী!—সাথি ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ—তাদের সাথি হয়ে চলে বলাকা—পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে দলে সাথি আর সেথো তারা!

তালগাছ কেবলই তাদের ডাকে — পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে-যার দৌড়ে পালায় খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিশ্বাস ফেলে — বৃথা আঁকুপাকু করে — তাদের সঙ্গে চলতে চায় — পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুইপাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। পাতার উপর বসে তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কী বকাবকি করে। তারপর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তালগাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিলমিল করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে মনে বলে — মিলল, সাথি মিলল!

তারপর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোটো ছোটো পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তালগাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কী যেন ভাবে থেকে থেকে।

ভোম্বলদাসের কৈলাস-যাত্রা

সিংহির মামা ভোম্বলদাস নেহাত সেকালের জানোয়ার; রাজকার্য চালাবার মতো বুদ্ধিও তাঁর ছিল না, গায়ের জোর যে খুব ছিল, তাও নয়; খোশমেজাজে সেজেগুজে সিংহাসনে বসে আয়েস আর আমোদ-আহ্লাদ করতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাজকর্ম করবার নাম শুনলে তাঁর জ্বর আসত — লড়াই করা তো দূরের

কথা। কিন্তু দেশ-বিদেশের সবাই তাঁকে খুব মস্ত রাজাই বলে জানত। সবাই বলত — 'সিংহির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছে গন্ডা দশ!'

যে ভোম্বলদাস ঘরের কোণে আরশোলা উড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়, সে কেমন করে দশ গন্ডা বাঘ মারলে? ভোম্বলদাসের একটি মস্ত গুণ ছিল; সেটি হচ্ছে মন্ত্রী বেছে নেবার। দেখে দেখে তিনি শেয়াল-পণ্ডিতকে আপনার প্রধানমন্ত্রী করে নিয়েছিলেন; আর তাঁরই পরামর্শে দশ গন্ডার চেয়েও ঢের বেশি বাঘ মেরে তিনি পশুদের মধ্যে একচ্ছত্র রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু কপাল! বনের যত জোরোয়ার জানোয়ার দেশের চারিদিকে সুখশান্তি দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা কোথাও একটা লড়াই বাধিয়ে খানিক হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি মাথা-ফাটাফাটি করতে ভোম্বলদাসকে ধরে পড়ল। ভোম্বলদাস শেয়ালের সঙ্গে যুক্তি করে বললেন, 'আমার শত্রু যারা ছিল সব তো যমের বাড়ি পাঠিয়েছি; লড়াই হবে কার সঙ্গে?'

দুষ্টু জানোয়ার, তারা আগে হতেই সড় করে এসেছিল, তারা পিঁপড়েদের খুদে শহরের উপর চড়াও হয়ে লড়াই দেবার জন্য অনুরোধ করলে। শেয়ালপণ্ডিত বললেন, 'এমন কাজ কোরো না! তারা দেখতে ছোটো কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষে নেই!'

সবাই হেসে শেয়ালের কথা উড়িয়ে দিলে। লড়াই বাধল। জীবনের মধ্যে ভোম্বলদাস এই এক ভুল করলেন — বুদ্ধিমানের কথা ঠেলে, গায়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরি হল না! লড়াই তো যেমন হবার হল কিন্তু খুদে শহরের একটি ইটও কেউ খসাতে পারলে না। উলটে সিংহির মামা ভোম্বলদাস বুড়ো বয়সে হাতে-মুখে, নাকে-চোখে, কানে-ল্যাজে, বুকে-পিঠে, পেটে এমন কামড় খেলেন যে সর্বাঙ্গ ফুলে ঢোল! না পারেন চলতে, না পারেন বলতে। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে; জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজকার্য অচল হল। শেয়ালপণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজার বড়ো বড়ো আমির-ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু ঘুঁটে-ভস্ম, গোবর-প্রলেপ এসবে কিছুই হল না। তখন বকা-ধার্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস করবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগনে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমি তো চলৎশক্তিরহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাসে যাওয়া ঘটে — নচেৎ উপায় নাস্তি!'

বকা-ধার্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হল। কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই বকা পিছোলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্মকথা শোনায় কে? বাঘা-কোটালেরও ওই একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গোরু-জরু সামলায় কে? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা। সিংহকে নিয়ে রাজকার্য চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়ালপণ্ডিতকে রাজা বললেন, 'পণ্ডিত, তুমি কী বলো?' পণ্ডিত কী জানি কী ভেবে বললেন, 'জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চাই দেখছি বেশি, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং এ-রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোনো কাজই আটকাবে না। গর্দভ রইলেন পাঠশালাগুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রাজা খুশি হয়ে শেয়ালকে কৈলাস-যাত্রার আয়োজন করতে তখন হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

রতা-শেয়ালের কথা

শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আরাম করুন, এদিকে হিমে গাছতলায় পড়ে ভোম্বলদাস তপস্যা করতে থাকুন! ওদিকে হয়েছে কী, রাজার চর টিকটিকি, সে নতুন রাজা সিংহের কাছে শেয়ালের এসব খবর প্রকাশ করে দিয়েছে; আর অমনি সিংহ হুহুংকার ছেড়েছেন।

তখন ফাল্গুন মাস; হিমালয়ের চুড়োয় বরফ জমাট বেঁধেছে কিন্তু সুন্দরবনে বসন্তকাল নতুন দেখা দিয়েছে—ফুলে-ফলে পাখির গানে মধুর গন্ধে জলস্থল মাতিয়ে তুলে। সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে সিংহ-সিংহিনী ডাক ছাড়লেন;—নিমন্ত্রণ-চিঠি পেতে কারও আর দেরি হল না। জীবজন্তু যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে সভায় এসে হাজির হতে লাগল। বকা-ধার্মিক সব আগে এসে লম্বা পায়ের ধুলো রাজা-রানি ছাড়া আর সবার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে করে একটুখানি আঁস-জল ছিটিয়ে রাজা-রানিকে 'জয় জীব—স্বস্তি স্বস্তি' বলে আশীর্বাদ করে বসলেন। হরবোলা-পাখি রাজার বিদূষক, ময়না রানির সেঙাতনি—দু-জনে এসে ভাঁড়ামো জুড়ে দিলে। ভাল্লুক-মন্ত্রী, বাঘা-কোটাল, সেনাপতি-গজপতি, খড়্গ-সিং বরকন্দাজ, মহিষ-মহিষী, গোরু-গাধা-ছাগল-ভেড়া ছোটে-বড়ো পাত্র-মিত্র সবাই একে-একে এসে জুটল।

সিংহ শেয়ালের কথা পাড়লেন, 'এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ একদিন আমার মামার বাড়ির সদর আর অন্দর দুই মহলের মাঝে একটা দেয়াল দেবার হুকুম পেয়ে রাজমজুরের কাজ করতে এল। তার নাম ছিল রতা বা রতন। শেয়ালপণ্ডিত তখন খুবই ছোটো, রতার বউ তাকে কোলে নিয়ে চুন-সুরকির ঝুড়ি বইতে এসেছিল। তখন তাদের অতি দৈন্যদশা।

'রতা-মিস্ত্রি তো দেয়াল তুলে দিলে। গজগীর করে গাঁথা মোটা দেয়াল মামার সদর-অন্দরকে দুই ভাগ করে মেঘ ছাড়িয়ে উঠল। মামা তো দেখে ভারী খুশি! কিন্তু মামি সেই দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবার জোগাড়। এদিকে মামারও অন্দরে যাবার পথ বন্ধ। কী উপায় করা যায়? মামা দেয়াল ভাঙবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ দেয়াল, তাকে ভেঙে ফেলা তো সহজ নয়! হাতি এলেন দেয়াল ভাঙতে, কিন্তু দেয়াল যেমন তেমনিই রইল, লাভের মধ্যে হাতি দাঁত ভেঙে ফোগ্‌লা হয়ে ফিরে এলেন। ওদিকে খিদের জ্বালায় অন্দরের মধ্যে মামি এমন চিৎকার শুরু করলেন যে রাজ্যের লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছোটো ছোটো জানোয়ার তো ভয়েই মারা যাবার জোগাড়! রাজ্যে হুলুস্থুল!

'সবাই মামার দুর্বুদ্ধির নিন্দে করতে লাগল। পশুদের মধ্যে সদর-অন্দর — বাড়ির মধ্যে বাইরে — এ-সব কোনোকালে ছিল না; হঠাৎ নতুনরকম কেতা করতে এ কী বিপদই মামা ঘটালেন! মামা রতা-শেয়ালকে ডেকে বললেন, 'তিন দিনের মধ্যে এর উপায় করো, না হলে তোমার প্রাণদণ্ড করব!' কিন্তু হায়, রতা-শেয়াল দেয়াল দিতে-দিতেই বুড়ো হয়ে গেছে! দেয়াল তুলতেই সে পাকা, দেয়াল-সরানো বিদ্যেতে সে একেবারেই মজবুত ছিল না। যে দেয়াল সে একবার তুলেছে, তাকে নামানো তার সাধ্য হল না। মামি মামার দেয়ালের মধ্যেই মরে রইলেন।

'অন্দরের মধ্যে মামির চিৎকার বন্ধ হল কিন্তু বাইরে থেকে মামা ভোম্বলদাস এমন হাঁকডাক কান্না-কাটি তম্বিতম্বা শুরু করলেন যে রতা-শেয়াল ভয়েই মরে যায় বুঝি! আর তাকে ধরে ছাল ছাড়িয়ে মাথা গুঁড়িয়ে একটু একটু করে মারবার সুবিধে হয় না দেখে বাঘা-কোটাল ভারী দুঃখিত হয়ে রাজাকে চুপ করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। সেই অবসরে রতার ছেলেটা বাপকে বুদ্ধি দিলে। কোটাল এসে রতাকে যখন ধরলে তখন দেখা গেল রতা মরেছে আর তার বউ আর এই আমাদের রতা-শেয়ালের ব্যাটা শেয়ালপণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। রতাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবার সুবিধে হল না কিন্তু বাঘ-কোটাল রতার ল্যাজের চামরটা কেটে নিয়ে পতাকার মতো করে সেটাকে ফাঁসিকাঠে লটকে দিয়ে তবে শান্ত হল।

'ছেলের বুদ্ধি নিয়ে রতা ল্যাজটা মাত্র দিয়ে সে যাত্রা প্রাণ নিয়ে — রাতারাতি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সরে পড়ল বটে কিন্তু ল্যাজ তুলে সে দৌড় মারতে পারলে না — এর জন্যে শেয়ালের দলে সে ভারী লজ্জা পেলে। সবাই বললে — এর চেয়ে যে মরাও ভালো ছিল! রতা বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তার ছেলেকে এসে বললে — তোরই জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা! তখন শেয়ালপণ্ডিত গম্ভীর মুখে ভাবতে বসলেন — কী করে সব শেয়ালকে জব্দ করা যায়!

'ছেলেটার অগাধ বুদ্ধি। ভাবতেই তার মাথায় একটা ফন্দি এল। সে চট করে তার বাপকে সাহেবদের নীলকুঠিতে নিয়ে এক পোঁচ নীল রং মাখিয়ে কানে ফুসফুস করে মন্তর দিয়ে ছেড়ে দিলে।

'রতা-শেয়াল ছিল লাল, এখন সে নীল হয়ে বনে ফিরে এসে মহা হইচই বাধিয়ে দিলে — রাজা-উজির মেরে বেড়াতে আরম্ভ করলে! শেয়াল বলে তাকে আর চেনাই যায় না। মামা ভোম্বলদাস পর্যন্ত ভয়ে তাকে

সিংহাসন ছেড়ে দিতে পথ পান না। কৈলাস পর্বত থেকে পশুপতি ভোম্বলদাসের বোকামোর খবর পেয়ে এই নতুন রাজাকে রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছেন — এই কথাই বনে-বনে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

'মামা একে মামির শোকে অস্থির, তার উপর সিংহাসন হারিয়ে পাগলের মতো হলেন। এদিকে রতা, যে একদিন মামার চাকর ছিল, মাইনের জন্যে দু-বেলা ভাল্লুক-মন্ত্রীর কাছে ধন্না দিত, মারের ভয়ে বাঘা-কোটালের বাড়ি এঁটোকাঁটা ফেলে ত্রি-সন্ধ্যা খেটে মরত, বকা-ধার্মিকের জন্যে মাছ কুটে কুটে হাত খইয়ে ফেলত — সেই হল হুকুম-হাকামের কর্তা! সবার যে কী দুঃখে দিন যাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু রাঙা রতা — সে রং বদলে বেশ সুখেই আছে। সবাই তার কাছে জোড়হস্ত!

'সেইসময় রতা যদি আরও দিনকতক নিজের বুদ্ধি না প্রকাশ করে তার পণ্ডিত ছেলেটার কথামতো চলত তবে কোনো গোলই হত না। কিন্তু সিংহাসন পেয়ে রতার মাথা গরম হয়ে গেল। সেইসঙ্গে যেটুকু বুদ্ধি মগজে ছিল, সেটুকুও তার গায়ের রঙের মতো বদলে বাঁকাচোরা উলটো-পালটা হয়ে রতা যা-তা করতে আরম্ভ করলে।

'সব জানোয়ারের ল্যাজ থাকবে, কেবল তারই থাকবে না — এটা তার আর সইছে না! তার পণ্ডিত ছেলের উপরই রাগটা বেশি। তারই কথাতেই তো সে ল্যাজ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সরেছিল। এখনও সেই ল্যাজ ফাঁসিকাঠে ঝুলছে। সেটাকে নামিয়ে এনে নিজের পিঠে যে জোড়া দেবে তারও উপায় ছেলেটা রাখেনি! — নীল গায়ে লাল-ল্যাজ মেলানো শক্ত! যত দোষ হল শেয়ালপণ্ডিতের আর সেই অপরাধে সে রাজ্যের জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে বসল।

'জানোয়ারের দলে সোরগোল পড়ে গেল। সিংহ বেঁকে বসলেন — কিছুতেই ল্যাজ দেব না! দেখাদেখি বাঘও গোঁ ধরলে — ল্যাজ আপ্‌সে বললে — যাক প্রাণ, থাক ল্যাজ! মোষও চোখ রাঙিয়ে বাঘের কথায় সায় দিলে। ভাল্লুকের ল্যাজ ছিল না বললেই হয়, সে বললে — রাজার হুকুম না মানলে নয়, মুশকিল! বানর তাকে দাবড়ি দিয়ে বলে উঠল — তোমার চাকরি বজায় রাখতে ল্যাজ কাটতে চাও কাটো, কিন্তু আমরা তোমায় একঘরে করব, মনে থাকে যেন! ভাল্লুক ভয়ে চুপ হয়ে গেল। ভাল্লুক যখন চুপ করলেন, তখন খরগোশ, কচ্ছপ, হরিণ — যাদের ল্যাজ নজরেই পড়ে না তারা আর উচ্চবাচ্যই করতে পারলে না।

'এদিকে রাজার ইস্তাহার জারি হল — পয়লা তারিখে শেয়ালদের, দোসরা তারিখে সিংহ-বাঘ এমনি সব হোমরা-চোমরাদের, তেসরা তারিখে গোরু-গাধা-মোষ এদের, চৌঠা বাকি সব প্রজার ল্যাজ কাটা চাই, নচেৎ প্রাণদণ্ড!

'সব জানোয়ার ধর্মঘট করে অমন রাজার বন ছেড়ে মানুষের রাজত্বে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় থাকবার মতলব করেছে, এমন সময় শেয়ালপণ্ডিত নাপিত-ধূর্তর পাঠশালা থেকে নাকুর বদলে নরুন, নরুনের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে ধুচুনি আর ধুচুনির বদলে বাড়ির গিন্নি কেমন করে আনতে হয়, সেই বুদ্ধি শিখে, বউ-সঙ্গে ধুচুনি মাথায় ঢোল পিটতে পিটতে বনে এসে হাজির। সব জানোয়ার তার বুদ্ধির তারিফ করে ল্যাজ বাঁচাবার একটা উপায় করতে তাকে ধরে পড়ল।

'পণ্ডিত শুনলেন প্রথমেই শেয়ালদের ল্যাজ নামাবার হুকুম হয়েছে। তিনি খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন — তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাকো, এর উপায় আমি করব। পয়লা তারিখে সব শেয়াল আর জন্তু জানোয়ার যে যেখানে আছ ঠিক সময়ে রাজসভায় হাজির হবে; এদিক-ওদিক না হয়! রাজা যখন

বলবেন—ল্যাজ কাটো! অমনি সবাই নিজের ল্যাজ দাঁতে চেপে ধরে সিংহাসনের দিকে মুখ ফেরাবে, আর যা করতে হয়, আমি করব। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে। আর পয়লা তারিখে ছেলে-বুড়ো সব শেয়ালের এক ‘রা’ হওয়া চাই। না হলে সব মাটি!

‘সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে শেয়ালপণ্ডিত বউ নিয়ে ঘরে যান, এদিকে ভোম্বলদাস, বাঘ-ভাল্লুক এরা আনন্দ করছে; গাধা আর গোরু এরা ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগল—ভাই শেয়ালপণ্ডিতের যুক্তি তো ভালো বোধ হয় না। দাঁতে তো ল্যাজ কামড়ে ধরলেম, সেইসময় রাজা যদি এক হুংকার ছাড়েন, তবে দাঁতকপাটি তো লেগে বসে আছে! তখন যদি ল্যাজের গোড়ায় দাঁত একটু চেপে বসে তবে ল্যাজ খসে না পড়ে যায়! আমাদের তো ভাই ভালো বোধ হচ্ছে না। শেষে ঠকতে না হয়। ভোম্বলদাস দু-জনকে ধমকে দিয়ে বিদায় করে দিলেন। তারা দুইজনে দলছাড়া হয়ে একজন গেল গোয়ালঘরে বাঁধা পড়তে, একজন গেল ধোবার বাড়ি মোট বইতে।

‘পয়লা তারিখে নলবনে নীল রাজা কাটা ল্যাজে জরির ফুঁপি আর ময়ূরের পালকের এক রাখি বেঁধে গোঁম্সা মুখ করে ল্যাজ-ভাসান দেখবার জন্য ঘাড় উঁচু করে রাঙামাটির সিংহাসনে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। নদীর জলে যেন রক্তের ঢেউ খেলছে। ধারে ধারে শরবনগুলোর মধ্যে জানোয়ারেরা গুঁড়ি মেরে বসে রাজার দিকে চেয়ে রয়েছে—কখন কী হুকুম হয়! এমন সময়ে শেয়ালপণ্ডিত রাজ্যের খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। নীল রাজা এ পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলেননি, পাছে মুখ খুললে শেয়ালের রা ধরা পড়ে যায়। ইশারায় শুধোলেন—কী হল? পণ্ডিত নিজের ঝাঁটা ল্যাজ নিশেনের মতো আকাশে তুলে হেঁকে বললেন—হুয়া! অমনি চারিদিকে শেয়ালের পাল ডেকে উঠল—হুয়া হুয়া! রাজা তাদের ল্যাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করলেন—কী হুয়া?—কিছুই হয়নি! কিন্তু শেয়ালপণ্ডিত কেবল বলতে লাগল—হুয়া হুয়া হুয়া উচ্চা হুয়া উচ্চা হুয়া!

‘এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালকেই ডাকতে হবে—এটা বিধাতার নিয়ম। ডাকবার জন্যে রতার প্রাণ আইঢাই করতে লাগল, তবু সে দু-হাতে মুখ চেপে বসে রইল দেখে শেয়ালপণ্ডিত দলবলকে ইশারা করলেন। ঠিক সেইসময় সূর্যও অস্ত গেলেন। অন্ধকারে শেয়ালের পাল চারিদিক থেকে ডেকে উঠল—হুয়া হুয়া হোতা হুয়া হোতা হুয়া। রতার মুখ আর বন্ধ থাকল না। সে মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া? না হুয়া না হুয়া!

‘আরে শেয়াল!’—বলে ভোম্বলদাস অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক থাপ্পড়ে রতাকে সিংহাসন থেকে জলে ফেললেন। সেখান থেকে বাঘ তাকে মুখে করে তুলে দেখালে—নীল রং ধুয়ে বেরিয়েছে—ল্যাজকাটা রতা-শেয়াল, রাজমিস্ত্রি!

‘সেই অবধি শেয়ালপণ্ডিতকে মামা সভাপণ্ডিত করে রাখলেন আর তারই বুদ্ধিতে চলতে লাগলেন। ছিল সে রাজমজুরের ছেলে, হল সে রাজার প্রধানমন্ত্রী। অহংকারে আর মাটিতে তার পা পড়ে না। তারপর বুদ্ধির জোরে সে কী না করলে? তার বাড়ি [illegible] ঘর হল—মামার দৌলতে তার সব হল! এখন সেই মামাকেই সে নিজের গড়ে নিয়ে বন্ধ করবার জোগাড় করেছে—টিকটিকি এই খবর আমাকে দিয়ে গেল। কোনদিন সে মামাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ফুসলে-ফাসলে নিয়ে আমারই-বা সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।’

সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক

সিংহরাজ বললেন, 'কোনদিন-বা শেয়ালপণ্ডিত ভোম্বলদাস মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।'

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হতে পারে।'

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে, 'এখনই এর একটা বিহিত করা চাই।'

গজপতি বললেন, 'এমন কেউ নেই ওই পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।'

মোষ চোখ রাঙিয়ে বললে, 'ওটা বিষম ঠক!'

ছোটো-ছোটো জানোয়ার, তারা বলে উঠল, 'দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।'

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই! ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেব। আসছে মাসে মামির শ্রাদ্ধ, সেইদিনই ওকে এখানে আনাচ্ছি; তারপর বিচার করে দেখা যাবে কী করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ করে বলতে পার; শজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়ালপণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছু করা চাই। মামা তো কৈলাসে গেলেই শীতে মরবেন, জানা কথা, কেবল শেয়ালপণ্ডিত তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাস যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা করে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাঁকে রোজ একটা করে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটাসোটা করে আবার যেদিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সেদিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না! তাঁর নামে তোমরা যেসব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছোবে। অতএব তোমাদের উচিত আজই আমাকে মামার রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না—মামার বাবা এলেও নয়!'

এই বলে সিংহ হুংকার ছেড়ে চারিদিক চাইলেন; সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে একসঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে—

'তাই হোক! এখনই আপনাকে অভিষেক করা হোক! বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা—সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে চায় চলুক, আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করব—জোর যার মুলুক তার।'

সিংহরাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, শ্বেতছত্র, শ্বেতচামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন। ছুঁচোর কাছে মালখানার চাবি থাকত, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিতমশাই যাবার এক হপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুমনামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন; সে চাবি তার কাছে এ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয় পাঠান আর কী, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার করে ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজকর্ম চলে না। সিংহ হুকুম দিলে, 'ভাঙো দরজা।'

দরজা গেঁথেছিল রতা-শেয়াল। হাতি হয়েছিল ফোগ্‌লা—তিনি সে কাজে আর এগুলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল—সবাই শিং বেঁকিয়ে ফিরে এল। বুনো শুয়োর তার ছিল সোজা, ছুঁচোলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল! গন্ডারেরও ওই দশা! এদের মধ্যে কেউ দাঁতে করে কেউ শিঙে করে কেউ শুঁড়ে করে না তুলেছেন, না ভেঙেছেন এমন জিনিস নেই, কিন্তু কী গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা—দরজা খুলল না।

এদিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়ালপণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলাপ করছেন সেখানে এসে কেউ জানিয়ে গেল। মামা তো হেসেই অস্থির; শেয়ালকে বললেন, 'ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগনেকে পাঠিয়ে দাও—আরও কিছু মজা হোক।'

শেয়াল বললেন, 'চাবিটা মহারাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুশি হবেন—কী বলেন?'

ভোম্বলদাস চোখ-মটকে বললেন, 'যাও, কিন্তু ভাগনে যখন উত্তম-মধ্যম পুরস্কার হুকুম দেবেন, সেসময় ল্যাজ তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করে চটপট ফিরে আসতে ভুলো না।'

শেয়াল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এল ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভনভন করতে। মশা মিহি সুরে কানের কাছে বললে, 'মহারাজ!'

ছুঁচের মতো কথা বিঁধল— ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর মহারাজ বলে কেন সম্বোধন করো? আমার যথাসর্বস্ব গেছে পরের হাতে!'

মশা আর-একবার এগিয়ে এসে বললে, 'ধনদৌলত সকলই মজুদ। হুকুম করেন নির্ভয়ে বলতে তো বলি। ওই যে দেখেন উইঢিবি—'

ভোম্বলদাস ল্যাজ আপ্‌সে উঠে বললেন, 'উইঢিবি কী বলো? ওটা না কৈলাস পর্বত!'

ভোম্বলদাসের হুমকি শুনে মশা তো ভয়ে কম্পমান! তার মিহি সুর আরও মিহি হয়ে গেল। সে কেবলই পিঁ-পিঁ করে কী বলতে লাগল কিছুই বোঝা গেল না। ভোম্বলদাস তখন মশাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'বলে চলো।'

মশার তখন কথা ফুটল। সে যা বলল ভোম্বলদাসকে খুব ছোটো ছোটো করে তা শোনামাত্রই যেন হাজার ছুঁচ ফুটল রাজার গায়ে। তিনি একেবারে দন্ত কড়মড় করে চার থাবা দিয়ে নিজের গা আঁচড়াতে থাকলেন রাগে এমন যে নিজের ছাল-চামড়া কিছু আর রইল না গায়ে। খেয়েদেয়ে যেটুকু-বা রক্ত হয়েছিল গায়ে তাও সবটা বেরিয়ে গেল একদম! খালি রইল হাড়-কখানার মধ্যে ধুকপুক করতে তাঁর প্রাণটুকু!

রাজরক্ত মাটিতে পড়ে মাটি হয় দেখে মশার দল এসে জুটল চারিদিক থেকে। ভোম্বলদাসকে তারা ঘিরে রইল দিনরাত খুব সাবধানে। তাঁর গায়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সব কড়া ওষুধ দিতে থাকল। কেউ তারা রক্ত পরীক্ষা করে দেখে—ম্যালেরিয়া হল কি না। কেউ দেখে টাইফয়েড হল কী কালাজ্বর?

এমনি রক্ত শুষতে-শুষতে যখন ভোম্বলদাসের লাল চামড়া প্রায় সাদা হয়ে এসেছে সেই সময় শেয়াল-পণ্ডিত ধুচুনি মাথায় ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে হাজির। একেবারে রাঙা চেলি-পরা বরের সাজ কিন্তু নাকটি কাটা। ভোম্বলদাস শেয়ালের সেই চেহারা দেখামাত্রই এমন অট্টহাসি হাসলেন যে তাতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল! ভাগনের খবর, সুন্দরবনের কথা শুধোবার কিংবা ভাঁড়ারঘরের চাবি ফিরে চাইবার আর সময়ই হল না।

শেয়ালপণ্ডিত খানিক হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে একটা নটে গাছের গোড়ায় রাজভাণ্ডারের চাবিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের গর্তে ঘুমোতে গেল; আর একটা ছাগল—ঠিক তেমনি ছাগল, যাদের পাঁটার জুস খেয়ে ভোম্বলদাস নিজের গায়ের রক্ত করেছিল—সে কোথা থেকে এসে বনের ধারে—নটে গাছটার গোড়াসুদ্দ মুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি আরামে কৈলাস পর্বতের মতো প্রকাণ্ড উইঢিবির চুড়োয় তিন লাফে গিয়ে উঠল—

ঠিক দুক্কুর বেলা,
যখন ভূতে মারে ঢেলা।

সেখানে থেকে সেই শুনলে সুন্দরবনে নতুন রাজার অভিষেকের দিনে জোড়া পাঁটা গর্দান দেবার আগে তাকে ডাকাডাকি করছে ম্যা-ম্যা বলে!

দেয়ালা

এক যে ছিল গাছ তার ছিল এক ছাওয়া; এক যে ছিল মাঠ তার ছিল এক গাছ; আর-এক ছিল যে কুঁড়ে তার ছিল একটা ঝাঁপ—সেটা কখনো খুলত কখনো বন্ধ হত। ঝাঁপ যখন বন্ধ হত তখন ঘরটা কিছুই দেখত না, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভিতরটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকত—পিদুমের আলো ঝিমোত, ঘরের জিনিসপত্র ঝিমোত, ঘরের মধ্যে যে কুঁড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোত, কিন্তু ঝাঁপ খুললে আর রক্ষে নেই—পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত—সেই সে মাঠে যেখানে গাছে আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলাচলি করছে। ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে, 'ভাই, কী দেখছিস?'

ছোটো গাছ সে এদিক-ওদিকে চায়, চোখের পাতা মেলে আর বলে, 'মাঠ দেখছি!'

'মাঠের পরে কী ভাই?'

'মাঠের পরে তাল গাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।'

'তারপর?—'

গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর থির হয়ে চেয়ে থাকে! গাছের ছাওয়া সে-ও চুপচুপ গল্প শোনাবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে।

ধুধু মাঠের ধুলোমাটি, খোয়াইজোড়া রাঙামাটি, বাঁধের ধারের পোড়ামাটি — তারা তো চেনে না ছোটো গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে, তারা চলে যায় সেই যে তালগাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে, আর বলে, 'দেখলে কিছু?'

তালগাছ দাঁড়িয়েই থাকে—হেলে না, দোলে না, বলে না কিছু। তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে—এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে—খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই পানে, আর মনে মনে বলে—আকাশকে কেমন করে শুধোই ওখান থেকে কী দেখতে পাচ্ছে? মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে, সে কী দেখছে? আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে? এইভাবে এ ওর দিকে চেয়েই আছে, দুপুরবেলা সবার দিকে দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলে না, কয় না!

চুপচাপ থেকে থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথি ছাওয়া, মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল, 'মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তারপর?'

ছোটো গাছ হঠাৎ চটকা ভেঙে জেগে উঠে বললে, 'তালগাছটার মাথার উপরে একটা পাখি উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কী খুঁজে চলেছে!'

গাছের ছাওয়া ছোট্টো একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি দেখব।'

বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠল, 'ইস্‌স্‌! 'ছোটো গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বললে, 'দেখবেই তো, দেখবেই তো! লজ্জায় ছোটো গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল।'

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, একবার সে রঙিন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল — নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে। এমন সময় গাছ বলে উঠল, 'ছাওয়া! সাড়া নেই!' গাছ ফিরে ফিরে দেখে—ছাওয়া পালিয়েছে। গাছ মাটিকে বললে, 'ছাওয়া গেল কোথা?'

মাঠ বললে, 'এই তো ছিল, গেল কোথায়?'

তালগাছ বললে, 'ছাওয়ার মতো কে যেন ওই পুবমুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখেছি।'

আকাশ বললে, 'শুধোই তো রোদকে ছাওয়া যায় কোনখানে?'

সেই তালগাছের ও-গায়ে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তার কোণে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বললে, 'বলব না।'

তারপরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়ল। সবাই এমনকী গাছের পাতা, ফুল, পাখি, ঘাটে-মাঠে-হাটে যে যেখানে ছিল বলে উঠল, 'কোথায় গেল সে? কোন দেশে?' গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোটো ছাওয়াকে খুঁজে যখন কোথাও পেল না তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগল— গেল কোথায়, এই ছিল? তারপর সবাই ঘুমিয়ে গেল ঘরে-বাইরে; শুধু তারাগুলো থেকে থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায়?

গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয় —সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড়ো হয়েছে! সেই যে এতটুকখানি ছাওয়া— যে মাঠের শেষ দেখতে চাইত, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইত আকাশের শেষে— সে এখন সেইসব তেপান্তর মাঠের চেয়ে সেই নীল আকাশের চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে! ভয়ে গাছপালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিমঝিম করতে থাকে আর একবার চমকে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড় ছাওয়াকে খুঁজতে খুঁজতে দূর দূর দেশে! সেইসময় চুপিচুপি আলো আসে— একটুখানি চাঁদের আলো—বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে, ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—ছাওয়া? ঘুম-ভাঙানো পাখি ডেকে বলে, 'ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া!' চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া!

ছাওয়া বলে, 'তারপর?'

গাছ বলে, 'ধুধু করছে মাঠ তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে।'

ছাওয়া বলে, 'দেখো না ভাই ভালো করে তার পরে কী?'

গাছ বলে, 'সেই একটি গাছ তার পরে রয়েছে আলো, না আলো তো নয়, একটা আলো-মাখা মেঘ!'

ছায়া বলে, 'সে আবার কী?'

গাছ বলে, 'তা জানিনে ভাই কিন্তু কালো ঠিক তোর মতো ঠান্ডা রং তার।' হঠাৎ ছাওয়ার উপর দু-ফোঁটা জল পড়ে—।

ছাওয়া বলে, 'ওকী কাঁদছিস কেন?'

গাছ মাথা দুলিয়ে বলে, 'কাঁদব কেন?'

ছাওয়া বলে, 'এই দেখ না জল।'

কুঁড়ে তার ঘরের ঝাঁপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে, 'বিষ্টি রে বিষ্টি।'

টিপির-টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক দিয়ে থেকে থেকে দেয়ালা করে, বাতাস্ করে সারারাত এপাশ-ওপাশ, তারপর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেইসঙ্গে তাদের ছাওয়ারাও জেগে ওঠে।

ছোটো গাছের ছাওয়া বলে গাছকে, 'আজ কী খবর?'

গাছ বলে, 'আজ দেখছি কী জিনিস?'

ছাওয়া বলে, 'কী?'

গাছ বলে, 'সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।'

ছাওয়া বলে, 'তারপর?'

গাছ বলে, 'প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে।'

ছায়া বলে, 'তারপর—?'

গাছ বলে, 'রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।'

ছায়া বলে, 'ওকে আমায় দে।'

গাছ বলে, 'এই নে, দেখ, কেমন সুন্দর ফুল।'

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে, 'ফুল! ফুল কথা কয় না।'

ছাওয়া গাছকে বলে, 'ফুল কথা কয় না যে?'

গাছ বলে, 'ঘুমিয়ে আছে, জাগাসনি।' ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়েচড়ে ফুলকে দেখে। গাছ নড়েচড়ে শুধোয়, 'কী করছে?'

ছাওয়া বলে, 'ঘুমোচ্ছে।' এক-এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে, 'দেয়ালা করছে আমাদের ফুল।' কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ গাছের তলায় ঝরা-ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে, বেড়ায় গাছে গাছে।

গাছ বলে, 'কী করবি ফুল নিয়ে?'

ছেলে বলে, 'খেলা করব।' ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে, সে এতটুকু—গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে, 'কী করবি ফুল নিয়ে?'

মেয়ে বলে, 'ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখব।'

ছাওয়া বলে, 'তারপর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো?'

মেয়ে 'দোব না' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে, 'নিয়ে যেয়ো না।'

গাছ বলে, 'যাক না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে। দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দু-জনে মিলে; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

বাবুই পাখির ওড়নবৃত্তান্ত

(নানান দেশের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা)

তাল-চড়াইগুলোই বাবু খেতাব পেয়ে হয়েছে বাবুই পাখি। অন্য যেসব চড়াই পাখি ঘরে ঘরে শহরে দেখা যায় তাদের কেউ বাবুই বলে না। এই ভুলটা যে ঘটেছে তার জন্যে মানুষগুলোই দায়ি। বাবুই হচ্ছে তারা দেখতে যারা চড়াই কিন্তু আসলে শহর-ঘেঁষা এক জাতিরই পাখি; আর যেগুলোকে মানুষে বাবুই বলছে সেইগুলোই হল আসলে চড়াই পাখি। চড়া শক্ত এমন তালগাছের মটকায় তারা থাকে বলেই তাদের তাল-চড়াই বলা হয়, এ পক্ষীতত্ত্বটা সবাই জানে না বলেই গোল করে। মানুষে যাই বলুক কিংবা খেতাবের ওলট-পালটের দরুন পাড়াগেঁয়ে চড়াইগুলো আপনাদের বাবুই ভাবুন আর যাই ভাবুন, শহরের সাধারণ চড়াই যে অনেক বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে তাল-চড়াইদের চেয়ে তালগাছে না চড়েও উন্নত এবং বিদ্যেবুদ্ধি চটকফটক সব দিক দিয়ে অগ্রগামী, তা অস্বীকার করবার জো নেই, বাবুই যদি বলতে হয় শহরের দলকে বলাই ঠিক। তাল-চড়াইকে তাল ঠুকে বাবুই বলো আর যাই বলো তাল-চড়াই সে তাল-চড়াই-ই থাকবে চিরকাল তালগাছেই। আমি এই শৌখিন, সব বিষয়ে উন্নত, শহুরে বা মেট্রোপলিটন বাবুই পাখির একজন। ছেলেবেলা থেকে আমি চালাকচতুর, চটপটে, ফুর্তিবাজ বা বাবু-কছমের পাখি কিন্তু উচ্চশিক্ষার ফলে বেশ রাসভারী গম্ভীর গম্ভীর গোছ দেখায় আমাকে। এর উপর একটু-আধটু কাব্য, দর্শন, সাহিত্য এমনি,সব জিনিসের খুদকুঁড়ো তাও আমি পরিপাক করতে বাকি রাখিনি—কেন না সব বিষয়ে দশকর্মা মহাপণ্ডিত এমন একজন মানুষের বাড়ির চিলের ছাতে একটা মেটে নলের ভিতর আমি বাসা নিয়েছি। সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে বড়ো বড়ো রাজারাজড়ার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ঐশ্বর্যের অনিত্যতা, অসারতা আর আমার মেটে ঘরের প্রতিবেশীর ছোটো বাড়িখানার মধ্যে যে উচ্চ চিন্তা আর সাদাসিদে জীবনযাত্রার অম্লান কুসুমগুলি দিনের পর দিন ফুটে চলেছে তার অমরতা উপলব্ধি করবার খুবই সুযোগ পেতাম। পণ্ডিতের পাতের খুদকুঁড়ো পেয়ে আমিও বাবুইসমাজে একজন মস্ত লোক বলে খ্যাতি পেলেম। কাজেই বাবুইসমাজটা কী প্রথায় চালালে সকলের সুবিধে হয় সেটা তদন্ত করবার ভার আমার উপর পড়েছে। কাজটা খুবই শক্ত, কেন না বাবুইপাখিরা যদি পাঁচজনে মিলে খালি স্থির হয়ে বসে বিবেচনা তর্ক-বিতর্ক করত তবে আমি তাদের অভাব-অভিযোগ শুনে যা হয় একটা সুব্যবস্থা করতে পারতাম—কিন্তু তা হবার জো নেই। এক দণ্ড তারা স্থির হয়ে বসে থাকতে চায় না, কেবলই চুলবুল করে, বাজে কথা নিয়ে কিচিমিচি করা নয়তো অকারণে নিজে নিজে ঝগড়া-মারামারি করাই তাদের কাজ; কাজের কথা এলেই সরে পড়ে।

আজকাল বরং বাবুইদলে নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করবার একটু চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন এসব কিছুই ছিল না, বাবুই তখন কেবলই উড়ত, নীতিচর্চা কিংবা ধর্মচর্চার ধার দিয়েও যেত না। এপাড়ার চিলের ছাতের ওপর বাসাটা নেবার আগে দু-বছর আমি একটা কাঠির খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিলেম। যখনই আমার তেষ্টা পেত তখনই আমায় এতটুকু একটি দড়ি-বাঁধা বোক্‌নো করে জল তুলতে হত।

সবাই চড়াই পাখির জল-তোলা দেখে ভারী আমোদ পেত আর কালো চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা এই পাখির তামাশা দেখিয়ে যা রোজগার করত তা থেকে দু-বেলা দু-গুলি ছাতু ছাড়া আর বেশি কিছুই আমার জন্যে বন্দোবস্ত করত না। খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে পাড়ার দু-চার জন আলাপী বাবুইকে যখন আমার দুঃখের কাহিনী জানালেম তখন সবাই আমাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। সেইসময়েই আমি বেশ করে নানা পক্ষীসমাজের চালচলন নজর করে দেখে নিলেম। আমি দেখেছি পাখিদের আনন্দ শুধু খাওয়ায়-দাওয়ায় নয়। বাবুই হন, চড়াই হন, সবার জীবনের একটা বড়ো দিক আছে। এমনি নানা দিকে নানা বিষয়ে নজর দিতে দিতে ক্রমে পক্ষীসমাজের মধ্যে আমি একজন মাতব্বর হয়ে উঠলেম। দিনের মধ্যে বেশি সময় আমি ময়দানের একটা পিতলের স্বর্গীয় অতিমানুষের মূর্তির উঁচু মাথার টাকটার মাঝখানে বসে উসকোখুসকো পালকের মধ্যে মাথা গুঁজে পৃথিবীর দিকের চোখটা বন্ধ করে আর আকাশের দিকের চোখটা খুলে রেখে পক্ষীসমাজের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কী ব্যবস্থা হতে পারে, কী-বা এ সমাজের কাজ, আর কোথায়-বা আমদের শক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করতেম। গভীর সমস্যা আমার মনে উদয় হত। বাবুই আর চড়াইয়েরা কোথা থেকে এল কোথায়-বা যাবে, কেনই-বা দুঃখু হলে তারা কাঁদে না, কেনই-বা তারা কাকদের মতো দল-বেঁধে থাকে না, আর কেনই-বা বাবুই আর চড়াই বাজে কিচিমিচি ঝগড়াঝাটি না করে পঞ্চায়েত করে সমাজের সব সমস্যা মিটমাট না করে নেয়!

দেখা যাচ্ছে শহরে ভারী অদলবদল হচ্ছে। যেখানে ছিল বাগান, সেখানে উঠছে বাড়ি, কাজেই শহরের যত বাবুই আর চড়াই তাদের ফিড়িং ফড়িং পোকা ও মাকড় এমনি সব নানা খাবার জিনিসের ক্রমেই অভাব ঘটছে। এর ফলে মানুষদের মধ্যে বড়োলোক আর গরিবের দুটো আলাদা থাক আর সঙ্গে সঙ্গে উঁচু-নিচু একটা জাতেরও ছিষ্টি হয়ে উঠছে। শুধু যে মানুষের মধ্যে এমন হচ্ছে তা নয়, পাখিদের মধ্যেও গরিব-গুরবো বস্তির পাখিগুলো ছাইপাঁশ তাও আধপেটা খেয়ে মরছে আর বড়োলোকদের পাড়ার পাখিগুলো ভালো খাওয়া পেয়ে খুবই আরামে রয়েছে। গির্জে, হাইকোর্ট, মনুমেন্ট, টেলিগ্রাফ, পোস্ট-অপিস, গোলদিঘির টোল, কলেজ ইস্ট্রিটের গোলামখানা, হোটেল, হাসপাতাল, এমনি সব বড়ো-বড়ো বাড়ির চুড়োয় বাসা বেঁধে সুখে আছে উচ্চে তারা। মানুষদের রাজত্বেও এই উঁচু-নিচু থাক-বেথাকের সৃষ্টি হয়ে পড়লে ক্রমশ ভারী গোলমাল মারামারি এমনকী রাজবিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটে। পক্ষীসমাজে তো একদিন এরূপটা চলা অসম্ভব। কতকগুলো পাখি খেয়ে খেয়ে মোটাবে আর দিব্যি আরামে ঘরকন্না করবে, আর কতকগুলো, তারা রাজ্যের ওঁচা সামগ্রী, তাও আবার আধপেটা খেয়ে দীনহীন অবস্থায় দিন গুজরান করবে এ তো হতে পারে না—ফলে দাঁড়াল, বাবুইয়ের দলে গোল বাধল। চড়াইরা মরিয়া হয়ে বললে, 'আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ যেমন করে পারি করে নেব, এতে যদি ঠোঁটের চোঁচ চালাতে হয় তাও আমরা চালাতে প্রস্তুত।' যদিও আমি নিজে বাবুই বটে তবু সত্যি বলতে হবে, চড়াইদের প্রস্তাবটা ভালোই। চড়াইরা দল বেঁধে মাস্‌চটকদের বাড়ির গলিতে এক চড়াইকে দলপতি করে এক বিরাট সভা ডেকে বসল। এই দলপতির স্বর্গীয় প্রপিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ তিতুমিরের কেল্লা দখলের সময় ইংরেজদের বিশেষ সাহায্য করে চতুরজি খেতাব পেয়েছিলেন। এই সভার বিবরণটা দিই শোনো—

সকালবেলা শহরের অলিতে-গলিতে যত চড়াই সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে টেলিগ্রাফ-আপিস, হাইকোর্ট, গ্র্যান্ড হোটেল এমনি সব বড়ো বড়ো জায়গা দখল করে বসল। প্রধান দল গিয়ে চারিদিকে যত

বড়ো গাছ ছোটো গাছ দখল করে ফেললে। শহরের লোক তো এই চড়াই পাখির ঝাঁক দেখে অবাক। বাবুইগুলো ভেবেই অস্থির, বুঝি-বা এবার অন্ন যায়। এই ভেবেই সব বাবুই একত্র হয়ে যা হয় একটা মিটমাটের চেষ্টায় আমাকে ডেকে দূত করে চড়াইদের সভায় পাঠালেন। আমার জীবনের সেই দিনটা আমার পক্ষে অতি গৌরবের দিন। সব চড়াই আর বাবুই যখন আমার মুখ চেয়ে বসে, সেই সময় আমি আপনাকে বড়ো ভাগ্যবান বলে ঠাওরালেম। যা হোক, দুই দলে মিলে যাতে একটা উপায় হয় তার ব্যবস্থার ভার আমাকে দিলেন। বড়ো বড়ো চড়াইদের আর বাবুইদের মধ্যস্থ হয়ে আমায় কাজ করতে হল। কী করে সব দিক রক্ষে হয়, তাই নিয়ে দু-পক্ষ থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল বাঁচা যায় কী করে, খাওয়া যায় কী করে, শহরের সব বড়ো বড়ো জায়গাগুলো কি বাবুইদের একচেটে থাকবে, না জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে চড়াই আর তাল-চড়াই দু-জনের মধ্যে জল-চলাচল হবে, আর তাই যদি হয় তবে কী নিয়মে ভবিষ্যতের সমাজবন্ধনটা করা সুবিধে—এমনি সব বড়ো বড়ো প্রশ্ন আমাকে মেটাতে অগ্রসর হতে হল। শেষে প্রশ্ন উঠল—মুড়ি-মিছরির এক দর হোক। এতে সব বাবুই আপত্তি করলেন, 'আমরা শহরে থাকি—এ হলে সব চিনি বাইরে যাবে। একে তো শহরের আবহাওয়া ফাঁকার মতো ভালো নয়, তার উপর মিছরি না পেলে আমরা কী সুখে বাঁচি? চড়াই তাঁরা পাড়াগাঁয়ে থাকেন—কিড়িং ফড়িং যথেষ্ট, সেখানে মুদির দোকানের মুড়ি-মুড়কিও প্রচুর, তার উপর ফাঁকা হাওয়া যথেষ্ট—এ আবদার করা তাঁদের অন্যায়, এতে আমরা কিছুতেই রাজি হব না!'

অমনি চড়াইয়ের দল ভয়ানক কিচিমিচি আরম্ভ করলেন, দুই দলে বকাবকি শুরু হল। মানুষরা হলে সেদিন একটা বিদ্রোহ আর রক্তপাত না হয়ে যেত না, কিন্তু পক্ষীসমাজে গোলমাল চ্যাঁচামেচি থেকেই ভালো ফলের উৎপত্তি ধরা যায়। হলও তাই, দুই দলে শেষে একত্র হয়ে আমাকে নানা জন্তু-সমাজের নিয়ম কানুন আচার-ব্যবহারগুলো বেশ করে খুঁটিয়ে দেখে আসতে পাঠালেন। আমি সেইদিনই কার্যের ভার নিয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেম। সমাজের কল্যাণের জন্যে কী না ত্যাগ করা যায়? তা ছাড়া কাজটা খুব সম্মানের কাজ, আর রোজগারও কিছু সেইসঙ্গে ছিল।

* * *

এখন দেশের জনসাধারণের সভায় আমি আমার সমাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট ক্রমশ দাখিল করব--প্রতি মাসে, 'বেণু' কাগজে; সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে রাজি হইয়াছেন, নিজ খরচায়।

(পিঁপড়েদের খুদে সমাজের সঠিক ইতিহাস)

এখন যেমন কলের জাহাজ উড়োজাহাজ হয়েছে, তখন এসব ছিল না—সদাগরের জাহাজ আর বোম্বেটে জাহাজই চলত বড়ো বড়ো পাল তুলে। আমি এরই একটা জাহাজের মাস্তুলে চড়ে পিঁপড়েদের খুদে শহরের দিকে রওনা হলেম, কালাপানি পার হয়ে। সিন্ধবাদ থেকে রবিনসন ক্রুশো যারাই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তাদেরই নানা বিপদ-আপদ ঘটেছে, আমাদেরও জাহাজ নানা বিপদ কাটিয়ে কখনো বোম্বেটেদের হাতে পড়ে, কখনো অসভ্যদের হাতে পড়ো-পড়ো হয়ে, কখনো জলের তলাকার পাহাড়ে ধাক্কা খেতে-খেতে প্রায় ফুটো হয়ে, একটা ঢাউস তিমি মাছের ন্যাজের ঝাপটা খেয়ে প্রায় কাত হয়ে, একটা বন্দরে ঢুকল। সেখানে একজন কাঠপিঁপড়ে বসে ছিলেন, তাঁর মুখে শুনলেম এইটেই পিপ্‌লা বন্দর এবং পিঁপড়েদের খুদে শহরও একটু আগেই আছে। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি দেখে আমি তাড়াতাড়ি

জাহাজের মাস্তুল ছেড়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে বাসা নিতে চললেম। গরমের দিনে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বৃষ্টি হয়ই না দেশটাতে, কালে-ভদ্রে এক-আধ দিন যদি দু-একটা শিল পড়ে তো লোকগুলো সে কটা জমা করে বরফজল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়।

পথে দেখলেম দলে দলে পিঁপড়ে, তারা কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ হাওয়া খেতে চলেছে, পুরুষদের সবাই আগাগোড়া কালো বনাতের কোট-প্যান্ট-হ্যাট আর বার্নিশ করা জুতো পরে। এই গরমে বনাতের কাপড় সয় কেমন করে এদের বুঝলেম না; আর এদের সবারই কি এক সাজ এক ঢং! মিশকালো মোটা বনাতের কাপড় পরা দেখে জানলেম এরা ডেঁয়ে পিঁপড়ে, জলে-স্থলে ঘাটে-মাঠে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় সব-সময়ে এরা ফিটফাট হয়ে চলাচল করছে—গোঁফের আগা থেকে পায়ের বুট পর্যন্ত কোথাও শাদা নেই, চকচক করছে কালো। আমার মনে হল বাইরেটায় এদের হয়তো যত চকমকানি ও কালোর বার্নিশ, ভিতরে হয়তো নেহাত সাদা এরা। এই-না ভেবে একটা পিঁপড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধোলেম, 'আচ্ছা, যদি তুমি এতটা ফিটফাট হয়ে না বেড়াও, কিংবা সাদাসিদে এই আমার মতো ধুতি-চাদরে বেশ বাবু সাজো তো পিঁপড়েসমাজে তোমার কি মানের হানি হবে?' পিঁপড়েটা আমার কথার জবাবই দিলে না, গোম্‌সা মুখে গটগট করে অত্যন্ত রাগত ভাবে চলে গেল। পরে জানলুম কেউ মাঝে পড়ে আলাপ-পরিচয় না করিয়ে দিলে এরা কারুর সঙ্গে কথা বলা বেদস্তুর মনে করে ভারী চটে।

থাকতে থাকতে প্রবালদ্বীপের ইন্দ্রগোপ কীটের সঙ্গে আমার আলাপ হল। লাল মূর্তি, মস্ত গোঁফ—তিনি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এক পলা রাজত্বের পন দিচ্ছিলেন, এমন সময় মাছ ধরার জাহাজে করে পিঁপড়েরা ফৌজ পাঠিয়ে তাঁকে বন্দি করে এনেছে। তাঁরই মুখে পিঁপড়েদের রাজত্বের অনেক খবর পেয়েছি। তিনিই বললেন, পিঁপড়েদের রাজা তাঁর প্রজাদের হুকুম দিয়েছেন, যেখানে যত প্রবালদ্বীপ সাত সমুদ্র তেরো নদীর মধ্যে দেখা দেবে সেগুলোকে পিঁপড়ের রাজ্যের শামিল করে নিয়ে এক-একটা উপনিবেশ বসাতে। এটা অতি গোপনীয় খবর—সুতরাং কাউকে যেন বলা না হয়।

বন্দর থেকে একটু যেই পা বাড়ানো, অমনি একদল নতুন ধরনের পিঁপড়ে আমাকে এসে ঘেরাও করলে। শুনলুম তারা কাস্টম পিপীলিকা। তাদের কাজ—যে-কেউ এদেশে পা দেবে তাকে কষ্ট ভোগানো—পোঁটলা-পুঁটলি খুলে দেখা, চোরাই-মাল কিংবা আর কিছু লুকিয়ে বিক্রি করতে এখানে আসছে কি না এরই তদারক করতে গিয়ে এটা-ওটা হারিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে পোরা এবং শেষে আবার যার জিনিস তাকেই মাল সরিয়ে ফেলার দরুন দণ্ড করা ও নানা ভোগ-ভোগানো কাজে বেশ মোটা মাইনে পাচ্ছে এরা। এই দেশের এরা নিজেদের ছাড়া জগৎসুদ্ধুকে কী চোখে দেখে তা এদের দেশে পা দেবামাত্র বুঝলেম। সব দেখেশুনে যখন কোনো চোরাই মাল এরা আমার পালঙ্কে তোশকের মধ্যে কিংবা ডানার ভাঁজে কোথাও খুঁজে পেলে না, তখন এরা জোর করে আমার দুই ঠোঁট চিরে দেখতে লাগল দূরবিন দিয়ে—গলার মধ্যে করে এদের দেশে আমি লুকিয়ে কিছু আমদানি করেছি কি না। যখন দেখলে আমি খালি চড়াই বই আর কিছু নই, তখন এরা বেশ কিছু ঘুষ নিয়ে আমাকে তাদের খুদে শহরে যাবার হুকুম দিয়ে ছেড়ে দিলে। শ্বেতকাকের কথা শুনে পিঁপড়ের দেশ দেখতে এসে প্রথমটাতেই বড়ো জ্বালাতন হতে হয়েছিল।

দেখলেম, এরা রাজারাজড়া থেকে কুলিমজুর পর্যন্ত খেটে খেটে মরে শখ করে; বাবুয়ানার দিক দিয়ে যেতেই চায় না। এদের দেশে শখের জিনিস যথেষ্ট—ভালো ফল-ফুল সবই আছে, কিন্তু নিজেরা এরা

সেগুলো ভোগ করতে চায় না একেবারেই। যেদিকে যাই, দেখি দলে দলে পিঁপড়ে মালপত্তর রসদ পিঠে করে নামাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। মিস্ত্রি-মজুর তারা মাটির নীচে সব সুড়ঙ্গ চালিয়ে পথ করে দিচ্ছে। পৃথিবীর উপরকার ভার কমাতে সবাই এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখেও দেখলে না।

দেখলেম, এদের মধ্যে একদল আছে তারা দালাল পিঁপড়ে। তারা কোথায় কী মাল আছে তার সন্ধানেই ফিরছে। আর-এক দল, তারা যেখানে যা পাচ্ছে, কুড়িয়ে নিয়ে জমা করছে। অন্য দল তারা খুব লুকোনো জিনিস তারই সন্ধানে গিয়ে রাতারাতি, এমনকী দিনে ডাকাতিও করে আসতে ছাড়বে না। এরা নুন ছোঁয় না—কাজেই নিমকহারামি বলে একটা কথা নেই এদের অভিধানে। মুখমিষ্টি-জাত বলে এরা জগদ্‌বিখ্যাত। চিনি কিংবা চিনি না, এই দুটো কথা এরা ভারী মান্য করে। তাই যাকে চিনি না বলে মনে করে এরা, চেনাচিনি হলেও ফস করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। এতে করে জগৎসুদ্ধুই এদের কাছে অপরিচিত; এক চিনির পুতুলগুলিকেই এরা একটু খাতির করে চলে।

এদের ধর্ম আমি যা দেখলেম তাতে এদের ঘোরতর পৌত্তলিক বলতে হয়। এরা ঘরে ঘরে এক-একটা লোহার সিন্দুকের আকারে ছোটো-বড়ো মন্দির খাড়া করে সেখানে সোনা-রুপো কোম্পানির কাগজের সিংহাসনে চিনির শেয়ার বলে একটা হাজার হাত মূর্তির পুজো দেয় কেবলই। এই দেবতা কখনো এদের ভক্তিতে বিগলিত হন। তখন মুশকিলে পড়ে পিঁপড়েরা। ভক্তিতে আটকা পড়ে পালাতে পারে না, চিনির সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মারা যায়।

এই দেবতার আর-এক নাম হচ্ছে 'বাত্‌-আশা'। ঠিক বলতে পারিনে এটার কী অর্থ, শব্দকল্পদ্রুমে লিখেছে যে 'বাত্‌' অর্থে মুখের কথা এবং 'আশা' কী, না আশা। এই থেকে একথার উৎপত্তি।

এইসব ব্যাপার দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি কতকগুলি পিঁপড়ে পালক নেড়ে যেন উড়ে উড়ে চলেছে। একটা পাহারাওয়ালা পিঁপড়েকে শুধোলেম, 'এরা সব দেখি কাজকর্ম করছে, আর ওরা জমকালো চারখানা পালকের ধড়াচুড়ো এঁটে নিষ্কর্মার মতো রয়েছে কেন?' পাহারাওয়ালা বললে, 'এঁরা হচ্ছেন দেশের আমির-ওমরা, নেতা-অধিনেতা, অধিরাজ,—রাজা-মহারাজাও বললে চলে; খুব পুরনো বংশের ঘুণপিঁপড়ে এঁরা।' আমি আবার শুধোলেম, 'ঘুণপিঁপড়ে কাকে বলে?' পাহারাওয়ালা বললে, 'এঁরা হলেন দেশের মাথা, আজন্ম এঁরা পালকের গদি আর পালকের সাজসজ্জা করে থাকেন। সুয্যির আলো না দেখা দিলে ঘর থেকে বেরোন না, পাছে ভিজে আর চকমক না করে। আঃ! এঁরা বড়ো আরামেই থাকেন, এক দুঃখ—এঁদের অকাজে দিনগুলো কাটাতে-কাটাতে এমন অরুচি হয় যে ভেবেই পান না কী নিয়ে বেঁচে থাকেন। কেবলই তখন শুনি এরা বলেন—দিন যে যায় না কী করি!'

এইসব পালকের গদিতে গদিয়ান ওড়ম্বা পিঁপড়ের বিষয়ে একটু জানবার ইচ্ছে হল আমার। কেন না দেখলেম এরা যেন একটু শৌখিন গোছের এবং বাবু-কছমের, কিন্তু খবর নিয়ে জানলেম এদের ঘরে এরা কিছুই জমা করে না; দোকানঘরের উপরে একটু বাসাটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে এরা থাকে কাচ্চাবাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে। কোনোকিছুতে এদের মন নেই, কেবল কতকগুলো ওড়ম্বার দলে ঘুরে ঘুরে মরে এরা। এদের বুদ্ধি না-মোটা, না-সূক্ষ্ম, কেমন একটা বেঢক গোছের। নিষ্কর্মার ধাড়ি বলে এদের সবাই জানে।

আমাদের কথা হচ্ছে, এমন সময় এক পালক-ওঠা পিঁপড়ে সেইদিক দিয়ে চলে গেল; পাহারাওয়ালা আর মিস্ত্রি-মজুর পিঁপড়েগুলো দু-ধারে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। পিঁপড়ের রাজত্বে দেখছি সচরাচর

পিঁপড়েগুলো অত্যন্ত গরিব, জমিজমা যা কিছু সবই ওই পালক-ওঠা পিঁপড়েগুলোই দখল করে বেশ ছোটোখাটো এক-একটি পাহাড়ের মতো পিঁপড়ের টিবি বানিয়ে সুখে আছে! এইসব শৌখিন পিঁপড়েদের জন্যে দেখলেম, বড়ো-বড়ো বাগানে সব পালে-পালে মাছি পোষা রয়েছে তারা সেগুলোকে মাঝে মাঝে শিকার করে—আমোদও পায়, পেটও ভরায়। গরিব পিঁপড়েরা দেখলেম তাদের রাজ্যের ছানাপোনাগুলির ভারী আদর-যত্ন করে থাকে। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষার খুব ভালো বন্দোবস্ত করেছে দেখলেম। আর আমার মনে হয় এইজন্যেই পিঁপড়ে-জাত এত বড়ো হয়েছে। এক-একটি বাড়িতে দেখলেম ছেলের পাল—ষষ্ঠীতলার ষেটের বাছার দল তারা।

এক ধারে দাঁড়িয়ে আমি এসব চিন্তা করছি, এমন সময় এক জাঁদরেলগোছের পিঁপড়ে দেখলেম একটা ঢিপির উপরে উঠে হাত-পা নেড়ে আর পাঁচজনকে কী হুকুম দিলেন—অমনি দেখলেম দলে-দলে পিঁপড়ে-ফৌজ কেল্লা ছেড়ে খড়কুটো, পাতার ভেলা ভাসিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলল। শুনলুম কোথায় একটা লড়ায়ে এদের হার হবার জোগাড় হচ্ছে তাই আরও সৈন্য সেখানে যাচ্ছে; দুই জাঁদরেল পিঁপড়েতে কথা হচ্ছে দেখে আমি কান পেতে শুনে খবর পেলুম, কোন এক দেশের ছারপোকারা নাকি কতকালের উই-ধরা পুরনো একটা রাজতক্তের তলায় সুখে অনেক কাল বাস করছিল আশি যুগের রাজাদের গায়ের রক্ত খেয়ে খেয়ে। সেই অপরাধে নাকি খটমল দেশটাকে উজোড় করে দিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই এরা অগ্রসর হচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে জাঁদরেলদের বললুম, 'খটমল দেশের গোটাকতক ছারপোকাকে শাসন করতে গিয়ে আপনাদের একে তো যথেষ্ট খরচ হবে, তা ছাড়া সেখানে বনেজঙ্গলে কষ্ট পেয়ে অনেক পিঁপড়ে মারাও যেতে পারে।'

তাঁরা দু-জনেই বললেন, 'বিশ্বের কল্যাণের ভার যখন আমরা নিয়েছি তখন কিছু তো ত্যাগ স্বীকার করা চাই, তা ছাড়া আমাদের সৈন্যগুলো নিষ্কর্মা থেকে থেকে ক্রমে লড়াই করা ভুলেই যাচ্ছে। আর খটমল দেশটাও শুনেছি খুব বড়ো দেশ— সেখানে ছারপোকাগুলোর রক্তেও অনেক চিনি আছে। শুষে নিতে পারলে বেশ আয় আদায়ের সম্ভাবনা। এই লড়াইটাতে যত খরচ তার দশগুণ লাভ নিশ্চয়ই আমরা করে নিতে পারব।'

আমি এখন খটমল দেশটাকে একবার দেখে নেবার আশায় জাঁদরেলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে বিনা ভাড়াতে যুদ্ধজাহাজে চড়ে খটমল রাজত্বের দিকে চলে গেলেম।

জাহাজ তো নয়! দেখলেম যেন একটা কেল্লা। পল্টনে ঠাসা, বারুদ গোলাগুলি আর বন্দুকে ভরতি। দেখে আমার ভয় হল, যদি এক ফুলকি আগুন কোনোরকমে লাগে তো রক্ষে নেই। ভয় হল, এ জাহাজে চড়ে পড়াটা ভালো হল কি না। ভাবছি, এমন সময় লালমোহনের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর 'কঞ্চি' কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা হয়ে খটমল দেশে চলেছেন একটা লাল খাতা হাতে।

এক যাত্রায় পৃথক ফল ভালো নয়—এটা শাস্ত্রের কথা, কিন্তু আমার মনে হল যে দু-জনে একই কাজে খটমল দেশে না গিয়ে তিনি যান এই বারুদ-ঠাসা জাহাজটায় সেখানে, আর আমি চলি পথের মাঝে যে মৌচাক-রাজত্বটা আছে মধুবনে, সেখানের খবরাখবর আনতে। তা ছাড়া দেখলেম লাল পল্টনের একটা কাপ্তেনের সঙ্গে লালমোহনের মোহনবাগান ক্লাবে ভাবসাব আছে। কথাও কয় লালমোহন ওদের ভাষায় আমার চেয়ে ভালো। সুতরাং খটমল দেশের ভার তাকে দিয়ে আমি যুদ্ধজাহাজ ছেড়ে 'মধুকর' বলে একটা দেশি কোম্পানির ইস্টিম-জাহাজে মৌচাকপুরের দিকে চলে গেলেম।

(মৌমাছিদের রাজতন্ত্র)

মৌমাছিদের রাজতন্ত্র সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং থিসিস লিখতে হবে জেনেই আমি আমাদের তালতলির লাইব্রেরি থেকে তালপাতায় এবং ছাপা কাগজে ইস্তক নাগাত মৌমাছি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সংগ্রহ করে বেরিয়েছিলেম মৌচাকপুরের তথ্য সংগ্রহ করে আনতে, সরেজমিনে original research করাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিধাতার চক্রে উইপোকার উৎপাতে তালপাতার পুথি ও ছাপা বই সমস্তই এক রাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল স্বচক্ষে দেখে যা পারি তাই নোট করে পাঠালেম—এ ছাড়া আর-একটা দুর্ঘটনা ঘটল তাও বলি—

মৌচাকপুরে খবরের কাগজ নেই, ভৃঙ্গদূত আছে। তারাই মুখে দেশ-বিদেশের খবর নিয়ে আসে। মধু-মোদকের দোকানঘরই হল এখানের পোস্ট-অফিস, সেখানে মিষ্টি মিষ্টি কথায় গুনগুন করে শুনিয়ে চলে খবর ভৃঙ্গদূতেরা একে-একে। দেশের খবর অনেকদিন পাইনি কাজেই মৌচাকপুরে পৌঁছেই ছুটলেম মধু-মোদকের আড্ডায়। সেখানে চায়ের বদলে মধু আর মোমাই রুটি খেয়ে বসে গেলেম দেশের খবর নিতে।

আহমদাবাদ জলে ভেসেছে, দামোদরের বাঁধ ভাঙে ভাঙে, চৌরঙ্গির ব্রজনাথকে পুলিশ রাতারাতি সিংহাসনচ্যুত করেছে, জেন্তসভার অনুকরণে কলকাতায় এক দল একটা সভা খুলে বসে পুরনো ঘি জমি থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় অজস্র অর্থ ব্যয় করেছে— শোনা যাচ্ছে সেই ঘিয়ে তারা নতুনরকম মৃতসঞ্জীবনী ওষুধ বানিয়ে মানুষকে অমর করবে এই মতলব। কথাটা শুনে চিন্তা উপস্থিত হল, ঠিক সেইসময় ভ্রমর দূত এসে খবর দিলে তালবনিতে বিষম কাণ্ড হয়ে গেছে, একটা মানুষ তালগাছে চড়ে বাবুই পাখির যে কটা বাসা এবং সংসার ছিল একরাত্রে কাচ্চাবাচ্চা সমেত লুট করে পালিয়েছে, চিহ্নমাত্র নেই বাবুই পাখির।

আমি এই খবর শুনে তখনই বিশেষ সংবাদদাতা একজনকে পাঠালেম জেন্তসভায়, পুনরায় সংসার পাতবার জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে। কিন্তু জেন্তসভা বললেন আমাকে রিলিফ কমিটিতে আবেদন করতে, রিলিফ কমিটি বললেন কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব আনতে। এমনি ঘোরাঘুরিতে হয়রান হয়ে আমি কর্ম পরিত্যাগ করে নতুন চাকরির সন্ধানে দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং জেন্তসভার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছি ও কবিতা লিখতে অগ্রসর হয়েছি। কথিত সম্পাদকের কাছে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করব বলে ইচ্ছা ছিল কিন্তু মৌমাছি সম্বন্ধে মানুষ এত লিখেছে যে, তার তর্জমা দিয়ে কোনো লাভ দেখি না সুতরাং এবার থেকে original কবিতাই দেব। লেখা ও সুর সবই original এবং বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রণ হইবে না জানিবেন। পুষ্পবনের মধ্যে মক্ষীরানি মোমতাজ মহল বানিয়ে বাস করেন, রানি মক্ষী মোমের পুতুলি; ইনি অতি বুদ্ধিমতি; মৌচাকে মধু জমা করতে এঁর মতো দুটি নেই। তা ছাড়া বাদলা দিনের আগেই ইনি সাবধান হতে জানেন, আর বিদেশেও ইনি কতক-কতক মধু জমা করেছেন।

এক নবাবপুত্তুর মধুপুর থেকে একটি মধুমুখী কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তিনি এসে মধু-মোদকের দোকানে খবর চাইলেন, বিয়ের যুগ্যি কোনো রাজকন্যে এখানে পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। মুদি তাঁকে সেলাম ঠুকে বললে, 'কুমারবাহাদুর, আমাদের রানির এক মেয়ের বিয়ের উদ্যুগ হচ্ছে যে—যান, যদি ঘটকালি করে সম্বন্ধ করতে চান তো এইবেলা। আপনাকে দেখতে-শুনতে ভালো, গায়ের জামাগুলো নতুন হলেই বেশ বর-বর দেখাবে।'

এদের রাজকন্যের বিয়ের ধুমধামটাও আমার দেখার সুবিধে হয়ে গেল। কালো আর হলদে কাপড়

পরে আটজন বাদ্যিকর মক্ষীরানি পুরনো বাড়ি মোমতাজপুর ছেড়ে বার হল। এদের পিছনে আর পঞ্চাশজন গড়ের বাদ্যি-বাজিয়ে; এমন তাদের সাজ ঝকঝকে, মনে হল যেন হিরে-মানিক জ্যান্ত হয়ে বেরিয়েছে। তারপর এল মাথাটার হুল আর শূল উঁচিয়ে বরকন্দাজ-মাছি, তারা প্রায় দুশো হবে—কাতারে কাতারে বার হল—আগে আগে তাদের পরদার বুকে মোম্‌তাজপুরের একটা মোমের তক্‌মা ঝুলিয়ে। তারপর সব রানির ঝাড়ুদার, আগে আগে ঝাঁটার কাঠির ঝাড় উঁচু করে তাদের জমাদার। তারপর এল খড়কেধারি, আর বাসনমাজুনি সঙ্গে আট খুদি দাসী, কেউ মধুর বাটি কেউ খড়কে কেউ পান কেউ চিনি এমনি সব নানা সওগাত বয়ে; তারপর এলেন রানির প্রিয় দাসী তসরের কাপড় মসমস করে, সঙ্গে বারোজন ছোটো-বড়ো সেবাদাসী; সবশেষে বার হলেন কন্যে জরি কিংখাপের ওড়নায় সেজে—এই ওড়না কেবল শোভার জন্যে, ওড়বার কাজে কোনোদিন লাগবে না। কন্যার পাশে দেখলেম তার মা মক্ষীরানি, মোটাসোটা, আগাগোড়া মখমলে আর হিরের টুকরোয় সাজানো, রানির পিছনে পিছনে একদল মধুকর বিয়ে উপলক্ষে বাঁধা গান গাইতে গাইতে চলেছে ঐকতান বাদ্যির সঙ্গে। তারপরেই বারোজন বুড়ো মাছি গুনগুন করে মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে বেরিয়ে এল। এরাই হল আচার্যি, পুরিৎ, ঘটক, এমনি সব। রানি এসে বাইরে দাঁড়াতেই দশ-বারো হাজার মাছি তাকে ঘিরে দাঁড়াল, রানি তাদের একটা বক্তৃতা শোনালেন, 'প্রজাগণ, তোমাদের যখনই উড়তে দেখি তখনই আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। কেন না, তোমাদের ওড়া মানে এই মোমতাজপুরে দেশ-বিদেশের মধু ক্রমে জড়ো হওয়া ও রাজসংসারের সুখশান্তি বৃদ্ধি পাওয়া। প্রজাপতিও ওড়ে বটে—' এই সময় এক বুড়ো আচার্যি, বিয়ে উপলক্ষে প্রজাপতির সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে রাজোচিত কাজ হবে না—কানে-কানে বলে দিলে রানি সামলে নিয়ে বললেন, 'প্রজাপতিকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এই পৃথিবীকে মধুভরা ফুল দিয়ে ছেয়ে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস মোমতাজপুরের প্রজারা অপব্যয় না করে সেই মধু এই রাজদরবারের কল্যাণসাধনের জন্যই জমা করবেন আর সেই কল্যাণের ফলে প্রজাপতির আশীর্বাদ লাভ করে সুখে থাকবেন। তোমরা রানির কল্যাণ করতে কোনোদিন ভুলো না—কীসে তাঁর আয় বৃদ্ধি, মান বৃদ্ধি, ও সুখসমৃদ্ধি বাড়ে তারই চিন্তা যেন সর্বদা তোমাদের ব্যস্ত রাখে আর একথাও তোমাদের ভুললে চলবে না যে মোমতাজপুরের রাজত্বটা তোমাদের অচল রাজভক্তির উপরেই অটল থাকতে পারে।

'ধর্ম এবং রানি এই দুয়ের জন্যে প্রাণ না দিলে তোমাদের রাজ্য একদিনও বাঁচতে পারবে না এটা নিশ্চয়। রানির চলবে না তোমাদের ছাড়া, তোমাদেরও চলবে না রানি না হলে, সেই বুঝেই আমি আমার এই মোমের পুতুলি মেয়েটিকে তোমাদেব রানি করে দিলেম, এঁকে তোমরা যত্নে রাখো সুখে রাখো এই আমার ইচ্ছে।'

রানির বক্তৃতা শুনে প্রজা-মৌমাছি সব আনন্দধ্বনি ধরতে লাগল। নতুন রানি সমবয়সি মৌমাছিদের সঙ্গে একদিকে আমোদ-আহ্লাদ করতে চলে গেলে পর নবাবপুত্তুর বুড়ো-রানির কাছে গিয়ে বললে, 'রানিমা, প্রজাপতি আমাকে মধু সংগ্রহ করবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই দেননি। কিন্তু আমি বেশ গুছিয়ে সংসার করতে মজবুত। যদি অল্পসল্প যৌতুক আর দানসামগ্রী দিয়ে কোনো একটা কালো কোলো মেয়েকে পার করবার ইচ্ছে থাকে তবে আমি খুশি হয়ে তাকে নিতে রাজি আছি। আর—'

রানির প্রিয় সখী তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'রাজকুমার, তুমি জানো না—এদেশের রানির সোয়ামির কপাল বড়ই মন্দ হয়। তাকে এরা একটা উৎপাত বলেই মনে করে আর সেইজন্যে আদর-যত্ন

করে না, রাজকার্যে তার কোনো কথা চলে না এবং কতকটা বয়সের বেশি আমরা তাকে কিছুতে বাঁচতে দিইনে। কাজেই ভেবে দেখো এদেশের রানির জামাই হতে চাও কি না।'

বুড়ো-রানি বলে উঠলেন, 'কোনো ভয় নেই, আমি তোমার পক্ষে রইলেম, তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি দেখছি বড়ো ঘরের ছেলে, আর তোমার মন যখন হয়েছে তখন আমার এক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, তুমি আমার রাজত্বে ভালোই করবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এসো।'

যত নবাব একেবারে নির্বুদ্ধি ছিল না। সে বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যার প্রেমে পড়ে গেল। অজানা মৌমাছি সে কোন দেশ থেকে উড়ে এসে সুন্দরী মক্ষীরানির কন্যের রূপের আলোর মধ্যে ঘুরে-ফিরে কন্যের সঙ্গে এক ফুলে মধু খেয়ে ছায়ার মতো তার পিছে পিছে ফিরে শেষে তার হৃদয়টি অধিকার করে নিলে। মৌমাছির প্রেমের এই বিচিত্র ইতিহাস মনে করলেও এখন আমার নিজের বিয়ের দিনগুলি যেন চোখের সামনে উদয় হয়। আমার মনে হয় মৌমাছি আর মানুষের ভালোবাসার তত্ত্বটা তলিয়ে দেখার জন্যে পশুসমাজ থেকে একটা বিশেষ কমিশন বসানো দরকার।

আপনারা শুনে সুখী হবেন, আমার নাম এদেশে এমন প্রচার হয়েছে যে, রানির ওখান থেকে আমার জন্যে একটা বিশেষ মজলিশের নিমন্ত্রণ চারিদিকে পাঠানো হয়েছে। কার্ডে লেখা হয়েছে— সম্ভ্রান্ত বিদেশিকে অভ্যর্থনার জন্য রানির হুকুমে সকলে এরা মধুপানাদি করবে। যা হোক, রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি— দরবারের দেউড়িতে জনকতক হোমরা-চোমরা মাছি এসে আমাকে বেশ করে দেখে শুঁকে স্থির করে নিলে এমন কোনো বিদেশি গন্ধ আমার ভিতরে-বাইরে আছে কি না যাতে করে সভাটা নোংরা হতে পারে।

আমাকে খরচ করে তারা সভায় হাজির করলে পর মৌচাকেশ্বরী এসে এক ফুলের সিংহাসনে বসলেন, আমি নমস্কার করে বললেম, মহারানি, আমি একজন বাবুই দর্শনসভার প্রধান সদস্য। জেন্তসভার পক্ষ থেকে নানা রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের হিসেব-জোগাড়ে নিযুক্ত হয়ে বেরিয়েছি।' মহারানি হেসে বললেন, 'আপনি অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার দিন কাটানো ভার হত যদি না রাজকাজ থেকে বছরে দু-বার করে আমাকে ছুটি নিতে না হত। আমাকে মহারানি বলবার কোনো আবশ্যক নেই, রাজনন্দিনী কিংবা মক্ষী বললেই আমি খুশি হব।'

আমি বললেম, 'রাজনন্দিনী, এদেশে দেখলেম আপনারা প্রজারা চাকরের মতো কেবলই খাটছে আর আপনি বেশ আরামে রয়েছেন। এই বড়ো-ছোটো ভেদটা কি ভালো?'

রানি বললেন, 'তা তো বুঝি। কিন্তু রাজ-আইনটা এইরকমই যখন, তখন সেটা মানাই হচ্ছে প্রজার ধর্ম। না হলে রাজা-প্রজা সম্পর্কই উঠে যায়, রাজত্বই থাকে না।'

আমি বললেম, 'এতে দেখছি আপনার প্রজার খাটুনিই সার। লাভটা আপনারই।'

রানি বললেন, 'এ ছাড়া আর কী হতে পারে। রাজা, রাজত্ব, রাজতন্ত্র সবই যখন আমি, তখন প্রজারা আমাকে না রাখলে এর একটাও পাবে না। অন্য দেশে কেমন জানিনে কিন্তু আমার রাজত্বের ব্যবস্থা আর আইন দুয়ের দ্বারাই সবাই দেখো সুখে রয়েছে। মৌমাছিদের একটা রানি থাকার সুবিধে— আর পিঁপড়েদের দেখো রানি নেই, হাজার আমির— তাদের যেমন খুশি চালাচ্ছে।'

আমি রানিকে রাজা-প্রজা উঁচু-নিচু থাকার অসুবিধেগুলো কী তাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করামাত্র রানি বললেন, 'তবে এখন বিদায়, প্রজাপতি আপনাকে শুভবুদ্ধি দিন, সত্যের আলো পাঠান সবার জন্যে।' আমি

তাড়াতাড়ি শুধোলেম, 'আচ্ছা এত মধু চাকে জমা করে আপনাদের কী লাভটা হচ্ছে? কোনোদিন এ মধু তো আপনাদের কারু কাজে আসবে না। মানুষ একদিন তো চাক ভেঙে সবই লুট করে নিয়ে যাবে—হুলও মানবে না, কামড়ও গ্রাহ্য করবে না। এটা তো আপনার প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত রানি হয়ে।'

রানি রেগে বললেন, 'চুপ! চুপ! এসব শুনলে প্রজাদের মাথা বিগড়ে যেতে পারে!' বলেই রানি বোঁ করে উড়ে পালালেন।

আমি থতমত খেয়ে মাথা চুলকে চলে যাব, এমন সময় আমার মাথা থেকে একটা উকুন লাফিয়ে পড়ে আমায় নমস্কার করে বললে, 'মশায়, আমি এক নেকড়ে বাঘের পিঠে চড়ে এখানে হাজির হয়েছি। এতক্ষণ আপনার কানের কাছে বসে আপনার মাথা থেকে যেসব উপদেশপূর্ণ কথা বেরিয়ে রানিকে চমকে দিয়েছে সেগুলো হজম করবার চেষ্টা করছিলেম। আপনার মনোমতো রাজ্য-সমাজ যদি কোথাও দেখতে চান তো পূর্বস্থলীতে চলুন। আপনি দেখবেন নেকড়ে বাঘের রাজতন্ত্র ঠিক আপনার কল্পনার সঙ্গে মিলে যাবে। নেকড়ে বাঘ পায়ে পায়ে যায় সত্যি কিন্তু এ পর্যন্ত তারা পাখি খেতে শেখেনি। কাজেই সে-দেশে যাওয়াতে আপনার কোনো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বরং উলটে তারা আপনাকে মাথায় রাখতেও প্রস্তুত। সুতরাং কিছুমাত্র সংকোচ না করে আজই সেখানে রওনা হন।' এই বলে উকুন সরে পড়ল।

সংসারটা ছারখারে যাওয়াতে আমি যতটা না মর্মাহত হয়েছিলেম, জেন্তসভা নতুন সংসার পাতবার সাহায্য না করতে চার চতুর্গুণ বেদনা বাজল আমাকে। কাজেই আমি সব ছেড়ে মাছিক সাহিত্যজগতে কিছু দান করে যাবার জন্যে কৃতসংকল্প হয়ে বেণুবনে বাসা নিয়েছি!

মৌচাকপুরে রাজকন্যার বিয়েতে যেদিন তুবড়ি-ফুলঝুরি পোড়ে, সেদিন আমি একটা গান বেঁধে বরকন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেম। সুর ও কথা দুই-ই নিজের কল্পিত। কোনো বাবুই এর পূর্বে এটা রচনা করেননি। আপনারা না বিশ্বাস করতে পারেন, মৌচাকপুরে একটা লতাকুঞ্জে বসে ছোটো একটা ফুলঝুরির আলো জ্বেলে, সেটা নেভবার পূর্বেই রচনা সাঙ্গ করেছিলেম! এবং মৌচাকপুরের তরুণ সাহিত্যিকের দলে এই রচনা বেশ একটু ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল। এবং ভিতরে ভিতরে 'বোলতাই' কাগজে গোপনে সমালোচনা ছাপিয়ে আমাকে অপদস্থ করবারও চেষ্টায় ত্রুটি করেনি।

কিন্তু আমাদের পূর্বপরিচিত মধু-মোদক খুশি হয়ে এক ভাঁড় মধু অমনি পাঠিয়ে দিয়েছে, কলাপাতার মোড়কে নিজের একটি কবিতার সঙ্গে। কবিতাটি দেখি আমা থেকেই চুরি। কাজেই এটা আমার নামেই ছাপালেম।

সুর মৌ মল্লার

বাজির ধুমেধামে
　　বাদর ঝরে না।
মরমর চাতকে
　　রাখে পিয়াসী
　　বারহ মাস-ই।
তুবড়ি ফুলে ভরি
　　আনে না মধু,

জানে তো মধুপাই মৌমাছি—
বাদলা পোকারাই
বলে উড়ে উড়ে—
মধুমাস এল কাছাকাছি!
চলে যায় হাউই
আঁকতে-বাঁকতে
সাপের মাথার মণি কাড়তে
লুকোনো মানিক তারকাপুরে
থাকেই লুকোনো—
হাউই ফেরে শুধু
মুখটা পুড়োনো।
বলছে চরকি—
ঘুরবে মস্ত
ভূমণ্ডলে উদয় অস্ত!
জাঁতাটা ঘুরিয়েই
হয় সে কুপোকাত,
একটি পা-ও চলে না—
(কোরাস) নানানা—নানানা—তানানা!
ভুঁই পটোবা
বাজাতে মৃদং
মাটিতে মাথা ঠুকছে হরদম।
মৃদঙ্গের কিছুই বাজছে না—
(কোরাস) নানানা—তানানা—নান ·'!
দোদমা চাইলে
পেটাব দামামা—
সুরে বলতেই
সারে-গা-ধাপামা—
নিজেই ফেটে
হয় চৌচির!
করে কা· বধির—
জান বাহির।*

* এই গানের স্বরলিপি দিবার প্রয়োজন দেখি না। কেন না গানের সুর ও কথা এমন নিপুণভাবে রচিত যে, সকল কণ্ঠেই ইহা সকলপ্রকার সুরে-বেসুরে গাহিয়া গেলেও শ্রুতিকটু ঠেকিবে না। —ইতি সম্পাদক, 'বেণু'।

হারজিত

(কথিকা)

ছবিওয়ালা কবিওয়ালা আর খবরওয়ালা পুজোর সময় সেবার এল রাঁচিতে। উত্তরের বারান্ডায় তিনে মিলে কথাবার্তা চলে — ছবিতে কবিতায় এবং পলিটিকসের খবরে জড়াজড়ি। ছবি বলে — দেখোদেখো। ধান-খেতে সবুজ লেগেছে, দূর পাহাড়ে নীল আভা, আকাশে আলোর খেলা—তার মাঝে ওই কালো মেয়ে! কবি বলেন — তুমি দেখো, আমি শুনি — বাতাস বলে যাই-যাই, মেঘ বলে আসি-আসি। ছবি বলে, দেখো দেখো জল চলে, দুলে চলে, বেঁকে চলে। কবি বলে, শোনো শোনো—পাখি কী বলে, মাঠেঘাটে বাঁশি বাজে! ছবি বলে — কী সুন্দর কালো ওই মেয়েটি! কবি বলে নীল আকাশ কী মিঠে সুরই দিচ্ছে! খবরের কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে খব্‌রি বলে — ওহে পড়ে দেখো খবরটা! কবি আর ছবির চমক ভেঙে যায়। খব্‌রি পড়ে চলেন বিশ্বের খবর, তর্কের ঝড় ওঠে চায়ের পেয়ালার উপর। বাইরের রোদ বারান্ডায় কখন আসে, কাছে বসে তর্ক শুনে চলে যায় আপন কাজে। ছবি থেকে যায় আধ-লেখা, কবিতা থাকে অসমাপ্ত, তর্কও শেষ হয় না। বারোটা বাজে ভাত খেতে।

দুপুরবেলা একটি ঘরে বসে দেখি রোদে পোড়া মাঠে কালো মেয়ে খেতে খেতে কাজ করে চলেছে। ওঘরে শুনি কবি গুনগুন করে গাইছে। আর, আর খব্‌রি? সে খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। খব্‌রি বিশ্বের খবর হজম করতে চায়, তাই তার ঘুমোনো চাই। আর কবি-ছবি এরা ওই মাঠঘাটটুকুর মধ্যে যেটুকু খবর আসা-যাওয়া করছে টুকরো টুকরো ভাবে, তাকেই ধরে রাখতে জেগে বসে আছে। আর ওই কালো মেয়েটা — সে কী অর্জন করছে সব তুচ্ছ ক্ষণিকের জিনিস সারাদিন খেটে খেটে তাই ভাবছে ছবি আর কবি।

বৈকালে খব্‌রি চলে ইস্‌টিসানের দিকে রিডিংরুমে আবার খবর জানতে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে— দেশের খবর দশের খবর, সহযোগী সাহিত্যের অসহযোগী মানুষদের সঠিক খবর। ছবি চলে, কবি চলে মাঠের পথে সন্ধ্যার হাওয়ায় উড়ুনি উড়িয়ে। কবি গায় চাঁদনি রাতের গান, ছবি চুপ করে শোনে আর চায় মাঠের পারে—বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে যেখানে চাঁদ উঠছে। সেই সময় বনগাঁয়ের ধারে মাদল বাজে, ডাক দেয় গাঁয়ে গাঁয়ে কালো ছেলেমেয়েদের 'বাহা-পড়বে'। কবি বলে, ও কী শুনি! ছবি বলে, ও কী দেখি! দু-জনে এগিয়ে যায় গাঁয়ের দিকে।

একদল কালো পুরুষ, একদল কালো মেয়ে সারাদিন মাঠে মাঠে রোদে পিঠ পুড়িয়ে এখন চাঁদনিতে উৎসব করতে বেরিয়েছে — কেউ সেজেছে ফুলে ফুলে, কেউ সেজেছে পাখির পালকে, খোঁপায় সবু ধানের ঝুরি, গলায় কারু পুঁতির মালা, পরনে নতুন শাড়ি, ধোয়া কাপড়। গাছের তলায় ছাওয়া, সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েরা। মাঠের মাঝে চাঁদের আলো, সেখানে দাঁড়িয়ে পুরুষেরা। কবি-ছবি দুটিতে দূর থেকে দেখছে।

মাদল ডাকে। পরব শুরু। যেন বাদলের মেঘ ডেকে গেল বকের পাঁতিকে। মেয়েরা শুনেও যেন শোনে

না, গল্পই করে ছাওয়ায় দাঁড়িয়ে। বল্লমের আগায় চামর দুলিয়ে দূত যায় এগিয়ে, জানায় সংবাদ—খবরের কাগজ তো নেই এদের। মাদল বাজে থৈয়া-থৈয়া, হাতের নোয়া বাজে ঝিনিঝিনি, মেয়েরা এগিয়ে আসে চাঁদনি-জ্বালা আসরে। নাচ শুরু হয়। কবি শোনেন, ছবি দেখেন, দেখে লিখে চলেন—

দিনকে দিনে
দিনেক দিনে
চান্নি রাতের
শামনি ছাওয়া
বাড়তে চলে।
দেখতে শোভা
মনলোভা
দিচ্ছে আভা
মেঘের পারে।

গান চলে, মাদল বাজে, রাত বাড়ে, আলোর বাহার ক্রমেই খোলে। আসর জমে ওঠে। দুই দলে গায়—

কও তো মিষ্টি কথা।
পাহাড়তলির
এ কোন গাঁয়ের
মিষ্টি কথা কও।
জানিয়ে দিয়ে যাও
এমন কোথা পাও;
মিষ্টি বুলি
ও বুলবুলি
বলে দিয়ে যা।
কমনে তুমি রও?
মিষ্টি লতার—
বুলবুলিটি
একটি কথা কও।

কত কথা, কত ছবি, শুনতে মিঠে, দেখতে মিষ্টি! বাড়ি ফেরে কবি-ছবি দু-জনে রাত করে। এসে দেখে টেবিলে খাবার আছে ঢাকা দেওয়া। খব্‌রি খাওয়া সেরে বসে আছেন গোমসা মুখে আমাদের আসার অপেক্ষায়। কবি আর ছবি দু-জনে ভয়ে-ভয়ে নোটবই পকেটে লুকিয়ে বলেন, 'খবর কী আজ?'

খব্‌রি কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, 'তোমাদের খবর কী শুনি?'

খাওয়া চলে, চলতে চলতে কথাও চলে। এইভাবে খব্‌রির খবর বুটির গোছার সঙ্গে কমতে কমতে মিঠে পানে এবং মিঠে-কড়া তামাকে যখন এসে ঠেকল, তখন কবি খাতা খুললেন, ছবিও পাতা উলটে

চললেন। কবি শোনান সাঁওতালি গান, ছবি দেখান কালো চেহারা। খব্‌রি দেখে-শুনে বললেন — যাচ্ছেতাই। অতি তুচ্ছ গেঁয়ো জিনিস, একটুও ভালো লাগল না। আর্ট নেই ভল্‌গার।

ছবি আর কবি দু-জনের দিকে দু-জনে চায় আর ভাবে—মাঠের ধারে যে জিনিস লেগেছিল ভালো, শুনিয়েছিল ভালো, ঘরে এসে তার একী অদলবদল হয়ে গেল।

খব্‌রি অসহায় গ্রামবাসীদের দশা সম্বন্ধে অনেকখানি সেন্‌টিমেন্‌টালিটি ও গবেষণা ইত্যাদির ইটি-ওটি খুঁটিনাটি দিয়ে মস্ত এক প্রবন্ধ পড়ে শোনালেন! কে জানে, সেইটাই লাগল ভালো সে রাত্তিরে। খব্‌রি জিতে গেল, কবি-ছবি হার মেনে শুতে গেল।

বিজয়গর্বে খব্‌রির নাক জোরে জোরে হুহুঙ্কার দিচ্ছে। কবির ঘুম নেই, ছবিরও ঘুম নেই। কবি আর ছবি দু-জনে বার হল মাঠে — এক খিড়কি খুলে, অন্য সদর দিয়ে। ফিরেও এল ভোর হতে ওই ভাবে চুপি-চুপি।

কবি রাখলেন খাতা, ছবি রাখলেন পাতা লুকিয়ে। খবরের কাগজে তিন-চার কলম জুড়ে খব্‌রি-বন্ধুর লেখাটা ছাপানো হয়ে চুম্বুক হয়ে বার হয়ে গেল ইংরেজি-বাংলা-উর্দু কাগজে। সেই লেখার সমালোচনা চলল কত চায়ের টেবিলে, কত বৈঠকে, কত সভা-সমিতিতে। কবি ও ছবি ফিরে এল বেড়িয়ে রাঁচি থেকে রোদে পুড়ে, হিম খেয়ে, রাত জেগে, চোখে কালি পড়িয়ে রোগা হয়ে। আর খব্‌রি এলেন মোটাসোটা গোলগাল ফুলের মতো লাল হয়ে।
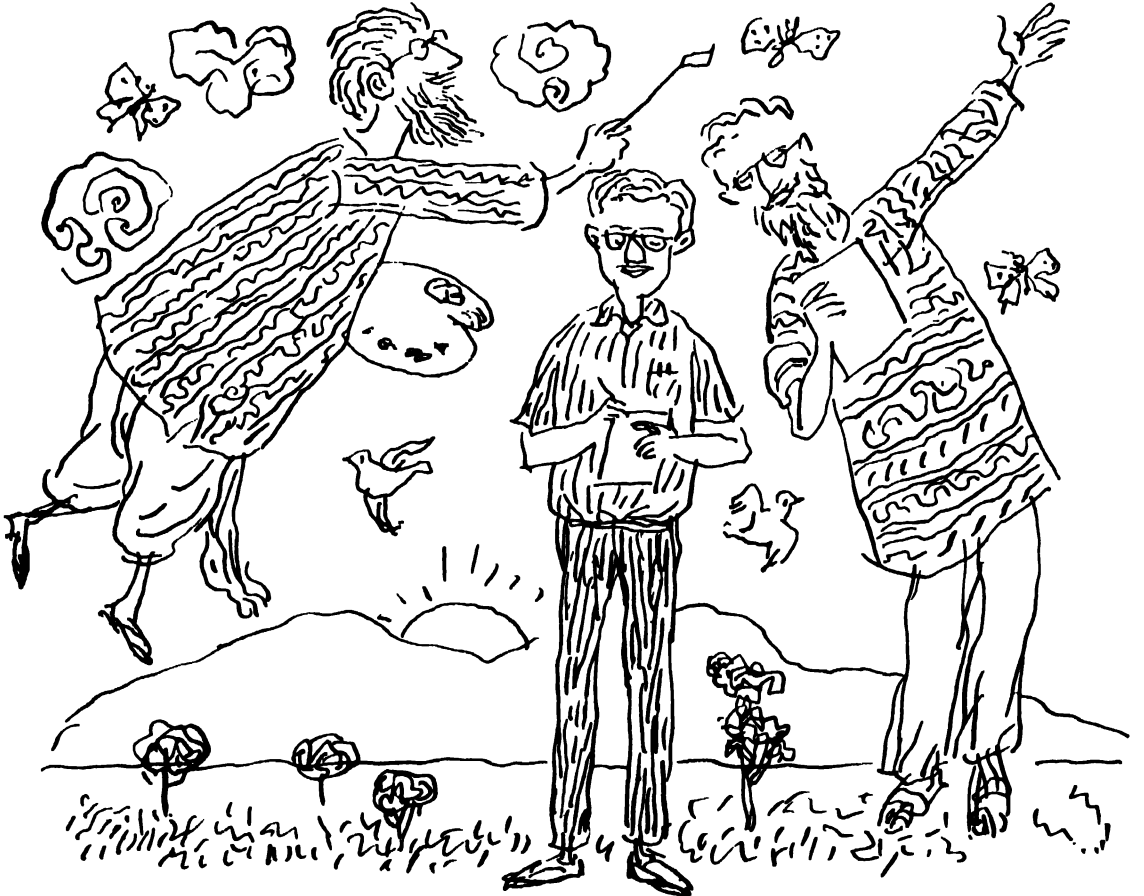
চাঁইদাদার গল্প

'উঃ কলম্বানেবুর গন্ধ পাচ্ছি যে অবুচন্দরবাবু!'

'এনেছি, তোমার জন্যে এনেছি একটি, চাঁইদাদা।'

'বিশ্বাস হয় না, এই নড়ায়ের বাজারে, কাগজিনেবুই পাচ্ছেন না তোমার চাংড়াদিদি, আর তুমি কিনা পেলে সাত রাজার ধন একটি মানিক—এ তো দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

'যদি দেখাই আমি?'

'তবে বখশিশ দেব।'

'কী বখশিশ আগে বলো।'

'কী বখশিস পেলে তুমি খুশি হও?'

'একটি গল্প।'

'ভালো তাই সই, নেবু জোগাও, গল্প কই।'

'এই নাও।'

'একী, এ যে অপূর্ব জিনিস—আঃ! কোথা হতে পেলে অবুচন্দর!'

'মাসির দেশ থেকে মাস্‌চটকমশায় এনেছেন।'

'ও বুঝেচি, রাখো নেবুটি আমার এই গেদার তলায় লুকিয়ে। তোমার চাংড়াদিদি দেখলে টেনে ফেলে দেবে!'

'কেন বেশ তো খোসবো নেবুর!'

'আরে দাদা, তোমার কাছেও বেশ, আমার কাছেও বেশ—চাংড়ার কাছে ভারী নোংরা।'

'এ কেমন কথা?'

'আ হে অবুবাবু, সে যে কুলীনের মেয়ে।'

'বুঝলেম না কিচ্ছু।

'বুঝবে বুঝবে, আর একটু বড়ো হও বুঝিয়ে দেব। এখন গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখো, কল্পনা করো—অল্পসল্প!'

'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁইদাদা!'

'তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে—হিস্টিরি পড়ে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে?'

'তবে?'

'তবে আবার! দেখো অবুবাবু এই আমি সেকালের বুড়ো—হিস্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই।'

'চাঁইদাদা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে এল।'

'ঘুম পায় ঘুমোবে; কিন্তু খবরদার হাই তুলো না—তা হলেই আমার কল্পনা আর চলবে না, রাস্তার মাঝে পা পিছলে একদম আলুর দম হয়ে যাবে।—তখন কী করবে অবুবাবু?'

'মুখে ভরে দেব ছুট মাসির ঘরে।'

'বটে বটে, তুমি আমারই একজন বটে—কল্পনা করার শক্তি আছে দেখছি তোমার কিছু কিছু! শোনো তবে বলি —

সেকালের পাণ্ডববর্জিত দেশের একটা বুড়ো শকুনি করেছে তাড়া এক বাজপাখিকে ধরবার মতলবে। বাজপাখি সড়াৎ করে সাদা-কালো ডানায় ঝিলিক টেনে তো হল অদৃশ্য; শকুনি শূন্যে-শূন্যে তিন-চারটে মস্ত চক্কর খেয়ে উড়ে বসবি তো বস, ভুচুর রাজার ঘরের মটকায়; বসেই তো বাছতে লেগেছে বুড়ো-শকুন ডানার উকুন। এদিকে রাজবাড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে।

'কী পোলোরে চালে, কী পোলো!

'চিল পোলো না শিল পোলো না ইট পোলো!

'রানির চাকরানি পুকুরঘাটে বাসন মাজছিল। সে বলে উঠল—চিল পোলো গো চিল পোলো!

'দেখো দেখো শঙ্খচিল না তো!

'ওমা! চিল হতে যাবে কেন—ওটা যে শকুনি!

শকুনি বলে শকুনি? শকুনির মামা শকুনি!—ডানা মেলে পালক থেকে কাঁকড়ার মতো বড়ো বড়ো উকুন বেছে খাচ্ছে। তাড়ালে নড়ে না।

'কী হবে গো ও পিসিমা!

'রাজার পিসি কাত্যায়নী গম্ভীর মুখে বললেন—যখন পড়েছে তখন ওরে নড়ানো শক্ত, ও কিছু নিয়ে তবে উড়বে।

'ছোটো পিসি দাক্ষায়ণী বললেন, এ তো বড়ো দোষের কথা হল—

আজ মটকাতে পড়ে শকুন—
ঠোঁটে বেছে খেলে উকুন।
কাল বাড়া ভাতে পড়বে মাছি,
তখন আর কোথায় আছি॥

'এইসময় খবর আনলে ডুমনিপাড়ার কুসমি—ওগো মাঠাকরুনেরা আপদ ঢুকেছে—শুকনিটা যেখানেই পড়ল সেখানেই তিনটে খাবি খেয়ে মরল। রাজা আমাদের তেনাকে হুকুম করল মরা পাখিটারে ভেজে খেয়ে ফেলাতে।

'ওই শোনাও যা, কাত্যায়নী ঠাকরুন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে—অ্যাঁ, বলেই চিৎপাত-কুপোকাত—আর সাড়াশব্দ নেই।

'রাজার রানি আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন—যাক পিসির উপর দিয়েই শকুন-পড়ার ফাঁড়াটা কাটল বুঝি!

'ঠিক সেইকালে কাত্যায়নী-বুড়ি চোখ মেলে কটমট করে চেয়ে ভাঙা কাঁসির মতো খনখনে আবাজে বলে উঠলেন তিরদোষ তিরদোষ তিরদোষ,—তিনবারের বার চোখ উলটিয়ে পিসির হয়ে গেল।

'সে-মাসটা গেল ত্রিদোষ কাটাতে। পরের মাসে ঠিক সেইদিনে সেইসময়ে পড়ল জোড়া শকুনি রাজবাড়ির চালে—এমন জোরে যে মটকা কাত, শকুনি দুটোরও অপঘাত।

'এবার কার পালা—বলে রানি দাক্ষায়ণী পিসির দিকে চাইতেই রাজার ছোটো পিসি দাক্ষায়ণী বললেন—পালা যারই হোক, এক পলা তেল দ্যাও—পুকুরে তিনটে ডুব দিয়ে একবার শুদ্ধু হয়ে আসি! ছোটো পিসি কালিসায়ারে ডুব দিতে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। কেউ বলে পিসি পেলিয়েছেন, কেউ বলে কুমিরের পেটে গেছেন। জাল টানা হল কালিসায়ারে। পিসি না উঠে উঠল জালে একটা রাঘব বোয়াল—মরে দাঁত ছিরকুটে আছে। খোঁজ খোঁজ—পিসি গেল কোথায়? সন্ধান মিলল গিয়ে পিসির বনগাঁয়ে। সেখানে বসে আছেন রাজার পিসি চানাচুর ভাজার ঠোঙা হাতে—পাশে তাঁর বোষ্টমি মাসি খঞ্জনি বাজিয়ে ধরেচেন গীত—

'নিপট নিরদয় তোমার দয়াময়
বলাও বলো কোন গুণে!
হয়ে রাজকন্যে বনবাসী,
দাসী হয় রাজমহিষী,
—সকলই তোমার কৃপায়!
যারে রাখো পায়, সে কী না পায়,
যারে না রাখো পায়,
বিপদ ঘটাও পায় পায়;
হাসি পায় হে পায়,
পায়ে ধরার দিন মনে হলে।।

'ওকী অবুবাবু, হাই তুললে যে?'

'কী জানি চাঁইদাদা, তোমার গান শুনে হাসি চাপতে গিয়ে হাই তুলে ফেললুম।'

'তা হলে আর গল্প চলল না, অবুবাবু! কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে—যা-তা আবোলতাবোল বকছে সারারাত—তুমি আজ ঘরে যাও, কাল এসো ঠিক এইসময়ে।'

'কালও কি নেবু আনতে হবে?'

'জোরজুলুম করতে চাইনে। পাও যদি এনো—কিন্তু গোপনে—চাংড়া না টের পায়।'

'আচ্ছা।'

কলাবনের কলা

জয়ন্তীবাগের পুরনো মালি নালিশ জানালে, ‘কলাবাগানে হনুমান পড়েছে।’

বাদশাবাবু হুকুম দিলেন, ‘গুলতি চালাও, তাতে যদি না হটে তো দো-নলা বন্দুক—’

খাতাঞ্চিমশায় কানে হাত দিয়ে বললেন, ‘অমন কথা বলতে নাই বাদশাবাবু। একটি রামদাস হত্যার পাপ কোটি ব্রহ্মহত্যার চেয়ে কোটি গুণ বেশি। তা ছাড়া বন্দুক চালানোর লাইসেন্‌স্ কোম্পানি বাহাদুর এই লড়াইয়ের সময় দেবেই না—ভুঁইপটকার উপরে টেক্‌সো বসেনি, এখন তাই চালাতে হুকুম দাও।’

ভুঁইপটকার শব্দে বাগিচার ভুঁইকুমড়ো বাঁচে ইঁদুরের হাত থেকে চালকুমড়োও কিছু বাঁচে—কলার কাঁদি রক্ষে পায় না।

বাদশাবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'সব কলা খেয়ে যাচ্ছে খাতাঞ্চিমশায় উপায় করো।'

খাতাঞ্চিমশায় বাঁধা-পুকুরের ঘাটে বসে তামুক টানতে টানতে বললেন, 'এক সল্লা আছে, লঙ্কাগাছের ডাল পুড়িয়ে সেই কাটকয়লা দিয়ে বড়ো বড়ো করে দেয়ালের গায়ে রামনাম লিখে ছাড়ো তো দেখি কী ফল হয়।'

সোনাতন বুড়ো খাতাঞ্চিমশায়ের পায়ে হাত ঘষছিল শুনে বললে, 'ওতে ফল হবে না কর্তা।'

'কেন ফল হবে না শুনি?'

'আজ্ঞে কিত্তিবাস লিখে গেছেন, যেখানে রামনাম সেখানে হনুমান—; কলাবাগানে উৎপাত বাড়বে বই কমবে না।'

'হু' বলে খাতাঞ্চিমশায় পা দু-খানা টেনে নিয়ে খড়মপায়ে ঘাট ছেড়ে বাগান তদারকে চললেন। পাছে পাছে বাদশাবাবু, বুড়ো মালি আর গোলপাতার ছাতা ধরে সোনাতন।

পুকুরের উত্তরপাড়ে কলাবাগান, তেঁতুলতলা থেকে আরম্ভ করে পাথরের চৌকি-পাতা কয়েত-বেল গাছটা পর্যন্ত। সেই বেলতলার পাথরের বেদিতে খাতাঞ্চিমশায় দ্বিতীয় আশুতোষ যেন ধ্যান-মুদ্রা করে বসে বললেন, 'দেখো বাদশাবাবু, ঝড়ে-হেলা বুড়ো বেলগাছ—এতে ফলও ধরে না পাতাও নেই দেখতে পাচ্ছ।'

'ওই যে ফুল ধরেছে খাতাঞ্চিমশায়।'

বুড়োর ধ্যানভঙ্গ। উপরে চেয়ে দেখলেন শুকনো ডালে লাল-কালো-সাদা ডোরা টান একটি প্রজাপতি সবে গুটি ফেরে বেরিয়ে রোদে ফুলের পাপড়ির মতো দু-খানা ডানা শুকিয়ে নিচ্ছে।

'বাতাসটা যেন কেমন-কেমন লাগছে—' বলে প্রজাপতির ডানার মতো ডোরাটান পুরনো আমলের কাশ্মেরি শালখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, 'বাদশাবাবু, ও পাথরের চাতালে লিখে রাখো—'

'রামনামের টানে হনুমান আসে, চিটে গুড়ে যেন পড়ে মাছি।'

'এখন এই শোলোকের নীচে তিনশো জয় রাম লিখে ছাড়ো—দেখবে কলাবাগান ছেড়ে সব হনুমান এই স্থানে জড়ো হবে কলার আর নামও করবে না। বেলও পাবে না বুড়ো গাছে, খেয়ে বাঁচুক গুটিপোকা—বন্ধ থাক খেতে ঢোকা'—বলে খাতাঞ্চিমশায় ঘরমুখো হলেন।

খাতাঞ্চিমশায়কে ঘরে দিয়ে সোনাতন বেলতলার ঘাটে ফিরে এসে বললে, 'বাদশাবাবু রাম লিখতে মিছে তখলিফ নিচ্ছ। কলির হনুমান প্রায় মানুষ হয়ে গেছে, ওনামে ভুলবে না। আমার কথা শোনো চাঁই-বুড়োকে ধরে পড়ো যদি কিছু হদিস বাতলাতে পারেন তো কলাবাগান রক্ষে পায়।' বুড়ো মালিও একথায় সায় দিয়ে বসল ঘাস নিড়োতে।

*　　　*　　　*

সদর-অন্দর দুটোর মধ্যে আঙিনা তারই উত্তরধারে জয়ন্তী ভবনের ঠাকুরবাড়ি। উঠোনের একধারে তুলসিমঞ্চ সেখানে চাংড়াবুড়ি বসে হরিনাম করছেন রাতের মুখে চেয়ে। বাদশাবাবুর পায়ের সাড়া পেয়ে বললেন, 'এসো বাদশাদাদা কী মনে করে।'

'চাঁইবুড়োর সঙ্গে দেখা করব দিদিমণি?'

'তিনি এখন পুথি নকল করছেন, একটু রোসো ডাক দিই—ওগো শুনছ, বাদশাবাবু তোমাকে চান।'

'হুঁ যাই,' বলে চাঁইবুড়ো নামাবলি গায়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী চাই দাদাভাই?'

'হনুমানে সব কলা খেয়ে যাচ্ছে এর উপায় কী?'

'উ-পা-য়' বলে চাঁইবুড়ো তিনবার তেলা-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কলিকাল না হলে উপায় হত কলাবাগান বাঁচাবার।'

'তবে?'

'তবে আবার কী বাদশাবাবু—কলার আশা ছাড়ো। চা খাও, টোস্ট খাও, হ্যাপি বয় খাও, টফি খাও, কফি খাও—'

চাংড়াবুড়ি শুনে বললেন, 'ওগো তুমি যে কবাতে শুরু করলে। বাদশাদাদার কী উপায় হবে তাই বলো।'

'হবে হবে, উপায় উনি করবেনই, সে ভাবনা নেই। ভাবনা আমার মতো লোকের যারা পুথি নকল করে আর থেকে থেকে কবায়।'

'তুমি কীসের পুথি নকল করেছিলে চাঁইবুড়ো?'

'ব্যবকলনের পুথি দাদা!'

'সে পুঁথি কেমন দেখাও না।'

'সে দেখতে হয় না বাবু শুনতে হয়। ব্রাহ্মণকে দু-বেলা পাঁঠার ঝোল মেটিলির চচ্চড়ি খাইয়ে।'

'আমি সেই পুথি শুনব চাঁইবুড়ো।'

'খাতাঞ্চিমশায়ের হুকুম আনো। অমনি তো হয় না। উঠানজুড়ে ফরাশ বিছোতে হবে, চাঁদামালা সাজাতে হবে, সামনের নবমী থেকে শুরু করি পাঠ—কী বলো বাদশাবাবু। পাঁঠা যেন ভুল না হয় দেখো তা হলে ফল হবে না।'

'ফলও হবে না,' বলে মালি ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

বাদশাবাবু বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে।'

* * *

বোমার ভয়ে সবাই পালিয়েছে বিদেশে কাজেই বাদশাবাবুর নিমন্ত্রণে বড়ো কেউ পুথি শুনতে আসতে পারলে না। নবমীর সন্ধ্যা উতরে চাঁইবুড়ো বসলেন জয়ন্তীবাগের আঙিনাতে। ফরাশ আর বিছোতে হল না; ধোয়া জাজিমের প্রায় পরিষ্কার চাঁদের আলো উঠানজুড়ে বিছিয়ে পড়েছে, বাইরে সুপারি আর নারকেল তেঁতুল আর আম গাছগুলো গলা বাড়িয়ে স্থির হয়ে শুনছে যেন। সব উপরে নীল চাঁদোয়ার মতো নিথর আকাশ। শেয়ালগুলো হোয়া দিয়ে সাঁঝি ফুকরে চুপ করলে—পুথিপাঠ শুরু হল। শ্রোতার মধ্যে সোনাতন, বুড়ো মালি, চাংড়াবুড়ি, ভূতি আর বেসি কুকুর আর দাসী-চাকরগণ বাদশাবাবুর মাদুর ঘিরে।

চাঁইবুড়ো বললেন, 'শৃণু

বাদশাবাবু নামদার উপায় ভাবিল কলা রক্ষার
করিলে যে অনুমতি
পুথিপাঠে দিলাম মন হতেছে পন্টক রন্ধন
কলাবনে না যান হনুমতি

'শ্রীমত্যা রাম দাসায়ে ওই ওই চিরং জীবি তায়ে হনুমাতা অঞ্জনায়ে হুম্ ফট্ ত্রিং চট্—

অযোধ্যাপুরে বার্তাদাসী আর রামদাসী দু-জনতে কথা হচ্ছে—

'বলি ও বার্তা, খবর কী লো?

'খবর আর কী ভাই রামদাসী, মেজোঠাকরুন ডেকেছেন তাই রাজা ছুটেছেন মউর উদ্যানে, রামচন্দ্রকে অধিবাস করিয়ে মুনি-ঋষিরা ছালাবেঁধে বাসায় ঢুকছেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। ঘড়ি পড়ল সায়নের। সারাদিনের খাটুনি, শুয়েছি না ঘুম বলে কোথায় আছি। তবু কান খাড়া রেখেছি—কে কী বলা-কওয়া করে। এমন সময় শুনি রাজদোরে রথের ঘড়ঘড়ানি—বলি, বুঝি রাম-অভিষেক দেখতে সামন্ত কী কেউ লক্ষ্মীমন্ত এল। কিন্তু মেজোরানির অন্দর—সেদিকে তো কেউ আসে না। কে এল তবে? রথের গুরুগুরু শুনে মউর উদ্যানের মউরগুলো 'কে কই' 'কে কই' বলে ডাক দিয়ে চটকা ভাঙিয়ে দিতেই সজাগ হয়ে শুনলে যা তা আর বলবার নয়। রথ এক এল আর-এক ফিরল, আবার এল আবার ফিরল—এমনি চলল কতক্ষণ।

'তারপর?

'তারপর আর কী—জেগেই দেখবি তো দেখ মন্থরার মুখ! যেমন দেখা অকস্মাৎ শিরে বজ্রঘাত। মন্থরীর মুখে হাসি দেখলেম।

'দেখলে?

'হাঁগো রামদাসী, তুমি যে অবাক হলে?

'হাসিটা কেমন দেখলে?

'রাহু যখন সূর্যের এক চোকলায় কামড় দিয়ে হাসে সে হাসি দেখেছিস তো?

'না দিদি অন্দরে থাকি সূর্যের মুখ কালভদ্রে দেখতে পাই—ভাদ্র মাসে গরম কাপড় রোদে মেলাতে।

'আচ্ছা, ঘুঁটে যখন পোড়ে গোবরের হাসি তো দেখেছিস?

'ধুমায় চোখে জল আসে দেখব কী করে?

'তবে তো নারলেম তোকে বোঝাতে মন্থরী : হাসি কী প্রকার, ভালো, কতরকম হাসি দেখেছিস বল তো শুনি।

'অট্টহাসি, পষ্ট হাসি, কাষ্ঠ হাসি, চাপা হাসি, বাঁকা হাসি, ঢালা হাসি, মুচকি হাসি—কত দেখলেম দিদি এই বয়সে।

'ওলো, উটকে দাঁত ছিরকুটে মরতে দেখতিস তো বুঝতিস মন্থরীর হাসি কী প্রকারের। পিঠের কুঁজ পর্যন্ত টানা সে একপ্রকারের উলটো হাসি। দেখলে ভয় করে, শুনলে কান্না পায়, মাথা ঘোরে পিত্তি জ্বলে যায়।

'দিদি, মন্থরী যেদিন কাঁদবে সেদিন কী কাজ হবে বলো তো?

'কাঁদবে লো কাঁদবে মন্থরী কাঁদবে একদিন— সেদিন বেঁচে থাকি তো এসে বলব। এখন চলি।

'বসি ও বার্তা একবার এদিকে শুনে যেয়ো।

'সর্বনাশ, সাপের মাথায় পা পড়েছে, কঞ্চুকীবুড়ো আড়াশি পেতে সব কথা শুনেছে, এখন কী করি? দে ভাই রামদাসী, তোর গায়ের ধোসাখানি মুড়ি দিয়ে পড়ি, আমার ভাল্‌কো জ্বর এসে গেল। তোরা পালা, যে-যার পথ দেখ।

'আসল খবরটা শুনতে রয়ে গেল যে মন্থরী অত হাসছে কেন?

'কাল প্রকাশ পাবে আজ আর শুধোসনে।

'বলি বার্তা, শুনে গেলে না।

'যেতে পারলে তো যাই, জ্বর এসে গেছে— দুই পায়ে বেদনা।

'আচ্ছা আমিই আসছি। আর কেউ নেই তো?

'ছিল দু-একজন পায়ে তেলটুকু ঘষে দিয়ে এই মাত্তর যে-যার কাজে গেল।

'ঠিক বলছ?

'ঠিক নয় তবে কি বেঠিক। আমার নাম নয় বার্তাদাসী, যদি রাজবাড়িতে কথা প্রকাশ করে বলি যার-তার কাছে। কেন ডাকলে শুনতে পাই কি?

'চটকা ভেঙে তুমি সজাগ হয়ে মেজোরানির অন্দরে কী কথাটি শুনলে সেইটি শুনলেই আমিও তোমায় ডাকলেম কেন বলে ফেলি।

'তোমার কথা শোনার আমার সময় নেই— চললেম। বড়োরানির মন্দিরে—' বলেই চাঁইবুড়ো উঠতে যান আসন ছেড়ে।

বাদশাবাবু হেঁকে বললেন, 'হয়ে গেল নাকি? এতেই হনুমান পালাবে।'

'তা কি হয় বাদশাবাবু? হনুমান কি সহজে নড়বে— কত কলা সমূলে খেয়ে কদিন ধরে রামদাসীর পুথি শুনে যদি দেশে ফেরে।'

'হনুমানের দেশ কোথায়?'

'মলয় দ্বীপের এক পর্বতে।'

'সেখানে তো লড়াই বেধেছে—বোমা পড়ছে।'

—'সেই তো ভাবনার কথা বাদশাবাবু। কলা বুঝি আর থাকে না মানুষের হাটে।'

চ্যাংড়াবুড়ি শুনে শুনে বলে উঠলেন, 'সে ভয় নেই গো। যতদিন গণেশ আছেন। তাঁর কলাবউও আছে, কলাও আছে— তোমারও যেমন কথা।'

'এ এক কথা তো বুড়ি-মা ঠিক বলিলা' বলে বুড়ো মালি উঠল।

'নমো গণেশায় ইতি প্রথম কলা,' বলে চাঁইবুড়ো পাঠ বন্ধ করতেই 'লুচি ভাজো গো ও কালা ঠাকুর,' হাঁক দিলেন সোনাতন।

কথামালার দেশে

তখন মাসি-পিসি বার হবার বয়েস গেছে। মাথার তেলোয় চুল গজানো বন্ধ, মাড়ি ফুঁড়ে আক্কেল দাঁতও ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল পাকা দাড়ি-গোঁফ হাত-পায়ের নখ ক-টার উৎকর্ষের উৎসাহবশে বেরিয়ে পড়ার উৎকণ্ঠার উৎপাত খুর নরুণ কাঁচি কাস্তে উখো খররা চালিয়েও দাবানো গেল না। তাদের এক কথা— 'আমরা চলব বাহিরে। তুমি চলতে না চাও তো কার কী?'

দাড়ি যে গোনা যায় না এতগুলো আকুঞ্চিৎ আঙুল দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে আমায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলে— দেখো তোমার পায়ের আগা চুলকোচ্ছে। এবার নিশ্চয় দেশ পর্যটন আছে তোমার কপালে।

আমার বুড়ো আঙুল জোড়া খঞ্জনের কাটা ল্যাজের গোড়ার মতো চমকে দুবার নেড়েই ঠান্ডা। ঠিক যেন চিৎপুরের লুঙ্গিবাবার বুড়ো-আংলা দুটো চেলা এক ঠেঙে দাঁড়িয়ে সুয্যির দিকে চেয়ে ঘোরতর তপিস্যে করছিল। হঠাৎ পায়ে পিঁপড়ে কামড়াতে একটু সজাগ হয়ে আবার ধ্যানস্থ হল।

গোঁফ দুটো দুষ্টু ছেলের মতো সলতে পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে ঘুম ভাঙাতে চেয়ে; বলে, 'জাগো না, শোনো না।'

গোঁফ আর দাড়ির শিয়রে বসে আছে, থাবা গেড়ে কথামালার ঘুমন্ত সিংহ মস্ত দুটো নাকের ছেঁদা ফুলিয়ে। ছোটো একটা গোঁফ রংটা তার নেংটি ইঁদুরের মতো শিলাট-কালো। সে থেকে থেকে সরু ল্যাজটা সিংহের নাকের মধ্যে চালিয়ে দেয়, অমনি সিংহ গর্জন করে এক খুৎকার ছেড়ে থাবাকে ডাকে, থাবা ঘুমের ঘোরে উঠে এসে দাড়ির টুঁটি চেপে ধরে উকুন বাছতে বসে যায়।

ভূতপতরি দেশ থেকে মন-মনুয়ার পাখিটি আমার হারুন-অল-রসিদ বাদশার দেওয়া—বাঁখারি নয় শাঁখারির সরু সরু কাটি দিয়ে গড়া পুরনো কালের একটা খাঁচায় বসে বসে সারাদিন দরজার কাঠিতে ঠোঁচ ঘষে আর বলে—

'ওগো ভাই
দ্বার খোলো বারে যাই
বহুত দিন না দেখি দুনিয়া
দুনিয়ার হাওয়া নিয়া
ঠান্ডা করি মম হিয়া গো!'

পাখি নিশ্চয় ছিল মধুমালার দেশের বাসিন্দা—সেই যেখানে ছিল সঙ্গ-মর্মর পাথরের খন্দকে বন্ধ রাজপুত্তুরের মা আর ধাই-মা। এক-এক দিন ভোরে উঠে তখন পাখিটাকে দুয়োরের খিল খুলে বলি— 'বেরিয়ে যা এইবেলা, কেউ কোথাও নেই।'

পাখি খোলা দুয়োরের চৌকাঠে বসে দু-বার ডানা মেলায় উড়ি উড়ি করে যেদিক থেকে মালতী ফুলের লতায় ঘিরে মৌমাছির দল—ঠিক সেইসময় কাক ডাকে—না না না! আমি ভয় পাই, ঝপ করে বন্ধ করি দরজা।

এই অবস্থায় তখন কাটছে দিন রাত—বন্ধ খাঁচায় বন্ধ ঘরে অঝোরে ঝরে নয়নজল—নিজের দেশে যাওয়া ফুরিয়ে গেছে, পরের দেশের টিকিট কাটাবার ইচ্ছেও নেই, পয়সাও নেই। পদ্ম পুরাণ, মনসার পাঁচালি গাইছেন কেবলই বসে বসে শুয়ে শুয়ে জবুথবু তোমাদের অবুবাবু ভাঙা গলায় — বেলা যায় না, বেলা যায় না যায় না, কেন দারুণ বেলা!

হঠাৎ এসে হাজির কহবতী কথামালার, সঙ্গে ছেলামবাবা। কোনকালে কোন দেশে তাদের দুজনার সঙ্গে দেখা তো মনেই নেই। তারাও চেষ্টা করে ঠিক করতে পারলে না যে পদ্মপুকুর ইটালিতে, না পুরন্দায়, না মগধে, না মগরায়, না এই জোড়াসাঁকোর গলির মোড়ে আলাপ হয় প্রথমে আমাদের। খালি সময়টুকু মনে পড়ল। একরোজ চার ঘড়ি বাকি সাম হইতে সেইসময় ক-জনে দেখাদেখি চেনা-পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন ঠোঙায় করে জিবেগজা এনে দু-জনকে খেতে দিয়ে বললেম, 'তবে এবার আগমন কোথা থেকে?'

ছেলামবাবা বললেন, 'আমি ঘরেই ছেলাম।'

কহবতী বললেন, 'আমি সরস্বতীতে ডুব দিয়ে কথামালার দেশটা একবার ঘুরে এলাম।'

আমি বললেম, 'আমি খালি বসে বসে ভাবছেলাম কোথাকে যাইমু, কাহারে কইমু, কে মোর জানিবে ব্যাদন।'

কহবতী বলে উঠল, 'ময়নামতীর যাত্রার গান, তারই এক ছত্তর, এ পেলে কোথায়?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললেম, 'ময়মনসিংহ।'

কহবতী তলপি কাঁধে দাঁড়িয়ে বললে, 'চললেম।'

'আরে যাও কোথায়, বসো।'

কহবতী বললে, 'বাকি ক-ছত্তর কথা সংগ্রহ করতে।' বলেই সে গেয়ে উঠল—

'সময় তো থাকবে না থাকবে না
কথা রবে শুধু কথাই রবে
ভালো কিংবা মন্দ বলি জগতে ঘোষণা রবে
মুখের কথা মনের কথায়
সুখ-দুখের মিনি সুতে।
এতে-ওতে গাঁথাই রবে।'

কথামালাটা ফেলে চলে গেল কহবতী। ছেলামবাবা জিবেগজার শালপাতের ঠোঙাটা টুপি করে মাথায় দিয়ে সেলাম ঠুকে চম্পট দিলে। আমি কথামালাটা নেড়েচেড়ে দেখতে থাকলেম।

বিদ্যাসাগরের কথামালার মতো প্রেসে-ছাপা বই নয়। হাতের লেখা কথকতার পুথি। পৃথিবীতে যা কিছু হালকি জিনিস আছে তালপাতা, শালপাতা, তুলোট খাতা, হরিণছালের ছিলকে, মাছের পেটের পটকা তিমিমাছের আঁশ — তাদের চেয়ে পাতলা ছিষ্টিছাড়া কী একরকম কাগজে লেখা খানিকটা যেন এক-এক পরদা আবের উপরে এ-পিঠ ও-পিঠ করে লেখা নরুণ দিয়ে আঁচড়ে—একেবারে যাকে বলে অতি অপূর্ব পুরাতন কথামালা পুস্তিকা — সাহিত্য পরিষদে নেই, গুরুদাস লাইব্রেরিতেও নেই, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের ঘরেও নেই, যা এমন জিনিস সেটি। আর সবচেয়ে মজার কথা—বই পড়তে চশমা নিতে হয় না—বইখানি চোখের

প্লাটফরম নং ওয়ান

উপর ধরলেই হল — একটি-একটি কথা মূর্তিমান হয়ে এসে সামনে হাজির হয়, কথা বলে, গান গায়, নাচে আবার নেপথ্যেও চলে যায়। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রবেশ করে, ঘণ্টা দিয়ে চলে যায়।

সেকালে বিলেত থেকে যখন ভালো ভালো খেলনা আমদানি হত, তখন এইরকমের সব বই আসত। এক-একটা ছবির পাতা ওলটাও আর সঙ্গে সঙ্গে আরগিন বাজছে, ঘোড়া নাচছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ডিগবাজি খাচ্ছে, কুকুর হুপ করে তেড়ে যাচ্ছে বেড়ালকে, বেড়াল লাপিয়ে উঠেছে গাছে, সঙ্গে বাজছে আরগিন। কহবতী কোথা থেকে পেলে এ জিনিস শহরে তাই ভাবছি। বইখানা পেলে একবার নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন ঠিক নয়? সেটি হবার জো নেই, সে আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যে। একটা গান ছাপিয়ে দিলেম, পড়ে দেখো কতকটা বুঝবে কী জিনিস লুকোনো আছে আমার মরচে-ধরা লোহার সিন্দুকে!

—তারাবুড়ির একতারা নৃত্যগীত—

যথা —

বাজে এক সুরে একতারা প্রিং প্রিং প্রিং
ফোটে তিন রঙে তিন তারা এক দুই তিন
বাঁশপাতায় ঝিঁঝির ডানা শব্দ দেয়
ঝিম ঝিম ঝিম
টিম টিম টিম
চিন্ চিন্ চিন্ রোদ পড়ে
তালপাতার সেফাই খেলে
ঢাল-তলোয়ার ত্রিং ত্রিং ত্রিং!

বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই কহবতী প্রবেশ করেই কথারম্ভ করে দিলে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি!

অমনি তার যুগ ভীষণ মূর্তিতে এসে খাড়া। কী বলব সত্যযুগ সে এক ঠিক সত্যমূর্তি। হাতে হোমকুণ্ড জ্বালাবার হাপর, ঘি ঢালবার হাতা, গলায় কুশের পইতে, পিঠে হরিণের ছানার গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নরম-নরম ছাল, কোমর থেকে ঝুলছে ছোট্টো একটা আস্ত চামড়ার মোশোক—তাতে খাবার জল ভরা, দাড়ি-গোঁফ জটাজুট।

ত্রেতাযুগে এলেন সপ্তকাল এক সবুজ মানুষ হরধনুতে টংকার দিতে দিতে।

দ্বাপরে এলেন ধিনিকেষ্ট তিনি তাক করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে ঘটোৎকচ মূর্তি।

কলি এলেন একেবারে ভীষণ একখানা কাল — কিচ্ছু দেখবার জো নেই। খালি শোনা যাচ্ছে গালাগালি, মারামারি, কোলাহল, মাঝে মাঝে হরিবোল রাম-রাম সত্য, রাইট-লেফ্‌ট আর উড়ো জাহাজের ভুবুর ভোঁ, মটরের ফোঁ-ফোঁ।

এরা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা মস্ত পোল, তার মুখেই একটা ইসটিশান-ঘর, দেয়ালে লেখা—'কথামালা', প্লাটফরম নং ওয়ান। একটা সিগনাল-কুলি পাহারালার লণ্ঠনে তেল জ্বালাচ্ছে আর গাইছে।

বলব কী অবাক কাণ্ড—এই কুলিটার কাছে আমি নিজেকে দেখলেম, লাঠি-হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে

উপস্থিত। চেহারা ঠিক এই, কেবল চশমা নেই চোখে আর বয়েস হয়ে গেছে একষট্টি উলটে '১৬'। দাড়ি নেই, গোঁফ একটু একটু শুঁয়োপোকার মতো দেখতে। হাতে মন-মনুয়ার খাঁচা, মাথায় বগের পালক - দেওয়া জরির তাজ, পরনে মখমলের কোট-পেন্টুলেন, বুকে চার-পাঁচটা মেডেল — ঠিক যাত্রার দলের যুবরাজটি।

একী কাণ্ড ভাবছি, এমন সময় দেখি কহবতী আর ছেলামবাবা দুইজনে প্রবেশ করলে, একজন হুবহু যাত্রার মন্ত্রিবর, আর-একজন গালপাট্টাধারী কোটাল! ছবিটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে টুং-টাং করে আরগিন বাজতে চলল, সুরে গেয়ে যেন কে বলছে—

(গীত)

পার কী না - পার চিনিতে
ওহে চিনিতে
চেনা জনে চিনতে হায়
এ কী বিপরীত
মুগ্ধ রইলে মুগ্ধ চিনিতে—

— যেন স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল নিজের কোনো কালের চেহারাখানা, কিন্তু কোন রাজত্বের যে যুবরাজ ছিলেম কিছুতে মনে এল না! থিয়েটারেও তো সাজিনি কোনোদিন যুবরাজ? ভাঁড় সেজেই ভাঁড়ামো করে এসেছি চিরকাল, বড়ো সমিস্যেয় পড়ে ভাবছি, এমন সময় তারাবুড়ি আবার দেখা দিয়ে গেয়ে উঠল —

(গীত)

ও হে ও প্রবাসী কোন আকাশে
তারার দেশে করবে প্রবাস
দূরে ভ্রমিবার কী-বা প্রয়োজন
আছে দু-নয়ন তারা আপনার পাশ।

তারাবুড়ি চলে যেতেই দেখি রাত পুইয়ে গেছে।

বাদশাহি গল্প

'পট্‌কান্ ফলে কোন গাছে বাদোশামশায়?'

'কেন, লট্‌কান্ গাছে। তুমি বলো তো দাদামশায় চিৎপটাং ফলে কোন গাছে?'

'কেন, তৃপ্‌পতাং গাছে, ফলটি খেয়েছে কী তৃপ্ত হয়ে গেছ, আর খাবার ইচ্ছে হবে না। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাও আর শুয়ে থাকো বিছানায়।'

'খাবার ইচ্ছে হবে না?'

'না'

'চিঁড়েভাজা সামনে ধরে দিলেও না?'

'না!'

'চিনে বাদাম? গোলাপি রেউড়ি? গরম ফুলুরি? চকলেট? বিস্কুট? লজঞ্জুষ—ইত্যাদি?'

'কিছু না!'

'মিশির বোধ হয় আজ সেই ফল খেয়েছে দাদামশায়, আমি দেখেছি খাটিয়ায় পড়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে—মটর চলবে না বলে পাঠিয়েছে—আমার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ!'

'আরে সে ফল পেলে তো খাবে! পৃথিবীতে জন্মায় না সে ফল—দেবলোকের গাছে স্বর্গের বাগানে ফলে। মিশির কাল মটর ভাজা খেয়েছে বেশি করে তাই পেট ফুলে ঢোল হয়েছে, উঠতে পারছে না, কাল ঠিক উঠবে।'

'কাল রবিবার, ইস্কুলের ছুটি, উঠলেও আমি যাচ্ছিনে। সোমবারের আগে সেই গাছ একটা আনাতে পার না দাদামশায়?'

'আমাদের যুধিষ্ঠির যদি বেঁচে থাকত আনতে পারত।'

'যুধিষ্ঠির কে?'

'জানো না?'

'না, হাঁ মনে পড়েছে, ভীমের দাদা স্বর্গে হেঁটে গিয়েছিল!'

'আরে সে যুধিষ্ঠির কেন হবে! এ হল পরীক্ষিৎ মালির ছেলে যুধিষ্ঠির। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়।'

'সে কী করত?'

'উড়ে-রামায়ণ পড়ত সন্ধেবেলা, দিনের বেলায় সবজিবাগানে মাটি খুঁড়ত। সুর্যিকে বলত সে 'মহাপড়ভু', আমাকে বলত সে 'ড়বনীবাবু, অবধাড় নমসকাড়'; 'অ' বলতে সে বলত 'ড়' 'র' বলতেও সে বলত 'ড়'। অড়হর ডালকে সে বলত 'ড়ড়র ডাল', রামায়ণকে বলত 'ড়ামায়ণ', 'অ' গুলো সে যোগ করে দিত কথার শেষে। কানন বলতে বলত 'কানন্‌অ'; শ্রাবণ বলতে বলত 'সড়াবন্‌অ'।'

'আ বলতে পারত?'

'এক-এক বার পারত, এক-এক বার পারত না। আমগাছকে কখনো বলত 'অমগছ্অ' কখনো বলত 'আমব্গাছ্অ'।'

'তার পড়াশুনা খুব বেশি ছিল না বুঝি?'

'খুব ছিল, রামায়ণ, মহাভারত গড়গড় করে পড়ে যেত কিন্তু নিজের নাম যুধিষ্ঠির বলতে তার চক্ষুস্থির হয়ে যেত।'

'কী বলত সে নিজের নাম?'

'আরে সেই নিয়েই তো কথা, শোনো না বলি—

ছিরে মেথর ছিল ইংরাজি বলতে পাকা। মদ না খেলে সে সাধু বাংলায় কথা কইত। মদ খেয়েছে কী বেরিয়েছে কুইক ইংলিশ ফরফর—ড্যাম্ ইউ রাসকেল, গো টু হেল, ব্লখেড়—এক্স নম্বর ওয়ান ব্লডি ফুল।

আমি তখন ভালো ইংরিজি শিখিনি। বিদ্যে ফলাতে গেলাম তার কাছে, শুধোলেম ইংরেজিতে—'ছিরে মেথর, হোয়াট নেম ইউ?'

সে খাঁটি ইংরিজিতে জবাব দিলে—'মাই নেম্ ইজ শ্রীরাম—নট্ ছিরে মেথর'।

আমি বললেম—'মেথর নয় তো হোয়াট ইউ!'

সে হেসে বললে—'গো এন্ড রিড—ফাস্ট বুক, প্যারিচাঁদ সরকার—আপন্ গড্ আই এম নট্ মেথর, হাইকাস্ট স্কেভেঞ্জার। দীন দরিদ্রকে উপহাস করিয়া লজ্জিত করিবেন না—আমি অতি অজ্ঞ।'

'তুমি কী করলে দাদামশায়?'

'আরে ভাই কী ইংরিজি কী বাংলাতে হার মেনে আমি বোকা বনে গেলাম—কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।'

'তারপর?'

'তারপর বলি শোনো। ইস্কুলে আমার পাশে যে বসত, সে ডবল প্রমোশান পেয়ে ক্লাসে উঠে গেল—আমি ইংরেজি বাংলা দুয়ে ফেল হয়ে হেডমাস্টারের হাতে-পায়ে ধরাধরি করে ক্লাসের সেকেন্ড বেঞ্চিতে বসবার হুকুম আদায় করে পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলেম যখন, তখন হাফ-হলিডের ল্যাজুরটুকু আছে বাকিটা বাদ।'

'মার খেলে না বাড়িতে এসে দাদামশায়?'

'খিদে ছিল না ভাই, দুটো কুচোগজা খেলাম, রামলাল বললে হয়েছে তো প্রমোশন? আমি বললাম—হয়েছে, দুধ খাব না, নিয়ে যাও। প্রমোশন নিয়ে আর কিছু গোলমাল হল না।'

'কেন?'

'আবার কেন? দুধের বাটি চাপা পড়ে গেল।'

'তারপর?'

'কত আর দুধের বাটি চাপা দিই। মাস্টার গেল টের পেয়ে—সেকেন্ড বেঞ্চির উপরে আর উঠতে প্রমোশান হয়নি। 'দি র‍্যাম' একশোবার—তার মানে একশোবার লেখার হুকুম দিয়ে পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেল। ইস্কুল-ঘোড়া পুজোর ছুটি পেলে, আক্কেল সহিস সেও পেল—কেবল আমিই পেলাম না ইস্কুলের পড়া থেকে ছুটি। রামলাল চাকর খাতা বেঁধে আনলে রুল টেনে।'

'কী মুশকিল দাদামশায় কী করলে?'

'কী আর করব! রুল-টানা খাতার পাতা তো নয়, যেন ইঁদুরকলের শিক-পরানো দরজা!'

প্রথম পাতায় 'দি র‍্যাম' ভরতি করতে, আর 'দি র‍্যাম' কটা পড়ল খাঁচাকলে গুনতে ষষ্ঠীর সকাল কাটল। দ্বিতীয় পাতা লিখব, গেছি ভুলে 'দি র‍্যাম' মানে। দি র‍্যাম মানে আর কিছুতে মনে পড়ে না—'দি র‍্যাম' মানে কী লিখি! মানের পাতা খালি রেখে 'যাই' বলে এক হাঁক দিয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়—বই-সেলেট-খাতা ফেলে। এমনি রোজই হয়, 'দি র‍্যাম' পর্যন্ত এগিয়ে মানেতে গিয়ে ঠেকি। হাই তুলছ যে বাদোশাবাবু, ভালো লাগছে না গল্প?'

'লা-গ-চে বলে যাও।'

'ওই খাতা লিখতে লিখতে কোনোদিন ঘুম পায়, কোনোদিন মানে ভেবে ঘুম হয় না রাতে। পাছে হঠাৎ ছুটি ফুরিয়ে যায় মাস্টার এসে পড়ে—এই ভাবনায় ছুটোছুটি করতে পারিনে ভালো করে, খিদেও হয় না দুধের বাটি ভরতি থাকে পড়ে রাতের বেলায়। এই অবস্থায় একদিন ছিরে মেথরের শরণ নিলুম।

'দি র‍্যামের মানে বাংলায় বলো তো দেখি, কেমন পার?'

'কেন ছাগলির মায়ের ভর্তা।'

'ব্যাস আর পায় কে! পাতাজোড়া গোটা-গোটা 'দি র‍্যাম'-আর ছাগলির মায়ের ভর্তাতে খাঁচাকল ভরতি করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ভাই তোমার দাদামশায়।'

'তারপর?'

'দিন দিন মোটাতে থাকলেম, দুধের খিধে বেড়ে গেল। রামলাল থেকে থেকে ভয় দেখায়—খাতা লিখছ না বলে দেব।

'দিয়ো বলে, আমি খাতা লিখে শেষ করে দিয়েছি—দেখে নাও।'

'এক পাতায় একশোটা করে লেখা দরকার, এ যে একটাতেই পাতা ভরতি করে রেখেছ। এ খাতা চলবে না, আমি আবার খাতা আনব।'

'বা রে আমি দু-বার করে খাতা লিখব নাকি?'

'চলো খাতাঞ্চিখানায়, যোগেশ দাদা এর বিচার করবেন।'

'চলো, চলো না তুমি আগে চলো, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

'গেলে না সরলে মাঝপথ থেকে দাদামশায়?'

'আরে ভাই সে রামলাল তাতে কদিন দুধ না পেয়ে চটেছে—গ্রেপ্তার করে হাজির করলে খাতাঞ্চিখানায় বিচারকের সামনে। কদমছাঁটা পাকা চুল বুড়ো বাঘের মতো পাকা গোঁফ গলায় সাদা সাপের মতো পইতে, বড়ো-বড়ো চোখ, সামনে খাতা বাকসো পাশে রুপো-বাঁধা হুকো—ফরাসে বসে উঁচু বৈঠকের পরে।'

'কী রামলাল, ছোটোবাবাকে ধরেছ কোন অপরাধে?'

'আজ্ঞে খাতা লেখায় ফাঁকি দিচ্ছেন।'

'খাতা দাও, এক কল্‌কি তামাক সাজো দেখি। বসো ছোটোবাবা তক্তায় উঠে বসো।'

আমি উঠে বসতে বললেন, 'গোবর্ধন দাও তো তোমার চশমাটা, ভালো করে বিচার করে দেখি খাতা।'

আমি বললেম, 'চশমা যে তোমার নাকেই রয়েছে যোগেশদা।'

'ছোটোবাবা হাসালে। সূক্ষ্ম বিচার করতে হলে ডবল চশমার দরকার।'

আমি বললেম, 'আমার দোষ নেই, দুধের বাটি দিইনি বলে রামলাল রেগেছে।'

'আচ্ছা সে বিচার পরে, দেখি খাতা, কী লিখতে দিয়েছিল মাস্টার?'

'দি র‍্যাম আর তার বাংলা মানে।'

'বেশ, দি র‍্যাম—এ তো দিব্বি হয়েছে, পাতাজোড়া খাতা, দেখি তো মানেটা—'ছাগলির মায়ের ভর্তা' বলেই বাকসোতে এক চাপড়। রামলাল হুঁকো হাতে হাজির ঠিক সময়ে। যোগেশদা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—হুঁকো হাতে পেয়ে ঠান্ডা।'

'রামলাল ছোটোবাবার দুধ কতটা বরাদ্দ?'

'আজ্ঞে দেড় সের দু-বেলা।'

'গোবর্ধন দেখো তো খাতা।'

গোবর্ধন খাতা ধরে দিলে কিছু না বলে।

'যাও ছোটোবাবা তুমি খালাস—লেখা খুব ভালো হয়েছে।'

আমি দৌড়।

'তারপর দাদামশায়, রামলালের কী হল?'

'তা দেখবার ইচ্ছেও হল না সময়ও হল না। বৈকেলে দেখি দুধের বাটিতে পুরু সর—'ও, রামলাল আমি সর খাইনে যে।'

'হুকুম হয়েছে ঘন দুধ খাওয়াতে যোগেশ মজুমদারের।'
'সর তুলে নাও।'
'একদিক ভেঙে চুমুক দাও না—দুধ আছে তলায়।'
'চুমুক দিই' দুধের গন্ধ পাই দুধ পাইনে।
'এ কী হল? দুধ কোথা গেল?'
'দুধ ঘন করতে করতে মরে গেছে—সরটা খেয়ে ফেলো।'
'না কাল থেকে বল্‌কা দুধই দিয়ো।'
'তাই হবে কিন্তু মজুমদারমশায় আর টের না পায়, আমার তা হলে তোমার চাকরি করা চলবে না।'
'কোথায় যাবে রামলাল?'
'জবাব হলে আর কোথায় যাব?—বর্ধমানে দেশে চলে যাব।'
'তা হলে সীতেভোগ এনে দেবে কে?'
'তবে আর নালিশ কোরো না দুধের।'
'করি তো আমার নাম নয়—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।'

* * * *

'ব্যাস দাদামশায়, একদম ডিসাপিয়ার!'
'কী গজা না খাজা?'
'তোমার রুপোর ঘটির ঢাকা!'
'কী হবে এখন? একদম পুলিশ-কেস দাদামশায়!'
'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বাদোশাবাবু! এ তো সেকাল নেই যে প্যাঁজ খেলে মুখে গন্ধ করবে না। চোর ধরা যাবেই, জিনিসটা একদম যখন ডিসাপিয়ার করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে বাদোশাবাবু?'
'দাঁত মাজছিলাম সকালে উঠে।'
'তোমার সামনে থেকে ডিসাপিয়ার?'
'একদম দাদামশায়!'

একদম ডিসাপিয়ার নট হিয়ার নট দেয়ার নো হোএ্যার!
হু ইট আগুন, মস্ট ভমিট কয়লা
ফায়ার কখনো ছাইচাপা রয় না
ঢাকা আছে হয় নিকটে
নয় দূরে মেল্টিং পটে
বাদোশাবাবু নো ফিয়ার
ঘটি-বাটি টেবিল-চেয়ার নাইট্ মেয়ার
এই এ্যাপিয়ার এই ডিসাপিয়ার!

'বাদোশাবাবু, ঢাকনির ভাবনা ভেবে আর লাভ নেই। বলো তো ঘটিটা এখন দেখতে লাগছে কেমন?'

'ভারতযুদ্ধে কাটা-পড়া ঘটোৎকচ যেমন!'

'হিয়ার হিয়ার, থ্রি চিয়ার, হেড ডিসাপিয়ার টেল এ্যাপিয়ার।'

'চোখের সামনে থেকে ঢাকনাটা ডিসাপিয়ার দাদামশা!'

'তা না হলে ঘটোৎকচ তো এ্যাপিয়ার হতে পারে না, বাদোশাবাবু—।'

'আচ্ছা সচক্ষে ডিসাপিয়ার-এ্যাপিয়ার হতে দেখেচ কিছু তুমি!'

'কেন এ প্রশ্ন হল আগে বলো।'

'আমার তো মনে হয় দাদামশা, একবার ডিসাপিয়ার হলে আর এ্যাপিয়ার হয় না—'

'হয় ভাই যদি না বগীচাসাই হয়ে যায় জিনিসটা।'

'বলো তো শুনি কেমন?'

'বলি শোনো স্বচক্ষে দেখেছি স্বকর্ণে শুনেছি যা—'

'পালকিগাড়িটি ছোট্টো, তার চেয়ে ছোট্টো ঘোড়াদুটি, গাড়ি-ঘোড়ার চেয়ে ছোট্টো কোচমানটি, শনিবারে শনিবারে তাতে চড়ে ও বাড়িতে এসে নামতেন একটি ভদ্রলোক, নাম ভুলে গেছি—ওই মিশিরের মতো লম্বা-চওড়া শুধু রংটা কালো আর গোঁফজোড়া পাকা ঠিক যেন কলাদুটো। দেখতে পাচ্ছ তো বাদোশাবাবু?'

'পষ্ট দেখেছি ছোট্টো পালকিতে চারখানা চাকা, তাতে দুটি ছোটো-ছোটো সাদা ঘোড়া জোতা, বাচ্ছা কোচমান কোচবাক্‌সে বসে'.

'বলে যাও থামলে কেন?'

'দাদামশায়, তার মধ্যে কী করে অতবড়ো মানুষটি ঢুকতেন বার হতেন তা তো বুঝলেম না!'

'তুমি বুঝবে কী! আমি এখনও বুঝলেম না।'

'তুমি দেখেছিলে ঢুকতে বার হতে?'

'স্বচক্ষে দেখা মানুষটি গাড়িতে ঢুকতেন যেন ডিসাপিয়াব হয়ে যেতেন, বার হতেন যেন এ্যাপিয়ার হতেন।'

'এ তো ভারী মজার কথা!'

'আরও মজা আছে শোনো—বাড়ির উত্তরধাবে আস্তাবল, সেখানে থানজুড়ে বড়ো ঘোড়া বাঁধা থাকে। ছোট্টো গাড়ি ছোট্টো কোচমান অশথতলায় ঘোড়া খুলে দেয়, গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে রোদে, ঘোড়া চরে খায় ঘাস-পাতা যা পায়, ছোট্টো কোচমান ছুটি পেয়ে খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোয়; এমনি প্রতি শনিবার দেখি।'

একদিন দেখি সোরগোল পড়ে গেছে। বাড়ির যত সহিস কোচমান দরোয়ান চ্যাঁচাচ্ছে এ ক্যা তাজ্জব ঘোড়া কাঁহা গিয়া? ঘোড়া না পেয়ে কাঁদতে লেগেছে ছোট্টো গাড়ির ছোট্টো কোচমান।

দৌড়োলেম দেখতে! রইরই পড়ে গেছে। এ বাড়ি ও বাড়ি সবাই খুঁজছে ঘোড়া—ঘোড়া একদম ডিসাপিয়ার! কেউ বলে বাবা এ সাগররাজার ঘোড়া ইন্দর রাজা চুরি করলে নাকি। কেউ বলে, আরে একী হয় দেখো না ছাগল হয়ে চরছে; আরে না না দেখো—ওই বাগানের বাঁধা নহরে জল খেতে গিয়েছিল, পড়ে ভেসে গেছে গঙ্গামুখে! আর একজন বলে, ওরে দেখো চিলে খরগোশ ভেবে তেঁতুলগাছে তুলে নেয়নি তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি আকাশ-পাতাল ভাবা চিন্তা করা চুকতে রোদ পড়ে এল — হঠাৎ সেইসময় ঘোড়ার লাথালাথি। চিঁহি-চিঁহি শব্দ শুনে খেলা ছেড়ে গিয়ে দেখি বাগানের মধ্যে একটা ভাঙা ইস্টিমারের বয়েলার, তার মধ্যে থেকে একটা ঘোড়ার ল্যাজ ধরে টেনে বার করলে ছোট্টো কোচমান — আর-একটা ঘোড়া পিছু হেঁটে এ্যাপিয়ার হল ওইভাবে বয়েলার ছেড়ে।'

'ঘোড়াদুটো কতবড়ো ছিল দাদামশায়?'

'বয়েলারের চোঙার ব্যাসটা যত বড়ো তার চেয়ে কিছু ছোটো ছিল সেটা ঠিক!'

'তাই একেবারে বগীচাসাই হয়ে গেল না, ডিসাপিয়ার হয়ে খানিক বাদে আবার এ্যাপিয়ার হল!'

'বগীচাসাই কথার মানে কী বলতে পার দাদামশায় —'

'ওই তো বলেছি— যেমনি বগীচাসাই অমনি আর দেখা নাই, ইংরিজিতে ওর মানে হয় না, বাংলাতে-উরদুতে-সমষ্‌কৃততে-পালিতে-উড়িয়াতে ওর জোড়া কথা আছে কি না!'

'কথার মানে বার করবার জন্যে তোমার এত ঝোঁক কেন বলো তো, অনেক কথা আছে যার মানে ডিসাপিয়ার করেছে অথচ কথাটা চলছে।'

'যেমন?'

'এই তো ভাই বাদোশাবাবু জবাবদিহিতে ফেললে — এই যেমন, এই যেমন —'

'বুঝেছি দাদামশায়, বিদ্যেসাদ্দিও বগীচাসাই হয়ে গেছে তোমার।'

'এই মনে পড়েছে—বোমকালী কলকাত্তালী—ওয়েব্স্টর শব্দকল্পদ্রুম বিশ্বকোষ বাংলা পরিভাষা চাপা পড়ে, দেখো ওর মানে কোথাও পাবে না খুঁজে!'

'আচ্ছা ওকথা যাক, তারপর দাদামশা?'

'এতক্ষণে তারপর কী চলে আর, আজ রাতে বাদোশাবাবু, বগীচাসাই হয়ে গেছে সাতের গল্পটা।'

'দাদামশা ওসব কোনো কাজের কথা নয়, সাতের গল্প তোমার সাতপাক নাকফাঁসে পড়ে গেছে।'

'কেন বলো তো বাদোশাবাবু?'

'ষষ্ঠীর দিনে কাবুলিকে তুমি দুর্গানাম শুনিয়েছ, এ তারই ফল।'

'কেন শোনাব না। সে যে আমাকে এত আঙুর পেস্তা খিসমিস বাদাম দিয়ে গেছে।'

'সেগুলো কোথায় গেল, ডিসাপিয়ার হয়ে গেছে নাকি?'

'আরে ডিসাপিয়ার হলে তো এ্যাপিয়ারের আশা ছিল, বগীচাসাই হয়ে গেছে—'

'আঙুরের বিচিগুলো—'

'বাগানে ফেলেছি তো—'

'তা হলে গজাবে—এ্যাপিয়ারও হবে।'

'যতন কর তো হবে।'

'কেমন করে যতন করতে হবে আঙুরগাছের, কে বলে দেয়।'

'কেন ঈশ্বর গুপ্ত।'

'তিনি আছেন না—'

'নাই থাকুন, তাঁর উপদেশ আছে—ছাপার অক্ষরে ছাপা, বলি শোনো—'

> 'আঙুরগাছের কিছু করি বিবরণ, মাচা বিনা তরুবর
> বাড়ে না কখন
> ফলফুল সুমধুর কিছুই ধরে না, অল্প দিনান্তে
> বৃক্ষের প্রাণও রহে না,
> কিন্তু এক মঞ্চ যদি পায় সে আশ্রয়, শাখাপল্লবে
> প্রতিদিন উন্নত সে হয়।'

'কাল সকালেই একটা মঞ্চ বাঁধা চাই দাদামশা।'

'বিনা শ্রমে আঙুরলতা না পারে বাড়িতে, নিতান্তই মরে যায় পড়িয়া মাটিতে—'

'ফলবে তো দাদামশায়!'

'নিশ্চয়! 'ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল, তবেই সফল সব যদি হয় ফল।'

'মঞ্চ কে বাঁধবে?'

'কেন, বাগোয়ান মালি তো আছে—'

* * *

'দাদামশায় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কী?'

'সে গল্পটা আমি আজ সকালে উঠে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'সে একেবারে ছিঁড়ে ফেলে দিলে? রাখলে কাজ হত। মাসিকে বেচে ছোড়দাদা দুটো পয়সা আদায় করত।'

'তারপর কী হত বাদোশাবাবু!'

'আমি তার থেকে কিছু আদায় করে নিয়ে চট্‌পটি কিনতেম।'

'চটপটি দেখেছ দাদামশায়?'

'দেখিনি আবার? চটজলদির ছোটো ভাই।'

'আশ্চর্য তুমি কি সব দেখেছ?'

'সব আশ্চর্য দেখে কি কেউ শেষ করতে পারে? এখনও দেখার বাকি আছে অনেক।'

'শুধু দাদা, বলে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য 'কিং কং'—নতুন একেবারে।'

'হেঃ নতুন। কতকাল আগে কিং কং-এর উপর ছড়া তৈরি হয়ে গেছে আমার ছেঁড়া খাতায় তা জানো?'

'বলো তো শুনি ছড়াটা।'

'কে তুমি জীব মীন কে তোমার বহে ভার
কারে-বা তুমি বও তাই কও!
কং স্বরূপের অংশরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে অন্ধকূপে
বন্ধ হয়ে করি কিং।
ডাঙায় উঠে ডিম পাড়ি, জলে নামি ধরি মীন,
কাদাজলে ঘোদাজলে কং ক'বক অংশ
জগতে কং জানো সার
কং বিনা কিং আছে আর
কিং থাকে আর কং হলে ধ্বংস ভেবে লও।'

'আচ্ছা পৃথিবীতে তা হলে অষ্টম আশ্চর্য নেই?'

'নেই, যদি না কস্টম-হাউসটাকে বলে অষ্টম আশ্চর্য।'

'আর কী হবে ছেঁড়া গল্পটাকে সাড়ে-সাতের কোঠায় ফেলে নতুন করে অষ্টমে চড়ানো যাক আটের গল্পটা।'

'অষ্টম আশ্চর্য গল্পটা লিখে ছিঁড়লে কেন দাদামশায়—ভারী অন্যায় করেছ।'

'কেন ছিঁড়লেম বলি যদি তো অষ্টম আশ্চর্যের চেয়ে আশ্চর্য লাগত তোমার।'

'আচ্ছা বলো শুনি কেন ছিঁড়লে।'

'তাও বলবার জো নেই—তা হলে বলতুম।'

'তবে কী দাদামশায়? অষ্টম চড়ানোর মানে কী দাদামশায়?'

'সে ভাই কস্টমের একশেষ। চুলোতে চড়ালে একমুঠো ছাইপাঁশও পাওয়া যায় কিন্তু অষ্টমে চড়ালে— ধনদৌলত মানসম্ভ্রম ঘরবাড়ি খাট-বিছানা গহনাগাটি জমিজমা-জমিদারি কিছু আর থাকে না।'

'কোথায় যায়?'

'পাঁচ ভূতের কবলে পড়ে উপে যায় বাষ্প হয়ে শূন্যে।'

'দাদামশায় তোমার ভুল হল। বাষ্প হলে মেঘ হয়, মেঘ হলে বিষ্টি হয় পড়েছি; তুমি চড়াও গল্প অষ্টমে নির্ভয়ে দাদামশায়।'

'আচ্ছা তাই হোক—

শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে
তবু কতক বাঁচি প্রাণে
বকবকানি ঢের হয়েছে, বসি এবার কোমর এঁটে
অষ্টমীতে আসবে যারা
আমার হয়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেব
হাত বুলায়ে তাদের পেটে।

'ছেলেবেলায় ঘোষাল মাস্টার ছিলেন আমাদের। তাঁর ভুঁড়ি এত শক্ত ছিল যে মেড়া তেড়ে ঢুঁসোলে মেড়ার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত বোধ হয়। বিদ্যেতে-ঠাসা ভুঁড়ি সর্বদা তাতে আমি হাত বোলাতেম— ঠিক যেন একটা হলুদ চামড়ার রাবুণে ফুটবল।'

'তোমাদের তখন ফুটবল খেলা হত ওই মাঠে দাদামশায়?'

'আরে না ভাই, ও-মাঠও ছিল না ফুটবলও ছিল না—মাঠের জায়গায় ছিল পুকুর, ফুটবল ওঠেনি তখন; সেই পুকুরে চিৎ-সাঁতার দিতেন মাস্টর, মনে হত যেন একটা সোনাব্যাঙ প্রকাণ্ড গামলা-পেট উঁচু করে ভেসে বেড়াচ্ছে পুকুরে। রোদ-জল-তেলে চিকচিক সেই ভুঁড়ি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো ঠেকত আমার কাছে।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন ভাই সেই ভুঁড়ির জুড়িদার আর-এক কালো চিনেমাটির মতো ভোজপুরি ভুঁড়িদার এসে উপস্থিত—যুদ্ধং দেহি বলে।'

'কীসের যুদ্ধ?'

'শোনো না বলি। আগে তো ফুটবল খেলার রেওয়াজ ছিল না, কার ভুঁড়িতে কত ধরে, এই নিয়ে লড়ালড়ি চলত টাকা বাজি রেখে।'

'তারপর?'

'যুদ্ধং দেহি বলে তো এল ভোজপুরি, কিন্তু কে যুদ্ধ দেয় তার সঙ্গে?'

'কুম্ভকর্ণের প্রায় তার খাওয়ার বাড়াবাড়ি
দেখে লাগে হৃৎকম্প, কে করে আড়াআড়ি?
পেটুক অনেক ছিল চাকর নফর
কেহ না—আগাতে চায় তার বরাবর।
ঘোষাল বলেন খোসাল হয়ে ভঙ্গ দিব কী কারণ?
বঙ্গের রাখিতে মান আমি দিব রণ।
ছাতুখোর ভোজপুরির কীসের বড়াই
জানে না ফলারে পুরি কত গন্ডা খাই।
বজ্রসম ভুঁড়ি দেখো বিরাট কঠিন
হেসে-খেলে তলাতে পারি মন দুই-তিন।
কুড়ি তঙ্কা বাজি পড়ে তবে শর্মা লড়ে
নচেৎ লোটা-কম্বল নিয়ে যাক ব্যাটা ঘরে।
সহি বলে তিন হাঁড়া দহি করি পার
ভোজপুরি গোঁফ মুচড়ি হল আগুসার।
রামলাল বলে বুঝি টুটে এবার বাংলার অহংকার
ঘোষাল বলে পাল্লা দেয় এত শক্তি কার?'

'তারপরে?'

'তারপর ভাই কুড়ি টাকা বাজি ফেলে লড়াই শুরু হল। দুই মুদি এল, একজন হিন্দুস্থানি, একজন বাঙালি। দুটো চুলো ধরানো হল গাড়িবারান্দার দুই মুখে। মধ্যে একদিকে যত বাঙালি চাকর-বাকর সরকার-গোমস্তা, আর-একদিকে যত খোট্টা বেহারা আর দারোয়ান। মথুর দারোয়ানকে মধ্যস্থ করে বাজি খেলা আরম্ভ হল— কে কত রসগোল্লা খেতে পারে, যে প্রথমে এলবে তারই হার।'

'চুলোতে রস আর রসগোল্লা যেমন পাকছে অমনি দু-জনের পাকযন্ত্রে চলে যাচ্ছে টপাটপ।

রসগোল্লা ওড়ে পর্বতপ্রমাণ
সমান উভয়ে উভয়ে কেহ না পিছান
কস বেয়ে রস গড়ায়, দেখতে বিপরীত
কে জানে কে-বা হারে কার হয় জিত।

ছুঁচটি পড়ে তো শোনা যায় এমন স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে, কী হয়, কী হয়! যে ওজন ফুকরে চলেছে সে হাঁকলে—রামলাল তেওয়ারি এক মনের পরে সাড়ে সাত—অমনি তেওয়ারি 'বাপ' বলে চিৎপাত! ঘোষাল মাস্টার একমন আট সের উড়িয়ে ধীরেসুস্থে কড়াই ধরে রসগোল্লার রস সবটা গলায় ঢেলে কুড়ি টাকা ট্যাঁকে গুজে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে আচমন করতে উঠলেন।

'তারপর?'

'তারপর আর কী? সব চুপচাপ সরে পড়ল যে-যার। বৈঠকখানার একতলায় চ্যাঁচামেচি করবে, হুর্‌রো ওঠাবে এত সাহস তখন কারও ছিল না।'

'তা হলে কী হত দাদামশায়?'

'সে না খেলে বুঝবে না পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কস্টমের চূড়ান্ত।'

'তুমি খেয়েছিলে?'

'অনেকবার!'

'এখনও খেতে ইচ্ছে হয়?'

'এ বয়সে নয়, সে বয়স যদি ফিরে পাই তো রাজি আছি।'

* * * *

'দাদামশায়ের বুঝি যত চাকর-বাকর সহিস কোচম্যানের সঙ্গে আলাপ!'

'আরে ভাই তারা কি তোমার আজকালের পিলে-গোবিন্দ না যেদো মেথর— হেঁজিপেঁজি লোক ছিল না তারা, সব তারা কেতাদোরস্ত মানুষ ছিল। সভ্যভব্য দুটো ভদ্রলোক এলে তাদের খাতির করে তুষ্ট করে দিতে পারত, তাই তো তাদের ঘরখানার নাম ছিল তোষাখানা। এখনকার বাবুদের বৈঠকখানাও তেমন ফিটফাট নয়! ছমৃশের কোচম্যান যখন সেজেগুজে গোঁফ চুমড়ে, বৈকালে আস্তাবোলের ছাতে খাটিয়াতে বসে গড়গড়া টানত, তখন বোধ হত টিপু-সাহেব ছবি ছেড়ে বেরিয়েছে! আরবি ঘোড়াতে আর গাধাতে যতটা তফাত, তখনকার চাকরে এখনকার চাকরে ততটা তফাত। মোহনলালসিং জমাদার, কী চেহারা কী দাড়ি-গোঁফই ছিল তার! শ্বেতচামর রনজিৎসিংহ মিলিয়ে একটা ব্যাপার। দাড়ি মাজত। রোজ সে একপোয়া দই আর কেশরফুলের গুঁড়ো মিলিয়ে; দেউড়ির রাজা বললেও হয়! বুদ্ধু হরকরা, বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার, মজলিশি চেহারা সাজগোজ এমন যে দেখলে ইচ্ছে হত হরকরা হই নয় তামাক খাই গের্দা ঠেসান দিয়ে।

'বিশ্বেশ্বর কী তামাকই সাজত। গন্ধে তর হত বাড়ি। ভিস্তিখানার একটা লম্বা টেবিলে সকাল থেকে সারিসারি ধরা থাকত সট্‌কা—ছ-হাত নল ছাড়া যা টানাই যেত না, গুড়গুড়ি — সান্ত্রি খাড়া বন্দুকের নল উঁচিয়ে, গড়গড়া — যেন গদীয়ান মহাজন গতানে ভুঁড়ি, বাঁধা হুঁকো—পিলে-রোগা লম্বা-গলা কালো কোলো পাড়াগেঁয়ে জমিদারটি। তারপরে কল্‌কি ধুনুচি! যে যেমন দরের মানুষ তার জন্যে তেমন দরের তামাক সাজত বিশ্বেশ্বর।

'আমি এক-একদিন তামাকের লোভে যেতেম; বিশ্বেশ্বর অমনি সট করে সট্‌কার উপরে থেকে কল্‌কিটা তুলে নিয়ে বলত চটজলদি টান দিয়ে সরো। মুখে খানিক গোলাপজল আর গুড়গুড় গন্ধ ভরতি করে দে দৌড়, দোতলা থেকে বিশ্বেশ্বর বলে হাঁক কানে পৌছোতে না পৌছোতে।'

'তারপর?'

...'তারপর শোনো না এক মজার কথা।—চায়ের দোকানে যেমন সকাল থেকে লোক ঢোকে আর বার হয়, তেমনি সস্তার তামাকখোররা বিশ্বেশ্বরের ভিস্তিখানায় আনাগোনা করত। ওর মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের মণিখুড়ো, তিনি এই গল্পটা করতেন: বাবা, প্রথমটা তামাক ধরালে বিশ্বেশ্বর। তখন পয়সার নামগন্ধ করলে না। হরদম তারা চালায়: যখন দেখলে নেশা বশে জমেছে, তার দোরে দু-বেলা দু-ছিলুমের জন্যে ধরনা দেওয়া ছাড়া আমি অনন্য গতি, তখন তুললে পয়সার কথা মহালয়ার ঠিক পূর্বদিন —

'দেখো বাবু উপরি পাওনা থেকে এতকাল তোমার তামাক জুগিয়েছি এবার পার্বনী থেকে তোমার কিছু জমা না দিলে তো চলবে না।'

আমি বলি, — 'দেখো বিশ্বেশ্বর, গরিব ব্রাহ্মণ আমাকে মেরে তোমার কী লাভালাভ?'

'সেকী, আমি হলেম আপনাদের চাকর, হুকুম করেন আমি কাল থেকে ভিস্তিখানার ফর্দতে আপনার নাম তুলে দিই। যোগেশমামা দেখি দু-ছিলিম দশ ছিলিম যা বরাদ্দ করে দেন আমি দেব, আমার কী। তখন বেখরচায় যত পার সরকারি পয়সা পোড়াও মনের সাধে!'

আমার মাথায় তো বাবা বজ্রাঘাত হল—যোগেশমামার ফর্দ ধরা মানে কর্ণমর্দন, তদুপরি তামাকের আশা বিসর্জন! কী করি—টালমাটাল করে সেদিনটা তো গেল। তার পরদিন হুঁকো টেনে কেশে মরি, নিছক দা-কাটা ঝেড়েছেন বিশ্বেশ্বর!

বললেম, 'ও বিশ্বেশ্বর কাশরোগ ধরবে নাকি!'

'কড়া হয়েছে? তা বেশ বৈকালে কিছু ভেল্‌সা দেওয়া যাবে।'

বৈকালে বিশ্বেশ্বর এমন ভেল্‌সা চালালে যে খালি কুয়াশা খাচ্ছি।

'ও বিশ্বেশ্বর এ যে বিষম নরম।'

'কী করি বলেন, তামাকের বাজার বড়ো গরম হয়েছে, আবগারি টেক্‌সো চেপেছে, বিশ্বাস না হয় ছোটেলালকে শুধতে পার, সে কাল তামাকের পাতা কিনেছে।'

মহাকাল কাটল এইভাবে।

পুজোর বাজারে সেবার নতুন উঠেছে 'পম্পসু'। পার্বনীর টাকা-কটা তাতেই আটকে ফেললেম।

একখানা চিরকুট কাগজে গোল করে একটা খোলামকুচি জুড়ে ষষ্ঠীর দিনে বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেম, 'চটপট দাও এক ছিলুম। খেয়ে পুজোবাড়ি ঘুরে আসি, বাবা।' আঙুলের টিপে চিনত বিশ্বেশ্বর

কোন তামাকের কী টিকের কত দর! কোনো কথা না বলে বাঁধা হুঁকোয় কল্‌কি চাপিয়ে হাতে তুলে দিলে; টান দিই খালি হাওয়া আর একটু কাগজপোড়া গন্ধ। বৈঠকের পরে হুঁকোটি নামিয়ে রেখে নতুন পম্পসুজোড়া কোঁচায় বেশ করে মুছে উঠে পড়লেম, বিশ্বেশ্বর একবার আড়-চক্ষে দেখে নিলে জুতোটার দিকে।

এই পর্যন্ত হয়ে রইল ষষ্ঠীর দিনে।

ক-দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি পান-তামাক খেয়ে কাটালেম। বিজয়ার সন্ধেবেলা— বিশ্বেশ্বর তেগে আছে কখন যোগেশমামাকে প্রণাম করতে যাই। ফাঁকতালে আমিও সট করে ঢুকেছি দেওয়ানখানায়। বুড়াকে প্রণাম করে কোলাকুলি সেরে মিষ্টিমুখ করে চুকেছি, কোথা ছিল বিশ্বেশ্বর, হুঁকো কল্‌কি আর ফর্দ-হাতে হাজির। ফর্দখানা যোগেশমামার দিকে আর হুঁকোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাঁড়াল। আমি তো অধোবদন। মামা ফর্দ দেখে বললেন, 'কী বাবাজি— ধরা হয়েছে দেখছি। ফর্দে ক-ছিলুমের বরাদ্দ ধরব বলে ফেলো, লজ্জা কী।'

'যাই! দাদা ডাকছেন,' বলেই তো আমি চম্পট। হো-হো হাসির মধ্যে সেদিনটাও চুকল—

পাঁচ-দশ বাড়ি বিজয়ার কোলাকুলি ঠাকুর-বিসর্জন দেখে ফিরতে রাত প্রায় কাবার! তাড়াতাড়িতে পম্পসুজোড়া ভিভিখানার আলমারির তলায় লুকিয়ে, সোজা চলে গেলেম চানঘরে। বিশ্বেশ্বর দেখলেম বেঞ্চেতে পড়ে বেহুঁস নাক ডাকাচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখি, হুঁকো কলকি-হাতে বিশ্বেশ্বর!

'ফর্দে নাম উঠে গেছে খুড়োমশায়, নেন দেখেন ভালো তামাক সেজেছি কি না।'

কী বলব বাবা— ঢের-ঢের বাড়িতে তামাক খেয়েছি, সে তামাকের সোয়াদ কোথাও পাইনি। পেটভরে টান দিয়ে কল্‌কিটাকে ফাটিয়ে তবে ছাড়লেম। জুতোজোড়াকে হাতড়াতে গিয়ে দেখি নেই। রগটা ঝনাৎ করে উঠল, গুম খেয়ে গেলেম।

বিশ্বেশ্বর বললে, 'কী ভালো হয়নি তামাক? আর-এক ছিলুম সাজব?'

'নাঃ,' বলে একবার তোষাখানার বারান্ডা ঘুরে জুতো খুঁজে এসে বললেম, 'জুতোজোড়া ছিল, দেখেচ বিশ্বেশ্বর!'

আজ্ঞে না, কোথায় রেখেছিলেন? উপরে বাবুকে তামাক দিয়ে আসতে দেখলেম একপাটি জুতো চিৎ হয়ে সিঁড়ির তলায়, আর-এক পাটি উপুড় হয়ে পড়ে, দেখেন যদি কুকুরে টেনে ফেলে থাকে।'

গিয়ে দেখলেম আমারই ছেঁড়া চটিপাটি অনেক দিনের হারানো।

তখন উপরে নন্দ-ফরাশ ঘর ঝাঁটাচ্ছে তারই শপ্‌শপ্‌ শব্দ ক্রমে সিঁড়ি বহে বারান্ডার দিকে চলে গেল। আমি সারা বাড়ি খুঁজে, হায়রান, বুঝলেম, এ বিশ্বেশ্বরেরই কাজ। ভালোমানুষি করে বললেম, 'দেখো যা হবার হয়েছে বচ্ছরের দিনটা আর দুঃখু দিয়ো না, জুতোজোড়া নিয়ে থাকো তো দাও।'

'মশায় আগুন খেয়েছে যে কয়লা ওগরাবেই সে। আমরা গরিব, ফ্যেন্‌সি জুতো নিয়ে কী করব,— দিতেন পয়সা তো একটা নাগরা কিনে পরে বাঁচুতম; যাই বাবুর সট্‌কায় জল ফিরিয়ে আনি,' বলেই বিশ্বেশ্বর নেপথ্যে গমন করলে।

আমিও সট্‌ করে সেই ফাঁকে সট্‌কার মুখনলটা ঘরের আর-এক কোণে গুঁজে রেখে যেখানকার সেখানে গট্‌ হয়ে বসে ডাকলেম, 'ও বিশ্বেশ্বর আর-এক ছিলুম দেবে না?'

'আরে মশায় রসেন, বাবুর সট্‌কাটা দিয়ে আসি। এক মিনিট দেরি হলে কী হবে বোঝেন তো।'
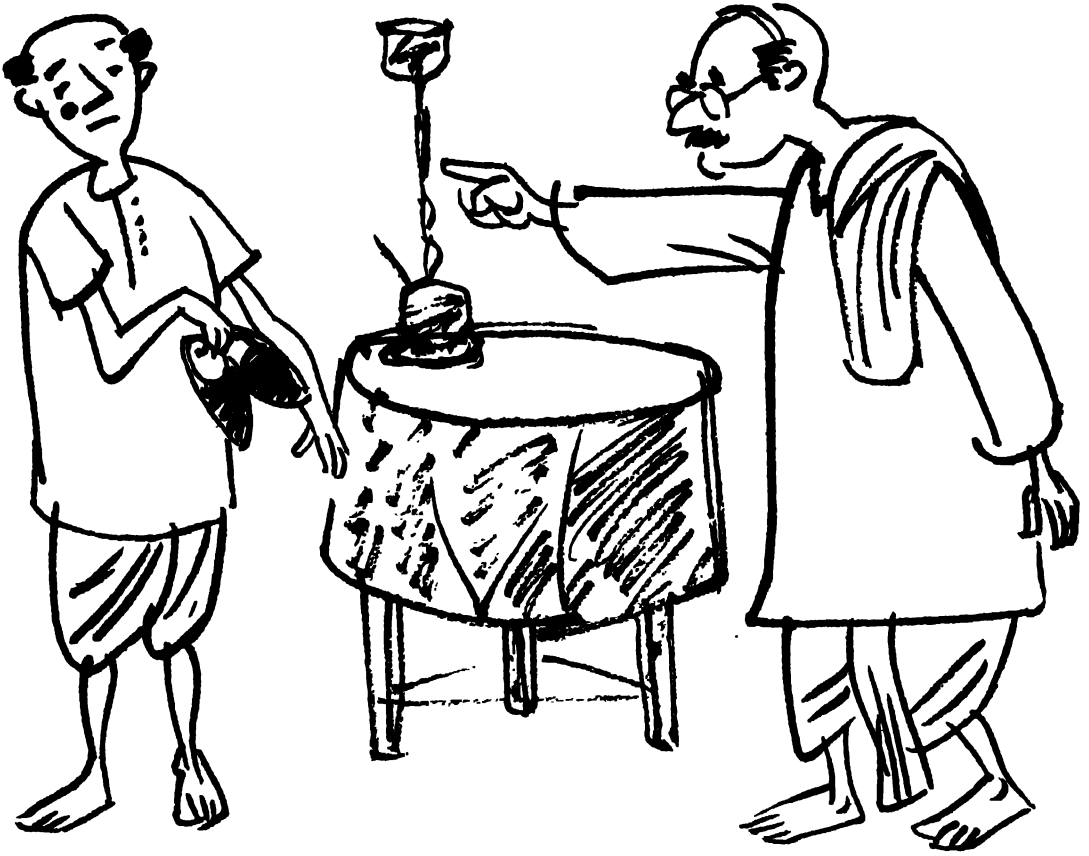
'তা আর বুঝিনে বিশ্বেশ্বর। যাও আমি বসে আছি।'

জল ফেরানো হলো, নলগাঁটা কল্‌কি সরপোষ আখরদান সব ফিটফাট, মুখনল আর পায় না।

'কী বিশ্বেশ্বর খুঁজচ কী?'

'আরে মশায় মুখনলটা!'

'দেখো তো বাবুর কাকাতুয়া পাখিটা এইখানে ঘুরছিল, নিয়ে যদি পালিয়ে থাকে!'

'এই যে টেবিলে রেখে গেলেম এর মধ্যে কে গাপ্পাই করলে?'

'কে জানে বাপু যে প্যাঁজ খেয়েছে তার মুখ গন্ধ করবে, আমারও জুতোটা গেল এ ভালো কথা নয়। তুমি একবার দেখো দেখি খুঁজে জুতোজোড়াটা। আমি দেখি, মুখনলটা গেল কোথায়।'

'তাই দেখা যাক বলে এখানে-ওখানে হাতড়ে—এই যে আপনার জুতোজোড়া দেখেন দেখি।'

'আমি দেখলেম সত্যিই পম্প আমার। ফিরে বললেম ওই যে তোমার মুখনল চকচক করছে ওই কোণে দেখো তো—'

ব্যাস সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হয়ে চুকল—

বিশ্বেশ্বর গেল সট্‌কা দিতে, আমিও দশটার গাড়ি ধরে দেশে যেতে রওনা হলুম। আমি বুঝলুম বিশ্বেশ্বর সদাশিব নয়, বিশ্বেশ্বরও বুঝলেন মণিখুড়ো তোমাদের মুনীশ্বর নন।
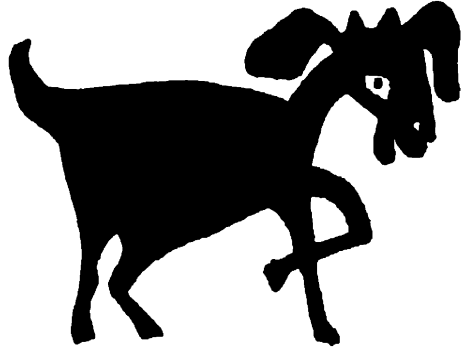
পুথিপালা

লম্বকর্ণ পালা

(শ্রীরাজশেখর বসু কর্তৃক রচিত 'গড্ডলিকা' পুস্তকের 'লম্বকর্ণ' শীর্ষক কাহিনী অবলম্বনে)

প্রথম পর্ব

স্থান — বর্মা অয়েল কোম্পানি, কাল — না সকাল না বৈকাল

অধিকারী, নটবর, নবীন ও নরহরির প্রবেশ

অধিকারী। কই হে, ও লটবর, ও লবীন, লরহরি, মহালয়া এসে যায়; মহালয়ার নাম করো না যে কেউ?

নটবর। অধিকারী মশয়, আমাদের তো সব প্রস্তুত, মহলা দিলেই হয়!

অধিকারী। বলি ও লন্দি, পাঁঠার জোগাড় করলে? পাঁঠা তো চাই একটা পালাগানে।

নটবর। সে জোগাবে ওই লবীন লিউগী!

নবীন। বেশ কথা কথা কও! লিউগী বিউগিল দেবে আবার পাঁঠাও দেবে — এত করে না।

নটবর। কী হে লবীন, ঘাড় চুলকাও যে? পাঁঠা আনছ না?

নবীন। আহা বলেন কেন দুক্ষের কথা, ওই খালপাড়ে দেখলাম, যেমনটি চাই তেমনটি পাঁঠাটি,— দিব্বু হিরিষ্টু-পুরিষ্টু ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, নম্বা নম্বা নটপটে কানের ওপর কচি পটলের মতো দুটি শৃঙ্গ — বয়স বেশি নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু। আমায় দেখে ডাক দিয়ে চলল যেন গীদ গেয়ে করুণ স্বরে ধমক ডাকছে।

নবীনের গান

ম্যা ও ম্যা কোথা যাই গো ম্যা?
বলো কার দোরে পেটভরে খেতে পাইব ম্যা?
নটেশাক মুড়োবে কি —
পুঁইডাঁটার পাই না লাগ — ম্যা ও ম্যা দেখো।
আমার পেট বলছে কী খাই কী খাই
পুঁজি কিছু নাই পাঁঠা কিছু নাই
ম্যা ম্যা বলে ডাকতেছি তাই স্থান দাও ওই ছিরিচরণে!

আমি আদর করে ডাক দিলেম — (সুর দিয়ে) 'এসো যাদু আমার বাড়ি, তোমায় দেব ভালোবাসা',— বোকা ছাগলের জাত,— ভালোবাসা বুঝলে না। গলা জাপটে ধরতে ঢুঁসিয়ে আমায় ফেলে মারলে দৌড়।

অধিকারী। বড় ফসকেছে, যাগ্‌গা! বলি ও লরহরি লাগ,— তুমি দেবা লবমীতে ছাগ, বুঝলে?

নরহরি। আজ্ঞা!

অধিকারী। আর আপত্য তুলো না, লাগ আর ছাগ, ঠিক লাগ মাফিক মিলে গেছে। লাও হে প্রোগ্রম গীদটা ধরো।

নটবরের গান

বেলেঘাটা যাত্রাসদনের বংশীবদন অধিকারী।
ব্যান্ডমাস্টার লন্দি লটবর, লিউগী বিউগিল ফুলট,
আর ছাগলাগ-লরহরি।
কর্নেট ও করতাল, ঢোল, খোল, লবীন, ললিত, ললিন, অধীন;
চপলেট, কটলেট, রাধাকান্ত কেবিন॥
পৃষ্ঠপোষক বর্মা অয়েল অ্যান্ড কোং—
পাত্র-পাত্রী পাঁঠা সমেত উনিশ জন।
বেলেঘাটা যাত্রাসদন বাসাবাড়ি
লম্বকর্ণ পালা করিল সদরালা—বিনানুমতি; রেজিস্টারি!
উইথ কমপ্লিমেন্টস টু গড্ডালিকা প্রিন্টারি।

নটবর। ধরো হে কনসার্ট, ক্রেসিন ব্যান্ড—আর বিলম্ব নয়!

(নরহরির প্রস্থান)

ছোট কনসার্ট

(নরহরির প্রবেশ)

নরহরি। মশয়রা, আমি এইমাত্র দেখে আসতেছি ছাগল।—

অধিকারী। কোথায় কীভাবে দেখে আসতেছ তাই শুনি।

নরহরি। দেখে আলাম ছাগল—বংশলোচনবাবুর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং বলিতেছে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করিয়া।

অধিকারী। রও রও, ছাগল কী বলছে পরে শুনব। বংশলোচনবাবুটি কে তাই কও আগে।

নরহরির গান

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিন্দার,
অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ফুলবেঞ্চ বেলেঘাটার।
বয়ঃক্রম চল্লিশ পার, কিঞ্চিৎ মুটিয়ে
হয়ে পড়েছেন স্থূলাকার
সেই কারণে কনসাল্ট করে ডাক্তারগণে
উপদেশ করেছেন—দুই পায়ে হাঁটিবার।
ছেড়ে ভাত ও লুচি-পুরি
দু-বেলা খান দুই তক্কার কচুরি—
লঙ্কা-মিশানো ঝাল তরকারি;
আর খালপাড়ে বৈকালে হাওয়া খেয়ে করেন পায়চারি,
ঘড়ি ধরে এক্সারসাইজ কয়েকবার।

অধিকারী। তারপর কী হল কও।

নরহরির গান

আরে বংশলোচনবাবু খালপেড়ে চলতে-চলতে
বসে পড়লেন
রুমাল পেতে
নিজের ভারে হয়ে কাবু — গিলে মাটিতে
জুতোপাটিতে কেটে গাবু
আরে বংশলোচনবাবু ঘড়ি দেখে চান —
বাড়ি ফিরে যান সাড়ে-ছটায় —
এধারে বেলেঘাটায় বাতাস হঠাৎ বলে যায় —
ঝড় কী জল হওয়া বিচিত্র নয়;
বংশলোচন হয়ে আনমন বর্মা চুরুট মুখে লন —
এমন সময়...হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।

নটবর। ঝড় উঠল নাকি, হুঁ হুঁ করে?

নরহরি। নাগো। বাবু ফিরে দেখলেন — ছাগল হুঁ হুঁ করে বলছে তাঁর জামা টেনে।

অধিকারী। কী বলছে, তা বুঝলে কী মতে, তুমি মানুষ হইয়ে।

নরহরি। ভাবে বুঝলেম, ভঙ্গিতে বুঝলেম আলাপচারির!

অধিকারী। আচ্ছা কও তো, কী কইলে ছাগলছানাডা, কী-বা কইলেন বংশলোচন।

নরহরি। হঠাৎ পকেটে টান পড়াতে, বংশলোচন সচকিত-সশঙ্কিত কয়ে উঠলেন — 'আরে এটা কোথা থিক্যে? কার পাঁঠা? কেটা আছে কাকেও তো দেখছি না' —। ছাগল কোনো উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তার মাথায় ঠেলা দিয়ে বললেন — 'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।'

অধিকারী। গেয়ে বলো হে গেয়ে বলো।

নরহরির গান

পালা, নইলে শিঙে ফোঁকার পালা, —
শুরু করে দেব লোকজন ডাকি।
রোস তো গর্দান কাটছি, ভাগ নয়তো পালা,
বোকাছাগল পা চালিয়ে পালিয়ে যাবার পালা —
শুরু করে দিয়ে পালা।

অধিকারী। তারপর তারপর? ম্যাজিস্ট্রেরের ধমক খেয়ে কী করল ছাগল?

নরহরি। কান্তি থাকল আর গাইতি থাকল ম্যা ম্যা করে। দু-বার কান্তেই বংশলোচনের মন গলে নয়নে জল বইল। তিনি ছাগলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই — ছাগল দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দু-পা মুড়ে, ঘাড় না বেঁকিয়ে, রায়বাহাদুরকে এক টুঁ —।

অধিকারী। অ্যাঁ! ম্যাজিস্টরকে টুঁ, অ্যাঁ! এ যে অ্যাসল্ট গো, অ্যাঁ। ফুলবেঞ্চ ফাটক! রায়বাহাদুর করলেন কী?

নরহরি। টুঁ খেয়ে রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করলেন, তিনিও দিলেন এক ঠেলা। ছাগল পূর্ব্ববৎ খাড়া রইল, এবং তাঁর হাত হইতে জ্বলন্ত চুরুটটি কাড়িয়া খাইল, এবং আহারান্তে বলিল অড়্-ড়্-ড়্-ড়্? অর্থাৎ, আর আছে?

নবীন। ও ছাগল নয় হে, শাপভেষ্টো, শাপভেষ্টো, বুঝলে? বাগবাজারের তোমার তিনি, সেও আগুনসুদ্ধ বিড়ি ফুঁকত।

নরহরি। না হে, অমন কথা বোলো না, আমাদের তিনি গাঁজার দিক দিয়েও যেতেন না। এ তোমাদের বর্মা অয়েল কোম্পানির আড়তের শাপভেষ্টো কেষ্টোবিষ্টুর মধ্যে কেউ একজন হবেন। না হলে জ্বলন্ত বর্মায় পেট ভরায়?

অধিকারী। যাকগে, তারপর কও।

নরহরি। তারপর একে-একে একটির পর একটি চুরুট নিঃশেষ করে — ছাগলের মাথা-ঘোরা নেই, গা-বমি নেই। আবার যখন বললে অড়্-অড়্-ড়্, তখন বংশলোচন বললেন — 'আর নেই। তুই এবার যা। আমিও উঠি।' ছাগল বিশ্বাস করে না, সার্চ করতে চায় হাকিমের পকেট! বংশলোচন নিরুপায়! চামড়ার ছিগার-কেসটি ছাগলের সামনে ধরে বললেন — 'বিশ্বাস না হয়, এই দেখ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে ছিগার-কেস কেড়ে নিয়ে চর্বণ শুরু করে দিলে।

নবীন। আর রায়বাহাদুর?

নরহরি। রাগবেন কি হাসবেন ঠিক করতে না পেরে—শ্-শালা বলে ঘরমুখো হলেন। ছাগলও নাছোড়বান্দা, তাড়ালে যায় না—চলল রায়বাহাদুরের সঙ্গে।

অধিকারী। কিছু বলতে বলতে গেল ছাগলটা, না এমনি মুখ বুঁজে গেল?

নরহরি। মুখ বুঁজে যাবার ছেলে কিনা — রাস্তার দু-ধারে কারু টবের গাঁদা ফুলের গাছ চিবোয় আর চলে। শেষে উড়ের দোকানে ডালমুট, তিলকুট, বিস্কুট—প্রায় এই আমার সাড়ে-তিন গ্রাস লুটে — বিচারকের পিছনে পিছনে ঢুকল গিয়ে — তারপব কী ঘটনা ঘটল আন্দাজ করেন।

অধিকারী। রাখো তোমার ভূমিকা, তারপর কিছু জানো তো বলো।

নরহরি। আমি কি রায়বাহাদুরের বাড়িতে ঢুকতে গেছি যে বলব কী হল? তারপর আর কী। আমার কথাটি এখানে ফুরোল নটেশাকটি সেখানে মুড়োল। তোমরা কেউ জানো তো কও, নয় আন্দাজ করো।

নটবর। আন্দাজের দরকার নেই, ধরো হে গান ধরো।

গান

দেখেন দেখেন চেয়ে দেখেন জেগে জেগে বসে দেখেন।
উলটে দেখেন পালটে দেখেন লম্বকর্ণ পালা দেখেন।
চিনে রাখেন আসেন কে কে, জেনে রাখেন যান কে কে —
রায়বাহাদুর বংশলোচনবাবুর এই বৈঠকেতে।
ঘুঘু দেখেন ফাঁদও দেখেন — হেসে দেখেন
কেঁদে দেখেন।

কচলে আঁখি ঢুলে দেখেন—নেচে দেখেন
কুঁদে দেখেন।
বেলেঘাটার যাত্রাপার্টির লম্বকর্ণ পালা দেখেন।

দ্বিতীয় পর্ব

(বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা-ঘর—বিনোদ, নগেন ও উদয়ের প্রবেশ)

বিনোদ উকিল। ও চাটুজ্যে, আসতে আসতে গেলে কোথা? বলি ও চাটুজ্যে, হুঁকো-বৈঠক রইল এধারে তুমি রইলে ওধারে? চলে এসো, কথাই কও না যে!

(চাটুজ্যে ও মিয়ার প্রবেশ)

চাটুজ্যে। এই যে ভাই, মিয়াসাহেব আদাব, বৈসেন। বৈসেন। শ্রূয়তাং—এই হচ্ছে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা—যেখানে সান্ধ্য-আড্ডায়, নিত্য নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকেন, বুইলেন? ও তোমার লাটছাহেব সুরেন পাল, বিপিন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধরবুড়োর ছেরাদ্দ, আলিপুরের নতুন কুমির—কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাতদিন যাবৎ বাগের বিষয় নিয়ে হাতাহাতি চলছে, এ-বাড়ির মামাবাবু নগেন আর ভাগনেবাবু উদয়ের মধ্যে, বুইলেন?

মিয়া। বাঘের কথা যদি তুললেন তো শোনেন বলি এক কেচ্ছা—

এক রোজ আষাঢ় মাসে বাতাস ছিল ছর্দ
ঘরে হুক্কা পিইতেছিলাম আমি এক মর্দ।
দর্দ ছিল হস্ত-পদে টনটন বাতের
দলিজাতে বৈসে ছিলাম বিমারি খাতের।
ভাবতেছিলাম ছোটবিবি থাকত এইখানে
ইত্তিফাক বাঘের গর্জন পৌছি গেল কানে।
হুক্কা হাতে গুটিগুটি যাব খিড়কি-দ্বারে
লম্ফ দিয়ে কেন্দো বাঘ পড়ল এসে ঘাড়ে।
হলদি-কালা ডোরাকাটা সতরঞ্চখানা
ঝড়ে যেন উড়ে পইল এমনি বাঘের হানা।
তারপর হুড়াহুড়ি বাঁও কষাকষি।
যুদ্ধু যেন লেগে গেল বাঘ আর মষি।
বাঘের শক্তি মানুষের বুদ্ধি কেউ কারে না পারি
করি তাগ বাঘের নাক মারলাম হুক্কার বাড়ি।
ভাঙা-নাক বাঘ পালায় আঁক-আঁক করি
ধীরেসুস্থে পানি নিলাম হুক্কাটায় ভরি।
ভাঙে নাই নলচেটা নছিবে আমার
বখরাটার সেই হইতে খোঁজ পাই না আর।

এইখানে হইল সারা অধীনের কেচ্ছা
চাটুজ্যে মশাই, হুক্কা তোমার বলছে মিচ্ছা মিচ্ছা।।

চাটুজ্যে। ঠিক ঠিক, নাও ভাই মিয়াসাহেব কলকেটা, ও নগেন ফরসিটা দাও না এগিয়ে।

নগেন। লেন লেন।

মিয়া। দ্যেন দ্যেন—

এই মুছলমান আর হিঁদুয়ান ছিল জেতের বিচার
ভেবে দেখো তাম্বাকুতে কইল একাকার।
কেওড়া যেথা তামাক খায় বামনা সেথা এসে
আস্তে-আস্তে ঘুরিয়ে তার নজদিকেতে বসে।
আড়ে আড়ে চায় এমনি তামাক খাবার বাই
হাত বাড়িয়ে বলে তোমার কলকেটা দ্যাও ভাই।

উদয়। ঠিক ঠিক, মিয়াসাহেব না হলে কি মজলিশ জমে?

মিয়া। সাচ্চা বাত বলেছেন—

উয়ো মজলেশ তো বিরাম, যাঁহা হুক্কা নাবাসৎ।
আমির ও ওমরা, গরিব ও গোবরা, সবকা মুনাজৎ হুক্কা।
ছিলম ও ফরসি, নলওয়া নলচি, এ জি খুশিওঁকি এলচি।
বারাম দরবার কী আরাম, বে-আরমিকা দোস্ত—বাসৎ বাসৎ।

চাটুজ্যে। বলি ও উকিল, ও বিনোদ শুনচ? তোমরা ভাই খবরের কাগজ রাখো। নগেন, মিয়াসাহেবকে সেই বৈঠকখানার বর্ণনাটা শুনিয়ে দাও। ডুগিটা ধরো না হে।

গান

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা ঘরটি—
আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি
প্রথমেই নজরে পড়ে, কার্পেটে বোনা আসমানি
রঙের বেঁটে বিড়ালের ছবিটি।
যুদ্ধের সময় সাদা পশম রাধাবাজারে ছিল নাই
শুধু সেইজন্য বনবিড়াল হল নীলবর্ণ
ছবির নীচে তাই C-A-T ক্যাট লিখা আছে
ইংরাজি অক্ষরে—
তার নীচে হস্তাক্ষরে রচয়িতার নাম—
মানিনী দেবী।
অপর দেওয়ালে ডবল ফুলস্ক্যাপ—
রায়বাহাদুরি সনদের নকল

ওই জ্যান্ত টিকটিকি করেছে দখল
গিলটি করা ফ্রেমের কোণটি।

উদয়। এইবার হয়েছে মামাবাবু, ন্যাজ ধরে টিকটিকিটার মাপ করা যায়, না ন্যাজ বাদে? কিন্তু যাই বলো, বাঘের মাপ কখনোই ন্যাজসুদ্ধ হতে পারে না। তা হলে মেয়েদের মাপও চুলসুদ্ধ নিতে হয়? আরে আমার বোয়ের বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে, তুমি কি বলতে চাও, বউ আমার আট ফুট লম্বা?

নগেন। দেখ উদো, তোর বোয়ের বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় তো বল, নয়তো শুধো মিয়াসাহেবের কাছে—

চাটুজ্যে। আহাঃ, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই। (নেপথ্যে—ম্যা ম্যা ম্যা শব্দ) অ্যাঁ। এ যে পাঁঠা ডাকে দেখি ষষ্ঠীতে পাঁঠা! হে মা-ষষ্ঠী, দেখতে হল তো।

(প্রস্থান)

টেঁপি। (নেপথ্যে) ওমা শিগগির এসো পাঁঠা এসেছে।

(বংশলোচন, টেঁপি ও ঘেন্টুর প্রবেশ)

বংশ। চুপ চুপ টেঁপি।

টেঁপি। বাবা আমি পাঁঠাটা পুষব, একটু লাল ফিতে দাও না।

বংশ। বেশ তো, একটু খাওয়াদাওয়া করুক তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপি। পাঁঠার নাম কী বলো না?

বংশ। নামের ভাবনা কী; ভাসুরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—

ঘেন্টু। ও লম্বকর্ণই ভালো। ও বাবা! আমি পাঁঠা খাব, পাঁঠার মে-মে-মে-মেটুলি খাব।

টেঁপি। যাঃ, যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই-খাই শিখেছে।

নগেন। ঘেন্টুটা আমার ধাত পেয়েছে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। দিব্যি পাঁঠাটি।

বিনোদ। বেশ পাঁঠাটি; কিন্তু বে-ওয়ারিশ মাল, বুঝলে হে রায়বাহাদুর? বেশিক্ষণ ঘরে না রাখাই ভালো। সাবাড় করে ফেলো—কাল বুধবার আছে লাগিয়ে দাও।

(চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। আমি পেট টিপে দেখলাম দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।

নগেন। উহু, ইয়া উরুৎ, হাঁড়িকাবাব—একটু বেশি করে আদাবাটা আর প্যাঁজ।

উদয়। ওঃ আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে।

নগেন। উদো আবার—

বংশ। তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে—তা কেবল কালিয়া আর কাবাব।

টেঁপি। এই যে, লাল ফিতে পেয়েছি বাবা।

বংশ। আরে এ যে আদালতের নথির ফিতে! তা যাক, শোন তোর মা এখন কী করছে?

টেঁপি। এক্ষুনি কলঘরে গেছে।

বংশ। ঠিক জানিস? তা হলে এখন এক ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্দি। দেখ, ঝিকে বলে, চট করে ঘোড়ার ভেজানো ছোলা চারটি নিয়ে ওই বাইরের বারান্দায় ছাগলটাকে খেতে দে; খবরদার বাড়ির ভেতরে নে যাসনি যেন — মা রাগ করবে।

(টেঁপির প্রস্থান)

ঘেন্টু। আমি পাঁঠা খাব, আমি মেটলি খাব। ও দিদি! ও মা আমায় পাঁঠা দিলে না। ও মা বাবা পাঁঠা এনেছে।

(প্রস্থান)

নগেন। তোমার মাথা এনেছে; ঝড় ওঠালে এইবার।

বিনোদ। চলি হে — চাটুজ্যে চলো না? ওঠো মিয়াসাহেব।

বংশ। নগেন যাও কোথা? ও উদয়।

উদয়। মামাতে-আমাতে আপিসঘরে রইলেম, আপনি যান অন্দরে।

(সকলের প্রস্থান)

ঘেন্টু। (নেপথ্যে) দিদি আমি লম্বকর্ণ খাব। ও মা শিগগির এসো লম্বকর্ণ দেখবে।

বংশ। চুকন্দর সিং —

(প্রস্থান)

চুকন্দর। (নেপথ্যে) হু-জৌ-র।

তৃতীয় পর্ব

কনসার্ট

(মানিনীর প্রবেশ)

মানিনী। আ মর। ওটাকে কে আনলে? দূর দূর — অ ঝি, অ বাতাসি, শিগগির ছাগলটাকে বার কর।

(ঘেন্টু ও টেঁপির প্রবেশ)

টেঁপি। বা রে। ওকে তো বাবা এনেছে — আমি পুষব।

ঘেন্টু। আমি ঘোড়া ঘোড়া খেলব।

মানিনী। খেলা বার করে দিচ্ছি। ভদ্দরলোকে আবার ছাগল পোষে? বেরো বেরো — অ চুকন্দর সিং।

(চুকন্দরের প্রবেশ)

চুকন্দর। হ-জৌর?

মানিনী। কোথায় ছিলি?

চুকন্দর। মায়ী, কলকাত্তামে বড়া চোট্টা ঔর ডাকুকা হুজ্জুত হোতা, দেউড়ি পর রহা থা।

মানিনী। দেউড়িতে রয়তা। এদিকে ছাগল ঘরে ঢুকে আয়তা, চোর-ডাকু সামলায়গা তুমি? ছাগলটাকে এক্ষুনি নিকাল দিয়ে আও — একদম ফটকের বাইরে — নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেঙ্গা।

চুকন্দর। বহুত আচ্ছা।

(বংশলোচনের প্রবেশ)

বংশ। দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তোমার নোকরি ভি যাগা।

চুকন্দর। বহুত আচ্ছা।

(প্রস্থান)

মানিনী। টেঁপি হতচ্ছাড়ি, রাত্তির হয়ে গেল, গিলতে হবে না? থাক তুই ছাগল নিয়ে। কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায় বাপের বাড়ি—পুজো দেখব।

টেঁপি। আমিও যাব মামার বাড়ি।

বংশ। ঘেন্টু, ঝি-কে বলে দে, এই একতলার ঘরেই আমার শোবার বিছানা করে দেবে, আর দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ, ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না—

ঘেন্টু। তোমার ভাগটা আমি খাব বাবা?

বংশ। তা খাস, আমার শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা হলেই চলবে। না হলেও আপত্তি নেই। যা তোরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়্‌গে—আমি এই ঘরেই রইলেম।

মানিনী। ঘেন্টু চলে আয় বলছি—

ঘেন্টু। আমি বাবার সঙ্গে মাংস খাব—রাধাকান্ত কেবিন থেকে আসছে।

মানিনী। তা হলে রইলে তুমি—কাল মামার বাড়ি যাব আমরা সবাই।

(মানিনী ও টেঁপির প্রস্থান, ঘেন্টুর অনুসরণ)

বংশ। (রসিয়া) আমি কুকুর পুষি, পাঁঠা পুষি—তাতে করে কী বলবার আছে? আমার কি শখ নেই—না আমি একটা হেঁজিপেঁজি লোক! পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও এক মাস জেল দিতে পারি। বাপের বাড়ি যাবেন—যান; কীসের দুঃখু? আমি কারও তোয়াক্কা করি না—বেঁচে থাক রাধাকান্ত কেবিন, দু-বেলা কাটলেট, চপলেট, ভুটের গান, ছাগলনাচ—চুকন্দর সিং-এর ঢোল—এইসব চালাব—দেখি কী করেন। আমার শখ নেই! নিজেও সেদিন—দেখি খেড়োর খাতাটা—হ্যাঁ এই যে, ক-মাসে পনেরোটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি, আড়াইশো টাকার খাগড়াই বাসন কেনা হয়েছে। যত দোষ ছাগলের বেলা। দোষ করেছে আমার ভুটে বেচারা। মোট ঘাড়ে চলতে গিয়ে গরমের দিনে হুমড়ি খেয়ে, ফেন্ট হয়ে পড়ল দরজায়—সেই থেকে রেখেছি তাকে নিজের হেপাজতে। বড় অপরাধ তার আর আমার—

(ভুটের মোট-কাঁধে প্রবেশ)

বংশ। আরে রাখ রাখ তোকে বইতে বললে কে! আর কি লোক ছিল না? বস বস, মাইনে কত পেয়েছিস?

ভুটে। সাত আনা এক পাই।

বংশ। বাজারের পয়সা সরিয়েছিলি বুঝি?

ভুটে। না, চার দিন ম্যালোয়ারি ভুগেছিলুম।

বংশ। হুঃ যতসব—দেখ ভুটে, আজ থেকে তুই আমার ছাগলের হেপাজত করবি—খোরাকি পাবি এক টাকা, বুঝলি? ওটাকে নাচ শেখাবি ডুগডুগি বাজিয়ে—ছাগলনাচের পাঁচালি জানিস?

ভুটে। একটা অজামিলের পাঁচালি বটতলা থেকে আনব?

বংশ। তাই কিনে নিস, বুঝলি? আচ্ছা, এখন একটা ঠাকরুন বিষয়ে গা তো শুনি, ছাগল থাকগে।

ভুটে। একটা আগমনী গাই; পুজোর দিনটা!

গান

মা আইসে আইসে গন্ধবহ মন্দ মন্দ গন্ধ বহিছে।
আর অন্ধকারে পাখিরা কইছে, মা ওই যে মা ওই যে—
দয়াময়ী আমাদের মা এইলো।

মানিনী। (নেপথ্যে) এত রাত হল, ঘুমেব নাম নেই মেয়েটার, গান শোনা হচ্ছে ছাদে উঠে। নেমে আয়; খেয়েদেয়ে ঘুমোতে চল। বাতাসি বৈঠকখানায় বিছানা দিলি?

বংশ। কানে পৌঁচেছে এখান থেকে তোর ডাক। যা ভুটে। আমিও শুইগে কিছু খেয়ে। এই যে টাকাটা, বলিস—রোস, কী বলবি?

ভুটে। বলব অজামিলের বই, দড়া, আর মাটির কলসি, ওই ছাগলটার জন্য।

বংশ। মিছে কথাটা বলবি? বলিস কর্তা গান শুনে বখশিশ দিয়েছে। হ্যাঁ, এত ভয়টা কী? আমার কি শখ নেই—না পয়সা তোমারই একলার? দে গীতাখানা, রাত জেগে পাঠ করিগে। ছাগলটার যে সাড়াশব্দ পাই না। চুকন্দর সিং বকরি ঠিক?

চুকন্দর। (নেপথ্যে) হাঁ হজৌর।

বংশ। ফাটক বন্ধ?

(নেপথ্যে ফটক বন্ধের শব্দ)

চুকন্দর। হ—জৌ—র

(ছাগলের ডাক—অন্ধকার স্টেজ)

চতুর্থ পর্ব

গান

রাত্রি আন্দাজ সওয়া-একটা, জোরে জোরে
বইতেছে হাওয়া ঠান্ডা;
বারান্দায় নেড়ে ঝাপটায়, ইদিকে মিটমিটে
পিদুমের আলোতে দেখা যায়—
বংশলোচনের বৈঠকি অন্দরটা।
বংশলোচন বিজুলি সুইচ বন্ধ দিয়া গীতাখানি
বুকে নিয়া নিদ্রাগত হলেন—
নাসিকাধ্বনিতে ঘরখানি জুড়ে নিয়া।
বারান্দায় ঘুমায় চুকন্দর সিং,
আঙিনায় ঘুমায় ভুটে মুটিয়া

বরষার স্বপ্ন রোমন্থন করে — লম্বকর্ণ,

দোক্তার নেশায় ঘুম গেছে তার

ঠান্ডাতে চটিয়া।

বিরক্ত হয়ে ছাগনন্দন, চিবায়ে রজ্জুবন্ধন

নিঃসারে প্রবেশ করে —

পাপোশ খেয়ে, দ্বারদেশ খোলা পাইয়া।

(স্টেজ অন্ধকার — রাত্রি আন্দাজ সওয়া-একটা। অন্ধকারে বংশলোচনবাবু শুয়ে আছে।)

বংশ। কখন এলে? অন্ধকার যে — ওকী ও? কে ও? এই উই উঃ।

(নেপথ্যে ঝনঝন শব্দ)

চোর চোর, বাঘ হ্যায় — এই চুকন্দর সিং ডাকু ডাকু — জলদি আও — নগেন, উদো — আলো জ্বাল — শিগগির আয় মেরে ফেললে!

(নেপথ্যে ব্যা ব্যা ব্যা শব্দ। নানা অস্ত্রে সকলের প্রবেশ — হাতা, বেড়ি, বন্দুক, টেনিস ব্যাট ইত্যাদি)

মানিনী। কী হল গো?

বংশ। রোসো রোসো মাথা ঘুরছে। উঃ কিম্ভূতকিমাকার কী একটা গায়ে হাত দিয়েছে আমার।

মানিনী। কেমন দেখলে গো চেহারা — স্বপন না তো?

বংশ। ওষ্ঠ মাস ঠেলি — দন্ত আছে মেলি, দশ-দশ আঙ্গুলিতে বজ্রনখ ধরে।

মানিনী। দস্যি মেয়ে, পালিয়ে আয় বলছি!

টেঁপি। (নেপথ্যে) বাবা, এই ঘরে আছে। তোমার গীতার পাতা খাচ্ছে দেখোসে — ও বাবা, তোমার সনদ খেল। মা, তোমার পশমের বিড়াল খেল। যাঃ —

(নেপথ্যে ঝনঝন শব্দ)

বংশ। কে রে ওখানে — ও টেপু, ও বাতাসি কী দেখলি?

চুকন্দর। বাবুকো ঠাকুরজি বাঁচায়া —

মানিনী। তুই থাম। পালিয়ে আয় ঘেন্টু।

টেঁপি। কথা শুনছিস না? দেখাব কাল মজা—

(ঘেন্টু- টেঁপির প্রবেশ)

ঘেন্টু। খক্কোস! পিদুমের গরম এড়ির তেল খেয়েছে।

টেঁপি। পালিয়ে গেল জানালা টপকে, — চুকন্দর সিং ফটক বন্ধ করো।

বংশ। না না, গেছে যাক —

উদয়। কে, কে রে টেঁপি? কে পালাল? দেখলি কাকে — চোর না ডাকাত?

নগেন। কীরকম দেখতে অ্যাঁ—

ঘেন্টু। ঠিক লম্বকর্ণের মতন।

টেঁপি। লম্বকর্ণই তো, মতন কী আবার?

চোর চোর, বাপ হায় — ওই চকুন্দর সিং ডাক

মানিনী। কালই ওটাকে বিদায়। ছাগল নাচানো বার করছি ভুটের। চলে এসো উপরে, চুকন্দর সিং — বৈঠকখানায় তালা বন্ধ করে দে আও।

চুকন্দর। ঠাকুরজি রচ্ছা কিয়া বাবুকো —

বংশ। রচ্ছা কিয়া না তোমার মুন্ডু কিয়া — এর চেয়ে বাঘ ছিল ভালো। —

মানিনী। কেমন হয়েছে তো ঠিক। আর ছাগল পুষবে? কাল সকালেই ভুটেকে আর ছাগলকে একসঙ্গে বিদায়। চলো উপরে — বাইরে আসতে হবে না।

(বংশ, মানিনী, টেঁপি, ঘেন্টু ও চুকন্দরের প্রস্থান)

উদয়। মামি, ছাগলটা বিলিয়ে দাও তো আমাকে, আমার বউ গুলিকাবাব করবে।

নগেন। ফের উদো —

ভুটে। আমার কী হবে বাবু?

উদয়। তোর আবার ভাবনা কী — যাত্রার দলে ভরতি হবি। গাইতে জানিস — ?

নগেন। আরে না রে না, আমি আছি তোর সঙ্গে — সব ঠান্ডা করে দেব। রাত পুইয়ে এল, এক ছিলিম সেজে আন আমার জন্য।

(সকলের প্রস্থান)

অধিকারী। ওহে সকাল হয়ে এল — এবার গোষ্ঠ গাও গোষ্ঠ গাও।

গান

গা তোলো গা তোলো কাজে চলো কাজে চলো।
কী ফল বিলম্বে, লেট হলে পড়বে গোল, —
তেলকলে চলো, অবিলম্বে চলো।
চিমনির ধোঁয়া রঙে ওই শোনো বাঁশি বলে,
আপিসের বেলা হল
গা তোলো গা তোলো ভোর হল ভোর হল।
চোখ মেলো গোলগোল, রাত গেল তবু
আকাশ কাজল।
রাতটা ভুসা না দিনটা ধূসা উষার দিশা
পেতে গন্ডগোল।
বংশলোচন ঘড়ি দেখে কন, —
'মানিনী, 'তাড়াইগে ছাগল।'

পঞ্চম পর্ব

(ভোরের কনসার্ট)

(বংশ, চুকন্দর ও ভুটের প্রবেশ)

বংশ। চুকন্দর সিং—

চুকন্দর। হজৌর—

বংশ। ছাগলঠো হায়—না ভাগা?

চুকন্দর। শয়তান হজুর, বড়া নষ্ট ভাগা।

ভুটে। সে আবার যাবার ছেলে—! কলতলায় তরকারির খোসা আর মাছের আঁশ গিলছে।

বংশ। চুকন্দর, কোনো ভালো আদমি ছাগল পালতে রাজি আছে কি না খোঁজ নাও। ভুটে, তুইও দেখ—যে-সে লোককে ছাগল দেব না।

(বিনোদ নগেন ও উদয়ের প্রবেশ)

বিনোদ। দেখি খবরটা?

উদয়। মামাবাবু, নেংড়া আম খুব সস্তা যাচ্ছে—

বংশ। হু, বরং Wanted কলামটা দেখো—কেউ একটা ছাগল চায় তো দিতে পারি—বেশ কচি।

নগেন। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান—কী লিখেছে আনন্দবাজার দেখি?

বিনোদ। রও, রও, হাইকোর্টটা দেখে নিই।

চুকন্দর। (প্রবেশ) লাটুবাবু আয়ে হেঁ—

বংশ। লাটুবাবু কে রে? কোত্থেকে এল। বসাওগে তোমার ঘরে—যাকে-তাকে ঢুকতে দিয়ো না চুকন্দর—দিনকাল খারাপ, বন্দুক তৈরি রাখো। আর লিখিয়ে নিয়ে এসো কী চাই।

(চুকন্দরের প্রস্থান)

চাটুজ্যে। (প্রবেশ)—ফটকের বাইরে তিন মূর্তি কে হে?

বংশ। কেমন দেখতে বলেন তো? লাটুবাবু নাম শুনছি।

চাটুজ্যে। লাটু তো লাটু—

(লাটু, নবীন ও নরহরির প্রবেশ, সঙ্গে চুকন্দর)

গান

হাতে হাতঘড়ি, পায়ে কেটসু মুখে সিগারেট
দিচ্ছে ফুঁ
উড়নি নাই ধুতির বাহার খদ্দরের শার্ট
তাতেই কলার।
ঘাড়কামানো আলবার্ট টেরি দেবী কি দেবা
চিনতে দেরি
অধরে পানের লেগেছে ছোপ কড়িপানা চোখ
আধখান গোঁফ।

চুকন্দর। সিলিপ্ লিখ দেও বাবু —।

বংশ। আমি এই শর্তে দিতে পারি, ছাগটাকে আপনি যত্ন করে —

নটবর। নিশ্চয় লেব, খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে, তবে —

বংশ। মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না।

নটবর। বেচতে যাব কোন দুঃখে, আমাদের কি খাবার অভাব?

বংশ। মারতে পারবেন না।

নরহরি। আজ্ঞে আমরা তবলাই পেটাই বটে, কিষ্ণের জীবকে মারপিট! বাপরে অ্যাসল্ট হয়ে যাবে। হাতকড়ি, জরিমানা — কিষ্ণো, কিষ্ণো; ওসব মারধোর আমাদের এসে না মশয়।

বংশ। সে মারের কথা নয়। পাঁঠাটি কেটে খাবেন না, পুষবেন। লিখে দিন ইস্ট্যাম্প কাগজে —

নটবর। এ যে আপনি লতুন কথা কইলেন! ভদ্দরনোকে কখনো পাঁঠা পোষে।

নরহরি। পাঁঠি লয় যে দুধ দেবে। পাখি লয় যে পড়বে। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে, তোমার ভাই ছাগল এ-শর্তে কেউ নেবে না। যক্ষ্মাকাশ রোগী তো এর মধ্যে কাউকে দেখছি না যে ছাগল পুষবে। ওকে দাও নবমীতে ব্রাহ্মণসেবায় লাগিয়ে — উদ্ধার হয়ে যাক ব্যাটা।

বংশ। বাজে বোকো না চাটুজ্যে। আপনারা নেন তো নিন — নইলে রইল আমার ব্যাস, এই এক কথা।

নটবর। কী বলো হে লরহরি? —

নরহরি। লিয়ে যাও হে লাটুবাবু, লিয়েই যাও। ভদ্দরনোক বলছেন এত করে।

বিনোদ। কিন্তু মনে থাকে যেন — বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

চাটুজ্যে। টিপসই নিয়ে নাও হে রায়বাহাদুর।

নরহরি। সে আপনি ভাববেন না, লাটু লন্দির কথার লড়চড় লেই।

বংশ। ভুটে, যা ছাগলটা দিয়ে আয় বাবুদের।

ভুটে। ওই চুকন্দর যাক, আমি পারব না বাবু। ও ছাগল লয়, ও আমার আপন ভাইয়ের মতো। প্রাণ ধরে ওকে পরের হাতে দিতে পারব না বাবু — মায়া পড়ে গেছে —

(রোদন)

বংশ। এ তো বড়ো বিপদ কল্লে! আরে কাঁদতে থাকলি যে — চুপ চুপ। এই চুকন্দর যাও।

(চুকন্দর, নটবর, নবীন ও নরহরির প্রস্থান)

বিনোদ। যাক, ছাগলের মোসান ডিসমিস হয়ে গেল।

বংশ। ওদের হাতে নিয়ে ভরসা হচ্ছে না যে — সেখানে যদি কিছু উৎপাত করে তো ওরা সহজে ছাড়বে না।

বিনোদ। উচিত ছিল, ছাগলটাকে হয় সলিটারি সেলে — নয় ফাঁসি দেওয়া। দিলে কবে সাফ ডিসমিস—কী আর বলব।

বংশ। এ তো ভাবনায় ফেললে, লোকগুলোর চেহারাও ভালো ঠেকল না হে।

চাটুজ্যে। ভেবো না, ভেবো না, তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। মাঝ থেকে ফাঁকে পড়লুম, আমরা।

বংশ। যাকগে, আমি তো সেই ভেবেই দিয়েছি—মারে তো কী করতে পারি। তা ছাড়া আমি তো স্ব-ইচ্ছায় ছাগলটাকে বিদায় করিনি—কী বলিস ভুটে?

চাটুজ্যে। তুমি ভেবো না হে বিচারক—'অজো নিত্যঃ' তাদের মার নেই, দেখো ফিরে এল বলে।

বিনোদ। ফিরে আসবে বটে—তবে এখানে নয়। কালীতলা থেকে জবাই হয়ে ঢুকবে প্রথমে লাটুবাবুর রান্নাঘরে। তারপর সেখান থেকে তপঃসিদ্ধ হয়ে—বার হবে পাঁঠার কোর্মা হয়ে—যাত্রাসদনের সকলের সামনে।

বংশ। হয়তো-বা তাই হয়েছে এতক্ষণে, কে জানে। দেখো দেখি একটা জীবহত্যা হল।

চাটুজ্যে। ভুল, ওটা তোমার ভুল ধারণা। পাঁঠা থেকে পাঁঠার কোর্মা—একটা অবস্থার ফের। যেমন—ওর নাম কী—আরশোলা থেকে কাঁচপোকা। হত্যার কথাই উঠতে পারে না।

নগেন। যেমন 'ছ'য়ে আকার 'গ' ছাগ, আর বানানের হেরফেরে 'ব'য়ে আকার 'গ' বাঘ হয়ে পড়ে। ডারউইনি থিয়োরি মানতে হয় এতেই তো!

বংশ। চাটুজ্যে, তোমার কথাটাই আমার মনে লাগছে—'অজো নিত্যঃ'—ওর মার নেই। আবার ফিরে আসবে। এই দেখো না—'নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ—'।

উদয়। ওটার মানে কী হল বলেন তো,—ভুট্টা যখন লিখেছে, তখন বোধ করি ভুটের কথা গীতায় লিখবে।

নগেন। আমি সেবার যখন সিমলায় যাই—ভুটিয়া ছাগল—

নগেন। ও ভুটানের ছাগলের কথা বলেছে পুথিতে।

উদয়। মিছে কথা বলিসনি উদো, তোর দৌড় আমার জানা আছে। ওই লিলুয়া অবদি।

উদয়। বারে, আমাদের দাদাশ্বশুর যে সিমলায় থাকতেন—বউ তো সেইখানেই ভুটিয়া ছাগলের দুধ খেয়ে বড়ো হয়—তাই তো অত রং—।

নগেন। খবরদার উদো—

(মিয়ার প্রবেশ)

চাটুজ্যে। আরে মিয়াসাহেব যে। আসেন, আসেন। যাকগে ছাগল, একটু খোশগল্প করা যাক। মিয়া সাহেব, নেন তাকিয়া ফরসি।

মিয়া। কীসের কেচ্ছা কইতে কন—বাঘের?

বিনোদ। আজ ছাগের গল্পই জমবে—

বংশ। না, না বাঘের হোক। ছাগের পালা থাক।

মিয়া। আচ্ছা একটু ছাগ-বাঘের কেচ্ছাই কই। শুনে লেন :—পয়লা একটা তো রুবাই কইতে হয়, 'ওই 'ছ'য়ে আকার 'গ' ছাগ—'ব'য়ে আকার 'গ' বাগ—ছাগে-বাগে এক ঘাটে জল খায় চক-চ চক-চ—।' আমাদের মজিলপুরে দোর্দণ্ড পর্তাব খুরুম মণ্ডলের মৃত বিবির এক ছাগল ছিল। নাম—ভুটে; তার দাদা ছিল ভোটকম্বল—লামা ছাগল। যারে বাংলাতে কয়—রামছাগলা। ইয়া পঁচাও শৃঙ্গ, ইয়া মান-মনোহর—গালকম্বল দাড়ি—। যেন মুনি-ঋষি। ব্যাটা খেয়ে-খেয়ে হল ইয়া লাশ। একদিন হয়েছে কী! মণ্ডলের ওখানে জিরাফৎ করতি গেলাম—পাঁঠার কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা, কাবাব, কত্তো কব—। খানাপিনা

করে আচাইবার কালে দেখা গেল কিনা — ভুটে পাঁঠার মাংস চপচপ কড়মড় করি খাতি লেগেছে। সকলে তাজ্জব। আমি বললাম — দেখো কী খুরুম মন্ডল, ছাগলটারে আজই বিদায় করো — কাচ্চাবাচ্চা লয়ে ঘর করতেছ, প্রাণের ভয় নাই? মন্ডল শুনল না। তার পরদিনই ভুটে নিরুদ্দেশ! খোঁজ — খোঁজ, আর খোঁজা। খুরুম মন্ডল ছুটোছুটি করে গাঁ-খানা চাষ ফেলায়ে দেখল, ছাগলের চিহ্নও নেই। এক বচ্ছর যায় — খোঁজা-খুঁজিতে সোঁদরবনে পাওয়া গেল সেই ছাগলের পাত্তা। দেখা গেল শিং নাই বললেই চলে, পনেরো-আনা মাথা হয়েছে পেলেন্। ছাগল আর নেই, তার স্থানে গজিয়েছে — চৌগাম্পা গালপাট্টা। মুখ — একটি কালো হাঁড়ি! বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ। সর্বগায়ে দেখা দিয়েছে আঁজি-আঁজি ডোরা। খুরুম মন্ডল যেমন ডাকা — ভুটে —; ভুটে ডাক ছাড়ে 'হালুম'। আমি ওই না দেখে, বনবাদাড় ভেঙে — দে দৌড়, দে দৌড় — একদম বেলেঘাটার পুল পার।

(চুকন্দর, নটবর, নবীন ও নরহরির প্রবেশ)

চুকন্দর। লাটুবাবু আয়ে হেঁ —

বংশ। ব্যান্ডমাস্টার, কী মনে করে আবার? একী লাটুবাবু আপনার হয়েছে কী?

সকলে। একী দশা এ কে করলে। একী?

নটবর। আর কী, সর্বনাশ হয়েছে, লাটুর কিছু আর রাখেনি — ও হো হো।

(রোদন)

বংশ। একী ব্যাপার। জেব কাটলে কে?

চাটুজ্যে। এ যে দশার দশা করেছে। আহা পুজোর বাজারে — কে এমন কাজ করলে? কে সে জেব-কাট্‌রা, চোর, ডাকাত, বদমাশ? কে এমন এ পাড়ায় এল — কার এ কাজ?

নটবর। ধনেপ্রাণে মেরেছে মশয়। ও হো হো.....।

নরহরি। আঃ কী করো লাটুবাবু, একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন, তখন একটা বিহিত করবেনই।

বংশ। চুকন্দর — দোত, কলম, কাগজ — হ্যাঁ, বলেন্ তো কী হয়েছে ব্যাপারটা — কে এমন কাজ করলে? বলেন — ।

নটবর। মশাই, ওই পাঁঠাটা —

বংশ। অ্যাঁ! বলেন কী!

চাটুজ্যে। হুঁ, বলেছিলাম কি না?

নটবর। ঢোলের চামড়া খেয়েছে, ব্যায়ালার তাঁত কেটেছে, হারমোনিয়ার সব কটা দাঁত-চাবি — কড়মড়িয়ে চিবিয়ে ফোকলা করে দিয়েছে যন্তরটা। আর, আমার পকেট — লব্বুই টাকার লোট মশায়, ও হো হো —

নরহরি — গিলে ফেলেছে মশয়! পাঁঠা লয় মিয়াসাহেব, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে লাটুর। প্রাণটি আর ক্রেসিন কনসার্ট আপনাদের ভরসায় এখনও ধুকপুক করছে। দোহাই হুজুর, একটা বেবস্থা না করলে গরিব মারা যায়। দশাটা দেখেন একবার।

বংশ। ফেসাদ হল তো, কী করা যায়? চাটুজ্যে, মিয়াসাহেব কী কও?

মিয়া। একটা জোল্‌লাপ দিয়ে দেখলি হয়।

চাটুজ্জে। হ্যাঁ, এ পরামর্শ ভালো।

নটবর। মশাই, এই কি আপনাদের বিবেচনা হল? মরছি টাকার শোকে, এসময় বলেন জোলাপ খেতে! কেমন হাকিম তুমি মিয়াসাহেব?

মিয়া। তুমি খাবে কেন! ছাগলটারে দিতে কইছি।

নরহরি। হায় রে কপাল—ছাগলে মুড়লে কি আর রক্ষে আছে! লোট তো লোট—তাঁত, ঢোলক, হারমোনিয়া মায় ইস্টিলের কত্তাল—কোনকালে হজম করে ফেলেছে।

গান

খরচা নাই যে দিই কিছু পেটে
জামা আছে জেব নেছে কেটে
বেয়ালার তাঁত নাই কান নাই লোপাট
ফ্লুটের চাবি কটাই।
বাঁয়া তবলাজোড়া গেছে ফেটে
ক্রেসিন ব্যান্ড খেয়েছে বেঁটে
ছাগল চিবালো লোহা-করতাল
বাঘের যাহা সয় না পেটে।

বংশ। যাক, আর কথায় কাজ নেই। বিনোদ তুমিই একটা খেসারত ঠিক করে দিয়ো। বেচারার লোকসান না হয়, আর আমাব উপরেও বেশি চাপ না পড়ে—বুঝলে?

নটবর। ছাগল এইখানেই রইল, ও আমি আর লোব না।

বিনোদ। বেশ বেশ, আজ যাও, কাল যা হয় করা যাবে।

নরহরি। একশো টাকার ওপরে লোকসান হয়েছে—উকিলবাবু দেখবেন বিবেচনা করে।

বিনোদ। এ-ক-শো টা-কা!! আচ্ছা, দেখি কাল যা হয় হবে।

(লাটু, নবীন ও নরহরির প্রস্থান)

(টেঁপি ও ঘেন্টুর পবেশ)

টেঁপি। তোমার লম্বকর্ণ ফিরে এসেছে বাবা। বেশ পোষা হয়ে গেছে। উঠানের কোণে তুলসিপাতা খাচ্ছে।

ঘেন্টু। আর কামড়ায় না, লক্ষ্মী হয়ে গেছে।

চাটুজ্জে। ও টেঁপুরানি, শিগগির গিয়ে মাকে বলো, কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, মাংস, পোলাও—

উদয়। আর গুলিকাবাব—বুঝলি?

ঘেন্টু। বাবা আর মাংস খায় না।

চাটুজ্জে। কী শুনি হে বংশু! প্রেমটা একটা পাঁঠা থেকে বিশ্বপাঁঠায় পৌঁছেচে নাকি?

উদয়। মামা না খান, আমরা আছি। যাও তো টেঁপু, মাকে বলো সব জোগাড় করতে।

গান

আমরা আছি আমরা আছি তুমিও আছ আমিও আছি
গুলিকাবাব আলুবোখরার কেন্দালুতে আছিই আছি।
ওরে ভাই পাচ্ছি যে রে গন্ধ।

(সুর করে)

ঘেন্টু। (সুর করে) 'বাবার সঙ্গে মায়ের কথা বন্ধ।'. . . সে এখন হচ্ছে না, মা-বাবার ঝগড়া হয়ে গেছে—।

টেঁপি। মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হয়ে গেছে—কথাটি নেই।

বংশ। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস, 'কথাটি নেই'—সব জানিস, যত সব—

টেঁপি। বারে! আমি বুঝি জানিনে? মা যে আমাকে খালি খালি বলে—'টেঁপি পাখাটা মেরামত করতে হবে।—দুশো টাকা চাই'—।

বংশ। থাম থাম। বকিসনে, মার খাবি, ফের জ্যাঠামো?

(ঘেন্টু ও টেঁপির প্রস্থান)

বিনোদ। ওহে রায়বাহাদুর, ঘেন্টুকে আর ঘাঁটিয়ো না, সব ফাঁস করে দেবে।

মিয়া। হাকিমের ছাওয়াল তো বটে!

চাটুজ্যে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বলো?

বংশ। এতদিনে সব মিটে যেত, মাঝে থেকে ওই ছাগলটাই—।

চাটুজ্যে। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ—তোমারই-বা অত মায়া কেন ওটার ওপর। কেটে খেতে না চাও—বিদায় করে দাও। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ কোরো না দাদা।

বংশ। দেখি, কাল যা হয় করা যাবে।

বিনোদ। রায়বাহাদুর, কালবিলম্ব করবেন না। মিটমাট করতে হয়—লাটুর খেসারতের সঙ্গে সঙ্গে আজই—

চাটুজ্যে। চলো এখন।

(মিয়া ছাড়া সকলের প্রস্থান)

বংশ। ওঁরা যান, তুমি বসো, কটা পরামর্শ নিই তোমার কাছে। দু-নৌকোয় পা দেওয়া ভালো নয়, কী বলো মুনশি সাহেব? আজ সন্ধ্যাবেলায় যথাবিহিত করবই—যা থাকে কপালে। দুশমন ছাগলটাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো—শুনেছ তো সব কাহিনী?

মিয়া। বলেন তো বকরিটারে নেই কোরবানি করে, নয়তো পাঠায়ে দেন আপনার কালীঘাটে—চুকে যাক ল্যাঠা।

বংশ। তুমি যদি ঠেকতে আমার অবস্থায় তো কী করতে? ছাগলটাকে রেখে কিছু উপায় হয় তো বলো?

মিয়া। গর্দানি দিয়ে নিকলে দেন,—না, তাও হয় না—সবার সামনে নিজের ছাগল বলে স্বীকার খেয়েছেন—। হ্যাঁঃ। ছাগলটার গলায় লম্বরি চাকতি দিয়ে ছেড়ে দেন, আর এইরকমভাবে হুলিয়া দেন—'এই ছাগল, বেলেঘাটা খালের কাছে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারা গতিকে পুনরায়

সেই স্থানে ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা, কালী ও জিশুর দিব্য — ইহাকে কেহ মারিবেন না। উঁকি দায় দোষে আমি খালাস।' ইতি মাফ করুন বেয়াদপি। আদাব।

(টেঁপি ও ঘেন্টুর প্রবেশ)

বংশ। টেঁপি নাকি? শোন, তোর মা কী করছে রে?

টেঁপি। ষষ্ঠীর দিনে ঝগড়া হল কিনা, তাই পাঁজি দেখিয়ে আচার্যিকে দিয়ে ইষ্টি কাটাবার হিসেব করছে।

বংশ। ঝগড়া হয়েছে, ভাব করলেই ইষ্টি কেটে গেল — আবার পাঁজি দেখিয়ে খরচ করা কেন? যা তোর মাকে বলগে যা, — যত্তো সব —

টেঁপি। মা যদি রাগ করে — ?

ঘেন্টু। বলব বাবা শিখিয়ে দিয়েছে।

বংশ। ও টেঁপি যা বোঝে করবে। তুই যা ছাগল চড় গিয়ে। আর ওই ভুটেকে বল — চুকন্দরের বেল্টের চাকতিখানা — আচ্ছা থাক, আমিই দেখছি —। যা টেঁপি, লক্ষ্মী আমার, মার কাছে যা।

(টেঁপি ও ঘেন্টুর প্রস্থান)

(ভুটের প্রবেশ)

এই ভুটে শোন এধারে।

চট করে এক ঠোঙা জিলিপি আন তো। আমি ততক্ষণ চিরকুটটা লিখে ফেলি, হুলিয়া দিতে হবে — বুঝলি? হ্যাঁ, একগাছা শক্ত দড়ি আর একটা হুমোপাথি ওষুধের খালি শিশি — যেখান থেকে পাস জোগাড় করে আমার এই জায়গায় রাখিস। বেলাবেলি বেরোব বুঝলি,—ভাবছিস কী—ছাগলটাকে ঘরের কাছে এনে রাখ। দৌড়ে রাখ। দৌড়ে যা, আমি চললেম আর সময় নেই।

(ভুটের প্রস্থান)

ষষ্ঠ পর্ব

কনসার্ট

(বংশলোচনের প্রবেশ)

বংশ। সবাই পুজোবাড়ি, ঠিক সারছি চুপিচুপি! শিশির মুখ গালা দিয়ে বন্ধ কাগজটুকুও রইল এর মধ্যে, লাল ফিতে জড়ানো। ছাগলটার জন্য দড়িগাছটাও মজুত আছে। সাড়ে হল আর না। ব্যাটা জিলিপির ঠোঙা ছেড়ে আবার পশ্চাদ্ধাবন করবে না তো? আকাশের গতিক খারাপ! সরি পায়ে পায়ে—

(ঝড়ের কনসার্ট) একী! এ যে কোন্নগরে মেঘ—ঘনঘটা! (অকস্মাৎ বজ্রপাত) বাবাঃ যঃ পলায়তি করা যাক তেঁতুলতলার দিকে! দৌড় দৌড়!

(প্রস্থান)

গান

দ্রুম দুদ্দুড় দড় দদ্দড়
আকাশে কে টেন্টরি পেটায় চড়চড় গড়গড়।

অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মাথায় নীলের গম্বুজে
সিসা রঙের পুরু গোচ-মাখানো কে-অস্তর
কেশরে বিদ্যুৎ কড়াৎ কড়কড় চিড় খেয়ে
আকাশজুড়ে যায় বেমালুম চড়াত চড়াস
কড়কড়।
ঈশান কোণ হতে ঝাপসা পরদা ওই এল ওই এল
করে তাড়া গাছপালা শিহরিল
লম্বা লম্বা তালগাছগুলি প্রবল বেগে মাথা নাড়িল
ঝাপটা খেয়ে গাছের ডাল পটাস-মটাস মড় মড় মড়।
গেল মান-ইজ্জত কাপড়চোপড় কাণ্ড দেখে
প্রাণ বাঁচাতে —
বংশলোচনের হার্ট করে ধড়ফড়।

(বংশের পুনঃপ্রবেশ)

বংশ। বাপ, গেলেম বাপ! 'এধারে মেঘের ডাক, ওধারে বিজলি,—সর্ষেফুল দেখিতেছে চক্ষের পুতলী!' বিশ লক্ষ Volt Electricity! জগৎ লুপ্ত। তুমি নাই, আমি নাই।

(পতন ও মূর্ছা)

চুকন্দর। (নেপথ্যে) হ-জৌ-র।

(ঝড়ের শব্দ চলিতেছে)

বংশ। (চৈতন্য) কে আমি—রায়বাহাদুর? কোথায়? খালপার! ও কীসের শব্দ? কোলা ব্যাঙ? ছাগলটা?

(নেপথ্যে) মামা আছেন? —জামাইবাবু? —বংশু আছ? —বাবা সাড়া দাও! বাবুজি কাঁহা চলা গিয়া?

বংশ। যাচ্ছি ভয় নেই—।

মিয়া। আর্তনাদ শুনি যে . . .!

(ছাতা, কম্বলমুড়ি, টর্চ হাতে প্রবেশ)

বংশ। পশ্চাদ্ধাবন করেছে ছাগল। আরে যাঃ খেলে যাঃ। গেছি চুকন্দর সিং।

ভুটে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি, এই যে, এই যে বাবা অন্ধকারে ঘুপটি মেরে—

(মিয়াকে চেপে ধরল)

বিনোদ। (প্রবেশ ও বংশের হাত ধরে) পালাও কোথায়? চলো গাড়িতে ওঠো—বাপ কী ঝড়—চুকন্দর সিং লণ্ঠন . . .।

(লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ)

চুকন্দর। ঠাকুরজি রচ্ছা কিয়া, চলিয়ে গাড়ি পর।

মিয়া। দ্যাখছেন কী? মুশকিল আসান—মুশকিল আসান—।

(ঝড় থামল, বংশকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

চাটুজ্যে। (প্রবেশ) রায়বাহাদুরের বাড়ি তো নয়—রাবণের পুরী। কেউ কোথাও নেই আজ, সব যেন থমথমো! হাওয়াটা দিয়েছে বিশি—গা-টা ছমছম করছে। কী দুর্দৈব ঘটে কে জানে। ও ভুটে, ভুটে—এক ছিলুম তামাক দিতে পারিস? গলাটা কেমন শুকোচ্ছে।

(নেপথ্যে মানিনীর রোদন)

মানিনী। (নেপথ্যে) আমার সে কোথায় গেল বিলাসি? আমি কেন মরতে ছাগল নিয়ে ঝগড়া করতে গেলাম? আর বুঝি এল না! কাউকে দেখিনে যে—সব যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—।

(ভুটের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। কোনো ভাবনা নেই মা। তুমি স্থির হও। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি, কীসের ভয়? এ সবই ভগবানের হাত। ছাগলটা যখন—ভুটে কী হল, হুকোটা পেলিনে?—থাকগে। বাবু যে গেল, তার খবর কেউ রাখলিনে?

(মানিনীর প্রবেশ)

শেষ কেমন দেখেছিলি, বল তো শুনি। দেখি, ব্যাপারটা বুঝে মা, তুমি বসো, আমাকে লজ্জা কী? শুনি কাণ্ডটা।

ভুটে। আপনারা তো মা-ঠাকরুনের মানভঞ্জন করতিই বসে গেলে, আমারে ডেকে বাবু বললেন,—ভুটে এক ঠোঙা গরম জিলিপি, আর একগাছা শক্ত দড়ি—

চাটুজ্যে। অ্যাঁ! ওই মনের অবস্থা,—ওসময় দড়ি এনে দিতে হয়! খালি জিলিপি এনে বলতে হয়, দড়ি পেলাম না।

ভুটে। আমি কেমন করে জানব। আমি জানি বাবু মুশুরি খাটাবে।

চাটুজ্যে। আর কী এনেছিলি বল,—ছুরি, কাটারি, কাস্তে—?

ভুটে। কিছু লয়, শুধু একটু খালি লাল ফিতে, আর একটা হমোপাতি শিশি।

চাটুজ্যে। অ্যাঁ! শিশি! তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে—

মানিনী। শিশিতে আফিং না কুকিন্—কী ছিল তাই বল না? ওরে সর্বনাশ হয়েছে আমার।

চাটুজ্যে। ভুটেকে বলতে দাও মা, ব্যস্ত হয়ো না।

ভুটে। বাবু শিশি আনতে বলে, আমাকে বললে—'তুই যা—সময় নেই। হুইল লিখে নিই।'

চাটুজ্যে। অ্যাঁ! উইল—চুপচুপ! দেখ দেখি, ফটকে গাড়ির শব্দ পাচ্ছি—। মা, তুমি কেঁদো না। আমি রইলেম এখানে,—যতক্ষণ একটা হেস্তনেস্ত না হচ্ছে। বিধাতার কাণ্ড দেখো। হে হরি! কেঁদো না মা।

(ভুটের প্রস্থান)

মানিনী। ওগো তুমি কোথায়?

বংশ। (নেপথ্যে) এই যে আমি, ঠিক আছি, ভয় নেই।

ভুটে। (প্রবেশ) বাবু জলঘরে গেছেন।

মানিনী। আঃ! চাটুজ্যে মিনসে যে নড়ে না! দেখ শিগগির জলঘরে কেন?

চাটুজ্যে। দেখি একবার আমি। হঠাৎ মাথা ঘুরল,—না, কী হল কে জানে!

মানিনী। ও বিলাসি, দেখ না, তোয়ালে-গামছা দিতে বল। টেঁপি গেল কোথায়?

(টেঁপি ও ঘেন্টুর প্রবেশ)

টেঁপি। এই যে, আমি আছি মা।

ঘেন্টু। বাবা মাথা মুছে আসছে।

(মাথা মুছতে মুছতে বংশের প্রবেশ)

মানিনী। ওকী। ভিজে যে ঢোল হয়েছ! শিগগির চা খাবে চলো। তোমার সেই বোতলের ওষুধ আছে,—সর্দির—একটু চায়ে মিশিয়ে দেব ও টেঁপি, আজ আর ওপরে ওঠা নয়।

(নেপথ্যে ম্যাঁ ম্যাঁ ম্যাঁ)

বংশ। আবার ওটা এসেছে,—চুকন্দর, ভুটে, লাঠি গাছ কোথায় গেল।

চাটুজ্যে। আ-হা, কী করো, মেরো না। বৃষ্টি থামতেই বেচারা এসে ছুটে তোমার খবর দিয়েছে। তাই তো তোমায় খুঁজতে পাঠানো গেল, ফিরেও পাওয়া গেল।

মানিনী। ও থাক, ভুটের জিম্মেয়। তোমার আর ভয় নেই। চাটুজ্যে মিনসে যে নড়ে না,—বল না ভুটে।

ভুটে। চাটুজ্যে মশাই, একবার চলেন না রান্নাঘরে লুচি ক-খানা—।

চাটুজ্যে। ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। চল চল।

মানিনী। চলো, বৈঠকখানায় আর কাজ নেই। কিছু খেয়ে ঘুমুবে।

বংশ। আজ আর খিদে নেই তেমন।

মানিনী। ওকী! সে হবে না। গরম লুচি ক-খানা—আর মোহনভোগ খেতেই হবে। নইলে মাথা খাও—

(সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে ছাগলের ডাক)

অধিকারী। একটা লাস্ সং দাও হে—একটা লাস্ সং দাও।

গান

পাঁঠা তুই বড়ই ভাগ্যবান
পাঁঠা তোমায় করলে খাসি
মাংস হবে রাশিরাশি
একসঙ্গে খাব বসে হিন্দু-মুছলমান।
পাঁঠা খেতে বড়োই মজা
কোথা লাগে জিভেগজা
রসগোল্লা হার মেনে যায় রেখে তাহার মান।

(ভুটের ছাগল নিয়ে নৃত্য)

এসপার ওসপার

(লণ্ঠন হাতে রাধাকান্ত ও অধিকারীর প্রবেশ)

অধিকারী। বলি ও রাধাকান্ত, এখানে আলোর অভাব দেখি যে, মেয়েদের জায়গা একেবারে অন্ধকার।

রাধাকান্ত। মেয়েদের পাছে দেখা যায় তাই ওধারটা—

অধিকারী। ও বুঝেছি। তা ভালো। চলো ওধারে দেখি। ও রাধাকান্ত, বলি পুরুষদের দিকটাও যে ভূতচতুর্দশীর রাত্রি দেখছি।

রাধাকান্ত। মোট কয় পয়সার তৈল হল বরাদ্দ, তাতে হবে কী? এই যে হয়েছে তাই ঢের।

অধিকারী। তাই তো! আসল যাত্রার দিনেও এমনি অন্ধকারে 'পেলে' হবে নাকি? বলি ও রাধাকান্ত, শোনো এদিকে। দেখো আমি এখানে বসি, তুমি দৌড়ে গিয়ে আমার লণ্ঠন কয়টায় তেল ভরে আনো। এই নাও পয়সা, আর দেখো—আচ্ছা থাক। দাও আফিমের কৌটোটা আর দুটো পান।

(রাধাকান্তের প্রস্থান)

(ব্যান্ডমাস্টার র‍্যাং-এর প্রবেশ)

র‍্যাং। Hell and Black hole in total eclipse, অন্ধকারের একেবারে পূর্ণগ্রাস—no light.

অধিকারী। গুড মর্নিং স্যার, আলো আসবে স্যার, এক্সকিউজ ইয়োর অনার স্যার, মশালচি চোট্টা স্যার, অল তেল পকেট। বাড়িওয়ালা স্যাংশন নো অয়েল, ভেরি স্ট্রিক্ট।

র‍্যাং। হারমোনিয়াম এসেছে?

অধিকারী। সব হাজির—হারমোনিয়াম, ছাগল, গোরু, মোষ, কেবল—

র‍্যাং। কেবল কী?

অধিকারী। কাউকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

র‍্যাং। আলো নেই, জায়গাটা দেখাচ্ছে যেন হারমোনিয়ামের সাদা দাঁতের পাটি পড়ে গিয়ে হাসছে শুধু কালো দাঁত কটা মিশি দিয়ে।

অধিকারী। ভেরি রাইট স্যার। ইয়োর অনার, এটা হচ্ছে কিনা বৈতরণীঘাট জবর জংশন; ফর দ্যাট রিজন স্যার, লুক ভয়ংকর একটু খালি। 'সিন-পেন্টার' গুডম্যান। ততক্ষণ এখানে বসে একটু ইস্মোক স্যার? ও কর্তা, কর্তা?

(কর্তার প্রবেশ)

কর্তা। কী কী কী হল?

অধিকারী। এতক্ষণে কী হল, দেখচ না, স্যার এসে গেছেন? আলো নেই, ঘণ্টা দেব, কিন্তু রামশর্মার টিকিও দেখছিনে। টিকিট নিয়েছে কিন্তু একগোছা।

কর্তা। সে যে ওখানে বসে লুচি ভাজছে দেখলুম।

অধিকারী। আরে তাকে যে আত্মারাম সেজে এখনই বেরতে হবে! কী আক্কেল; দেখো তো লুচি ভাজছে!

কর্তা। রামশর্মা নেই তো লক্ষ্মণশর্মাকে পাঠাও আসরে।

অধিকারী। বিলক্ষণ! তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে। হচ্ছে নহুষের আত্মচরিত — না তুমি কও ভাই লক্ষ্মণকে আসরে পাঠাতে? তড়িঘড়ি তাকেই বা পাই কম্‌নে?

কর্তা। তা হলে নহুষকেই দাও চালান, সে বেলা পাঁচটা থেকে রাজা সেজে বসে আছে।

অধিকারী। আরে! আগে চলবেন আত্মারাম যিনি হন নহুষের সূক্ষ্ম শরীর। পরে যাবে স্থূল দেহ গজেন্দ্র-গমনে। ভুললে নাকি?

কর্তা। কিছু ভুলিনি। তুমি একটু ঠান্ডা হও দেখি! নিজের পার্টটা ঝালিয়ে নিই।

অধিকারী। ঝালাও ঝালাও, তোমাকে তো জানি, আসরে নামলেই সব বিস্মরণ!

কর্তা। সে তোমাদের দোষ, ইলেবেন আওয়ারে দেবে পার্ট!

অধিকারী। দু-ছত্তর তো পার্ট, এক মাসেও মুখস্থ হল না?

কর্তা। ছত্তর হলে কী হয়! কথাগুলো যে চোয়াল-ধরানো! 'বিদ্যুদ্দন্ত-বিস্ফারিত ঘোরতর অট্টহাসত্রাস চিৎকৃত ঝঞ্ঝাবিদারিত রজনী!' —

অধিকারী। আরে আমারই কি কিছু কম নাকি? 'বিধুন্তুদ বিধুমুখী বৈরী কটক বেষ্টিত বিলম্বিত বেণী ফণী মণি কিঙ্কিণী বিস্ফারিণী রাজনন্দিনী!'

কর্তা। কই আত্মারাম শর্মার এখনও দেখা নেই যে! দাও ফাস্ট বেল চটপট, অডিয়ান্স খেপে উঠেছে।

(নেপথ্যে গোলমাল)

অধিকারী। স্যার, ফাস্ট বেল। গিভ ইংলিশ সং।

র‍্যাং। ঠিক আছে। বাজাও।

(ইংরেজি গৎ)

(আত্মারামের প্রবেশ)

আত্মা। রও বাপু একটু মাথা ঠান্ডা করে নিই, শিঙে ফুঁকেই চলল।

অধিকারী। আর মাথা ঠান্ডা করে না।

কর্তা। ফলার হয়ে গেছে তো? পেট ঠান্ডা হয়েছে? এখন চটপট সেজে নাও।

আত্মা। কী সাজতে হবে?

অধিকারী। আত্মারাম—ভুললে নাকি?

আত্মা। কিছু ভুলিনি। শুধু আসরে গিয়ে কী করতে হবে তা তরমুজ-চাপা পড়ে গেছে।

কর্তা। ব্যাস, মুশকিল করলে তো!

অধিকারী। দুত্তোর! চলে এসো হে কর্তা আমরা সেজে নিইগে। স্যার গিভ একেবারে তেজে সেকেন্ড বেল।

(কর্তা ও অধিকারীর প্রস্থান)

র‍্যাং। ওহে লাগাও তা হলে — নাও বাজাও।

(ইংরেজি গৎ)

আত্মা। চুরুট খায় কে? ধূমপান নিষেধ দেখতে পাচ্ছ না?

র‍্যাং। যে অন্ধকার — দেখছি নিজের মুখের কাছে একটি রামপাখি!

আত্মা। আমি রামশর্মা। আমি রামপাখি? কুঁকড়ো? হিঁদুর ছেলেকে তুমি কুঁকড়ো বলো! ফেলে দাও চুরুট; নইলে রিপোর্ট করব তোমার নামে — ইনসাল্ট!

(কুঁকড়োর ডাক)

র‍্যাং। ও মাই প্যারট! পড়ো তো শুনি বুল্লি, পল্লি, ডারলি!

আত্মা। তুমিই কালীঘাটের পোটো? উপরন্তু অবনবাবুর ছাত্তর?

র‍্যাং। ছুট। আমি কেন পোটো হব। আমি মি র‍্যাংস্যাং, ই আই আর গ্লাসগো। ওই যে পোটো তো এই দিকেই আসছে।

(চিত্রকরের প্রবেশ)

চিত্রকর। আমি কালীঘাটের পোটো নই। আমি চিত্রকর, অবনবাবুর ছাত্র।

আত্মা। ভালো, বলি রংটং কিছু সঙ্গে এনেছ? নাকি ওর মতো গেলাসগো পর্যন্তই?

চিত্রকর। বাজে বকো কেন বলো তো?

আত্মা। বাজে বকতেই শিখেছি সেই এতটুকু বেলা থেকে। এখন একটা কাজ করতে পার? বলি আমাকে একটু রং করে সোন্দর করে দাও দেখি। কেমন রং করা, ওর নাম কী, কী বলে ভালো চিত্রকর?

চিত্রকর। আগে তোমার কী পার্ট করতে হবে তাই বলো — তবে তো বুঝি কী রং কী সাজ মানাবে তোমায়?

আত্মা। আমি, আমি, ও পম্‌টার বলো না হে আমি কে — হাঁ আত্মারাম।

চিত্রকর। আত্মার তো রং নেই। তা ছাড়া, আত্মা হল সূক্ষ্ম। তুমি যে দেখি বিষম স্থূল। তোমাকে তো এ পার্ট মানাচ্ছে না। এত পুরু পালকের তোশকখানা চাপিয়েছ কেন? তোমায় খুব মিহি কাপড় পরতে হবে। হাওয়ার মতো একেবারে ফিনফিনে।

আত্মা। শীতকালে যাত্রা! এই হিমে পাতলা পাতলা কাপড় পরে কেঁপে মরি আর কী! যাও আমায় সাজাতে হবে না।

চিত্রকর। দেখো, তুমি তা হলে আত্মারাম-পাখি সেজে নাও ঠোঁট লাল করে দিই এসো। আর গায়ে একটু সবুজ —

আত্মা। না, না, না, লাল ঠোঁট পর্যন্তই থাক। যে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সাজটা কেমন হল।

চিত্রকর। রোসো, একটা রংমশাল জ্বালি।

আত্মা। এঃ এ যে একেবারে রঙিন আলোর ভেলকিবাজি লাগিয়ে দিলে হে। আমার যে নেচে যেতে ইচ্ছে করছে।

র‍্যাং। তা নাচো না। ইচ্ছে যদি হচ্ছে তো নেচে ফেলো। যাত্রার আগে একটু হাত-পায়ে খিল ছাড়িয়ে নেওয়া চাই তো?

আত্মা। তা হলে একটু হরিবোল দিয়ে নাচি!

র‍্যাং। হরিবোল? Horrible! এ কি গঙ্গাযাত্রা পেলে নাকি?

চিত্রকর। তা হলেই কিন্তু দপ করে আলো নিভে যাবে।

আত্মা। আমি তো নাম করতেই শিখেছি। ওহে চিত্রকর, তুমি একটা পাখির গান শিখিয়ে দাও না?

র‍্যাং। আচ্ছা, শেখো তবে, এই জুড়ি আর তুড়ি, ধরো ধরো গান।

(জুড়ি ও তুড়ির প্রবেশ ও গান)

(গান)

ও মন দেখো রে চেয়ে আজব তামাশা
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালজুড়ে এক পাখির বাসা।
এক-এক ডিমে কত কারখানা
ও তা গনা যায় না
কেউ জানে না কত হয় ছানা।
এক পাখিতে সবার আহার জোগায় রে—
সবে সমান তার ভালোবাসা।

(তপসি মাছওয়ালার প্রবেশ)

মেছোগণ। চাই তপসিমাছ, অন্ডালি তপসিমাছ, ম্যাংগো ফিশ।

চিত্র। এই, এই এদিকে, এদিকে। এঃ এ যে তিন তোপ।

আত্মা। কত করে, কত করে?

কালু। আমাদের যাত্রা করতে দেন তো—

আত্মা। তো কত করে হবে বলে ফেলো না।

জালু। যা খুশি দেবেন।

র‍্যাং। যা খুশি! এ্যাজ ইয়ু প্লিজ? এবারে ভালো সুর ধরেচ। ছোকরাগণ, গান গাও। খুশি করো আমাদের সাথে—কাম অন।

(গান)

আমায় যা খুশি তাই দিয়ো
আমার যা আছে তাই নিয়ো
শুধু কাঁদিয়ে দিয়ো না রে
তুমি কেঁদে চেয়ো না—
তোমায়-আমায় দেখা হল
দুধসাগরের ধারে
চোখের জলে মিলনমালা
ভিজিয়ে দিয়ো না রে।
হাসি দিয়ে করব বরণ
বাঁশি আমার ভরব গানে
পরানভরা সুরের টানে

টানে টানে টেনে নিয়ো

তোমার পানে॥

চিত্রকর। বাহবা; সুবোধ ছেলেরা, দেখি কেমন মাছ?

আত্মা। আরে রও, টানাটানি করো কেন?

কালু। দেখুন মশায়, যেন কদমফুলের গড়ে মালা!

আত্মা। যাত্রার আরম্ভে, নারদমুনি যেন দাড়ি-গোঁফ নিয়ে দেখা দিলেন, দাও।

জালু। ও হবে না মশায়, বলুন আমাদেরও যাত্রার দলে নিলেন ভরতি করে?

আত্মা। নিলেম, নিলেম। এই তোমাদের মাছ—

চিত্রকর। এই তোমাদেরও। এই বেশ হল।

আত্মা। এখন আমাদের সেই মাছভাজা-ঠাকুরটা এলে যে হয়।

ব্যাং। ততক্ষণ একটু নেচে-কুঁদে খিদেটাকে চাঙ্গা করে রাখা যাক। 'শরীর করে তাজা—নাচ মাছভাজা'।—

কালু। নাচতে হবে?

আত্মা। হবে না! মাছ কি অমনি ভেজে খাওয়াব? তেল দাও এখন!

জালু। এই সবার মাঝে নাচব, গাইব, লজ্জা করবে যে!

চিত্রকর। যাত্রার দলে ঢুকে লজ্জা? নাও নাচো।

জালু। এখনই?

কালু। এইখানেই?

আত্মা। এইখানেই। ফ্রিশিপ দিয়েছি মনে রেখো। নাও নাচো-গাও।

(গান)

এইখানে সখা তোমায় নাচতে হবে।

আসতে-যেতে নাচতে হবে সভার মাঝে

নাচতে হবে নাচতে হবে

তেমনি করে নাচতে হবে,—চলে যাবার সময়

তোমায় এমনি করে নাচতে হবে।

শহর-বাজার দিনে-রাতে, ছেলে-বুড়ো সবার সাথে,

নাচতে হবে নাচতে হবে, আসতে-যেতে

নাচতে হবে॥

আত্মা। ক্যাপিটাল! পাকা যাত্রার দলের ছোকরা।

কালু। আমরা শিঙ্গিবাজারে নাটঙ্গি সাজতেম।

চিত্রকর। এসব ভালো গান শিখেছ বুঝি সেখানে?

জালু। না অবনবাবুর আর্ট ইস্কুলে শিখেছি।

চিত্রকর। আর্ট জানো? আরে আমিও তো আর্টিস্ট! এসো শেকহ্যান্ড।

কালু। আমাদের একটু রং করে দাও না?

আত্মা। রং অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। বাঁশি বাজালেই ছুটে আসবে।

কালু। ধরো বাঁশি।

জালু। ধরো গান।

চিত্রকর। এই দেখো রং এসে গেল হারমোনিয়ামের হাপরের বাতাসে ডানা মেলে।

(গীত)

দিনে-রাতে মিলিয়ে দেবার গান, রঙে-রঙে—
ওই আকাশে লুকিয়ে ছিল, বাতাস বয়ে সেই তো
এল বাঁশির সুরে—
রইল বাঁধা সুরে সুরে, এই বাতাসে
লুকিয়ে ছিল,
আলো-ছায়ার মিলিয়ে দেবার গান,
বাঁশি তার বাজল সুরে সুরে
এই বাতাসে রঙে-রঙে॥

আত্মা। তোমরা থামো আমি যাত্রা করি।

চিত্রকর। যাত্রা করলেই হল ঝুপ করে?

আত্মা। গান শুনে কি চুপ করে বসে থাকা যায়?

চিত্রকর। তা বলে যখন খুশি যাত্রা করবে নাকি? সময়-অসময় নেই?

আত্মা। অধিকারী তো এইরকমই হুকুম দিয়ে লিখন পাঠায়েছে।

চিত্রকর। বটে, বটে। ভুলে গিয়েছিলেম। আচ্ছা, তা হলে তুমি নির্ভয়ে যাত্রা করো — ওধারে।

আত্মা। ওধারে ভারী অন্ধকার। আমি এইখানেই বসে রইলাম।

চিত্রকর। যাত্রা করবে না?

আত্মা। না। আমার খুশি, আমি বসে বসে তোমাদের যাত্রা দেখব, গান শুনব, নাম দেখব। তারপর মাছভাজা খেয়ে, ট্যাক্সি করে গোলাপি বিড়ি ধরিয়ে, বাড়ি যাব আরামে। তবে আমার নাম আত্মারাম।

চিত্রকর। তোমার মতো আর কি কেউ আরামে যাত্রা করতে আসছে?

আত্মা। আসছে কী? ওই দেখো এসে পড়েছে!

(নহুষের প্রবেশ)

নহুষ। কই কোনদিকে গেলেন?

চিত্রকর। কী খুঁজছ? মাছভাজা নাকি?

নহুষ। আত্মারাম গান শুনে এদিকে এলেন। তারপর আর দেখতে পাচ্ছি না। হারিয়ে গেছেন।

(গীত)

আমার প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়?
যারে শুধাই কাতরে সেই মোরে ফেলে পালায়।

কারে জিজ্ঞাসি ব্যথিত কে এমন
উপদেশদানে প্রাণধনে মিলাবে আমায়।

কালু। এই যে এখানে চুপটি করে—

জালু। লুকিয়ে আমাদের গান শুনেছেন।

আত্মা। আরে চুপ! আমার এখনও আত্মপ্রকাশের সময় হয়নি।

চিত্রকর। সময় আবার কী? আমাদের খুশি আত্মপ্রকাশ করতেই হবে তোমায়।

আত্মা। আমি আত্মপ্রকাশ করলে শুধু ছেলেরা নয়, তুমিসুদ্ধ অস্থির হয়ে পড়বে। রাগে, ভয়ে, দুঃখে, সুখে, হাসি, কান্নায় মিলে একটা বিপর্যয়-ঝড় বয়ে যাবে এখানটায়।

কালু। তা যাক আমরা ভয় পাই পাব।

জালু। ঝড় বইলে ভয়টা কী?

আত্মা। আত্মারাম যেদিন আত্মপ্রকাশ করবেন, সেদিন ভয় পাও কি না দেখা যাবে। এখন ওই রাজা নহুষের মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, উনি যেন প্রকাশ করতে চাচ্ছেন মনের কথা।

নহুষ। হে আত্মারাম। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মুখে এসে আটকে থেকে আমার মন চঞ্চল হয়েছে। আমাকে যেখানে হোক একটা জায়গায় পাঠিয়ে দাও। খেয়া-নৌকার মতো খালি এপার আর ওপার, দুটোর মাঝে বাঁধা থাকতে চাচ্ছে না মন।

আত্মা। ক্যা-পি-টা-ল!

চিত্রকর। গান গেয়ে মনটা খুশি করে নাও না কেন?

নহুষ। স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার করতেই আমার দিন গেছে। গান শেখবার বা শোনবার সময় পাইনি। কেউ যে এখানে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গান গাইবে, তেমন জায়গাও নয় এটা। দিন নেই রাত নেই, এই বৈতরণীর ধারে বসে কেবলই শুনছি 'পার করো, পার করো' বলে সবাই ছুটছে। জল ডাকছে 'পার করো'; বাতাস গর্জে বলছে 'পার করো'। 'গান করো' একথা কেউ বলে না।

চিত্রকর। ইনি ছটফট করছেন, ঘাটে বাঁধা ওই খেয়া-নৌকোটার মতো।

আত্মা। তা তো দেখছি। কিন্তু ও বলতে চায় কী তা বলে ফেলুক না।

নহুষ। মন যে কী করছে—কোথায় যেতে চাচ্ছে—তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু চাচ্ছে কিছু।

র‍্যাং। রাজাবাবু, তোমার 'হাওয়ান-দেলকি' বিমারি আছে। দেখি হাত—অতিশয় চঞ্চল এবং দ্রুত যাচ্ছে—যেন হাওয়াগাড়ি। জিব দেখাও! দন্ত বাহির করো (দন্ত উৎপাটন) ইস! গজদন্ত!!

নহুষ। হে আত্মারাম!

র‍্যাং। মুখ বন্ধ করো। দেখি পেট—ও ম্যাজেস্টিক। ডবল ফিফটিফোর ইঞ্চেস!

আত্মা। ইঞ্চি কী! গজ বলো সাহেব।

র‍্যাং। নাউ হার্ট।

[নহুষ ঘাড় দেখায়]

আত্মা। বুড়োরস্ক ব্রেম্মাস্কন্ধ দেখচে কী সাহেব, অজরাজ গজরাজ একসঙ্গে।

র‍্যাং। ভয় নাই, ভয় নাই, তোমার বিমারিটা সামান্য মেন্টালো গ্রামাফোনিয়া। মনের মধ্যে কালো

একখানা জাঁতা ঘুরছে, ভালো হয়ে যাবে। ভালো হাওয়া খাও; আহ্লাদ-আমোদ করো। তোমার শরীরে একটু স্পিরিট দরকার এবং এক-কুড়ি রামপাখির ডিম্ব ও বাচ্চা পথ্য করো, ভয় নাই।

নহুষ। আমি যে হিন্দু আর্য বংশ। ওসব কুপথ্যি খাই কেমন করে? জাত যাবে যে!

র‍্যাং। মেন্টালো গ্রামাফোনিয়া! যখন জাতের জাঁতাকলে পিষে মারবে তোমায় তখন ডবল ফি দিলেও আমায় পাবে না।

নহুষ। মন যে কী চাইছে—কবিরাজি না হুমোপাথি না হেলোপাথি না গঙ্গাজল না রামপাখির জুস, কিছুই ঠিক পাচ্ছি না।

র‍্যাং। আমি জানি তোমার যা বিমারি। শোনো মন দিয়া—

গান

এপারে-ওপারে যাওয়া-আসা করে
ভরল না তোর মন;
সে যে কাঁদে সে যে বলে
বাঁধা রইব না রে—॥

(র‍্যাং-এর প্রস্থান)

নহুষ। মনের কথা টেনে বলেছ—খুলে দে রে খুলে দে কাজের বাঁধন, কুলের বাঁধন, বাঁধা পথের বাঁধন!

গান

আমি করব এ রাখালি কতকাল
পালের ছয়টা গোরু ছুটে করেছে আমায় হাল-বেহাল
আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই
তারা ঘুরে-ফিরে বাঁকা পথে চলেছে সদাই,
আমি যদি যাই তাদের ফিবাতে
তারা ছুটে দলায় খেতের আল ॥

আত্মা। নহুষ, আমার শরীরটার মতো দৃষ্টিটাও সূক্ষ্ম জানোই তো?

নহুষ। জানি।

আত্মা। আমি সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, তুমি এদের সঙ্গে গান গেয়ে যেদিকটায় গা-ভাসান দিতে চাচ্ছ, সে-দিকটায় কী রয়েছে।

চিত্র। বলো তো শুনি কী রয়েছে?

আত্মা। রসাতল। একেবারে তলতলাতল রসাতল। ঘোরতর ব্যাপার।

নহুষ। আর ওদিকে?

আত্মা। স্বর্গলোকের গোলকধাঁধা!

নহুষ। ওধারে?

আত্মা। মর্ত্যভূমির দিল্লিকা লাড্ডু।

চিত্র। আর এদিকটা সবদিকের বার—যেন খাঁচার মাঝামাঝি জায়গায় ঝোলানো দাঁড় একটা!

জালু। কী বলিস ভাই, এ জায়গাটায় একটু রয়ে-বসে গেলে হয় না?

কালু। আরে, না রে না, পারে যেতে হবে।

জালু। চলে আয় আর মজলিশ করে না।

(কালু-জালুর প্রস্থান)

আত্মা। রয়ে যাবার পক্ষে এ জায়গাটা মন্দ নয়। এসো না সব, বসে যাও। আমি একটা পাঁচালি জানি, সেইটে বলি মজলিশ সরগরম হোক।

মধু-মাসরে গড়াকু ফুঁকি—
তেরেকিটি ধাঁই করি বৈঠকি।
তরো-বেতরো তাকিয়া হেলানে—
মহা মজলিশ বসিলা এহানে।
রসিক মিলিলা গন্ডা গন্ডা,
রঙে-ঢঙে বিবিধ পান্ডা।
রসনারোচক খান্ডারবাণী,
সরস কথা মানসহরা,
পান বিড়া আর ধুম্-পত্ড়া।
আসর জমক ঠান্ডা পানি॥

নহুষ। আত্মারাম, চলো ওধারে যাবা না? বসেই রইলে যে? এই তো খটকা লাগালে!

আত্মা। কেন এতে আবার খটকা কী? ওরা যাত্রা করুক, তোমায়-আমায় বসে থাকি আরামে।

নহুষ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি আমারই আত্মাপাখি কি না!

আত্মা। সন্দেহের কারণ কী শুনি?

নহুষ। রাজ-আত্মা হলে তোমার ধরন-ধারণ অন্যপ্রকার হত। বুক ফুলিয়ে চলতে ডরাতে না অন্ধকার দেখে।

আত্মা। আমি নিজের সিংহাসনে গট হয়ে বসে আছি দেখো রাজার মতো। আর—

নহুষ। আর কী?

আত্মা। তুমি একটা ঝরা পাতা কী ফুলের মতো ফুঁয়ে উড়ে পড়তে চাচ্ছ। এতেই বুঝেছি তুমি আমার স্থূল শরীর নও একেবারেই।

নহুষ। কে জানে, এসব যেন সমিস্যে বলে ঠেকছে! ও আত্মারাম।

(হর্তা-কর্তার প্রবেশ)

হর্তা। এই, গোলমাল হচ্ছে—

কর্তা। যাও এখান থেকে—যাত্রা শুরু হচ্ছে।

চিত্র। কে হে বটে তুমি?

আত্মা। হুকুম চালাও এহানে?

কর্তা। চিনতে পারলে না?

হর্তা। লেখন চেনো তো দেখো।

চিত্র। ইনি?

কর্তা। ওই লেখনেই জবাব পাবে।

হর্তা। যাও, লিখনমতো যাত্রা চলবে।

চিত্র। পালাটা উলটেপালটে গেছে। আগা এসেছে গোড়ায়, গোড়া গেছে আগায়।

আত্মা। আলো-আঁধারে ধাঁধা লেগে যাওয়ার মতো। কিছুই ঠিক নেই।

কর্তা। এইভাবেই যাত্রা করে চলো।

(হর্তা-কর্তার প্রস্থান)

নেপথ্যে। এটা রয়বার জায়গা নয়, বয়বার জায়গা—বয়ে চলো — গান গেয়ে। রয়ে-বসে চলা চলবে না — নেচে যাও।

(মেঘ-বিদ্যুৎ গর্জন)

সকলে। চলে-চলো, রয়ো না এখানে।

নহুষ। কোথায় যাব কোন পথে?

আত্মা। নহুষ কী করো, যাচ্ছ কোথায়?

নহুষ। তাই তো কী করি কোথায় যাই?

চিত্র। কথার খেউ হারাও কেন?

নহুষ। সব হারিয়ে গেল তো খেউ! নিজেই যাই কোনদিকে ভেবে পাচ্ছিনে।

আত্মা। ছোঃ যাত্রা করতে এসেছিলে কী বলে?

নহুষ। হাওয়ায় মনটাকে সুদ্ধু উড়িয়ে নেবার জোগাড় করেছে।

চিত্র। এই নাও লেখা-কাগজ—এইটে দেখে পাঠ বলে যাও।

(ষাঁড় ও মহিষ মুখোশধারী হর্তা-কর্তার প্রবেশ)

আত্মা। ওহে মস্ত একটা ষাঁড় আর বিপর্যয়-মোষ আসে দেখো। ওরে বাবা রে অন্ধকারে চাইছে দেখো! তেড়ে আসে যে—পালাই চলো।

(নহুষ-আত্মার প্রস্থান)

চিত্র। ভয় কী? সাজা ষাঁড়, সাজা মোষ।

(পলায়ন)

কর্তা (ষাঁড়)। এরা বলে কী? সাজা ষাঁড়! হাঃ হাঃ, ও হর্তা!

হর্তা (মোষ)। আবার হর্তা কী? এখন আমি মহাকালের মহিষ। আর তুমি —

কর্তা। আমি যা তাই। কী করতে এখানে এলেম মনে পড়ছে না।

হর্তা। তোমায় নিয়ে কাজ চলা মুশকিল। আচ্ছা, আমি কী করতে এসেছি মনে আছে?

কর্তা। তুমি কে! ভালো রোসো—

হর্তা। চিনতে পারছ না? বাতাসটা পর্যন্ত যাকে ছুঁয়ে কালো হয়ে যায় সেই কালপুরুষকে বহন করে চলি আমি। আমাকে চিনতে পারছ না?

কর্তা। দেখতে পেলে তো চিনব! তুমি আসামাত্র যেটুকু-বা আলো ছিল এখানে, সেটুকুও পালাই-পালাই করছে।

হর্তা। রসিকতা রাখো। যাত্রা হচ্ছে মনে থাকে যেন। ওইদিক দিয়ে প্রস্থানের পথ। ওদিকটার ভার তোমার উপর, তুমি ওধারে দাঁড়াও।

কর্তা। আর তুমি?

হর্তা। টুঁসিয়ে যাত্রা করানোর ভার হয়েছে আমার উপর। এই পথ আগলে রইলেম—দেখি কে আসে এ-বাগে।

কর্তা। আমি দেখি কে যায় ও-বাগে।

(নেপথ্যে বেড়াল-ডাক)

কর্তা। ডাকল কী ও?

হর্তা। এ যে ভয়ের ডাক!

কর্তা। এ যে বলছে খেলুম!

হর্তা। তাই তো দেখছি!

কর্তা। আরে দেখলে তো বুঝতুম—সত্যি ভয় না মিথ্যে ভয়!

হর্তা। এ যে খালি শুনছি—গেলুম, খেলুম, এলুম। ভয় কী? ওই শোনো না—

কর্তা। ঠিক বুঝতে পারলুম না। মনে হচ্ছে যেন বলছে—এই ঘাড় ভাঙলুম!

হর্তা। বোধ হয় কেউ যাত্রা করতে আসছে। ঠিক হয়ে থাকো ওর প্রবেশপথে তুমি। প্রস্থানের পথে আমি।

কর্তা। প্রস্থানের পথে তো আমার থাকার কথা—বাঃ!

হর্তা। না হে সেটা তখন আমার বলায় ভুল হয়েছিল।

কর্তা। তা হবে না। ভুলটা এ খেপের মতো বজায় থাক। ভালো বুঝি তো পরে শুধরে নেব।

হর্তা। ও তো দেখি এইদিকেই যাত্রা করতে আসছে। আমরা তা হলে আমাদের যাত্রাটা ওদিকে গিয়ে করি—কী বলো?

কর্তা। কোনদিকে? অন্ধকারে যে দিকভিরমি লেগে গেছে।

মনতর মনতর বাঘের মনতর,
বাঘ ঢুকল ঘরের ভিতর—
ওরে বাঘ বেরোবি তো বেরো—
নইলে মানুষ খুন হবে বাবা।

হর্তা। আরে চটপট চলে এসো না।

কর্তা। কারও প্রবেশ না হতেই আসর খালি রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায় না?

হর্তা। বাঘে-গোরুতে একসঙ্গে যাত্রা তো কেতাবে লেখা নেই। এই দেখো, তোমার-আমার নামের নীচে, অধিকারী স্বয়ং লিখে রেখেছেন ব্র্যাকেটের মধ্যে 'প্রস্থান করো'।

কর্তা। প্রস্থান তো দেখছি আছে লেখা। কিন্তু ভয়ের ডাক শুনে হাতে-পায়ে যে খিল ধরে গেল।

হর্তা। দেখো! না যাও তো তোমাকে আমি টুঁসিয়ে প্রস্থান করব!

কর্তা। আমার বোধ হয়, ছাপার ভুল হয়েছে আগাগোড়া বইটাতে। আমাদের প্রস্থানের পর তো কারও প্রবেশ থাকা চাই—দেখো ফাঁক।

হর্তা। সে কাজে তোমার দরকার কী? আমাদের পার্ট আমরা নষ্ট করে গেলুম—ব্যাস ফুরিয়ে গেল কাজ।

কর্তা। আবার যদি এখানে পুনঃপ্রবেশ করতে হয়?

হর্তা। আবার ঘাড় ধরে ঠেলে পাঠাবে অধিকারী।

কর্তা। এ কীরকম যাত্রা ভাই বেহিসাবি রকম?

হর্তা। মাথামুন্ডু কিছুই নেই—প্রস্থান আর প্রস্থান।

কর্তা। ওই দেখো, রক্তমূর্তি কে আবার আসে এধারে। কপালে সিন্দূর গলায় জবাফুলের মালা—খাঁড়া হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। পাশ কাটাই চলো।

(হর্তা-কর্তার প্রস্থান)

(রক্তমূর্তির প্রবেশ)

রক্তমূর্তি। ঘোরে বন বনাবন সন সনাসন ধর্মমুষল ঘোরে—যেদিকে মুন্ডু ঘোরাবে মুন্ডু ঘুরবে মুন্ডু আটকা পড়বে ঘাড়ে। ভক্ত রক্তমূর্তি! আমার প্রবেশে বাধা? বলিদান না দিতেই বলে প্রস্থান! হাঃ হাঃ হাঃ, রোস তো খাঁড়াখানা ঘুরিয়ে নিয়ে মারি এক কোপ। সাবাড় করি মাথামুন্ডু বিশ-পঁচিশটা একসঙ্গে। কই পলায়ন করলি যে সবাই—হাঃ হাঃ—মা ভৈঃ।

(সবেগে ছাগলের প্রবেশ)

ছাগল। (ঢুঁ মারিয়া) ডাকছ?

রক্তমূর্তি। গেলাম—মা—(ঢুঁ) রও রও, গতিরোধ করো না।

ছাগল। গতি হবে এখন। (ঢুঁ) পাঁঠার মুড়ো মিষ্টি লাগছে না?

রক্তমূর্তি। উঃ লাগে রে বাপু, লাগে। আরে বাপু তোকে বলি দিয়ে, তোর সঙ্গে যে ছয়টা রিপু আছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তোর যা হয় একটা সদ গতি করে দিতে চাইলেম। তার বখশিশ কি এই হল?

ছাগল। রক্ত মেখে মেখে তোমার পিঠে ঘামাচি হয়েছে। আমি সেইগুলো একটু চুলকে দিচ্ছি বই তো নয়! উঁ-আঁ, করো কেন? (ঢুঁ)

রক্তমূর্তি। গেলাম গেলাম টুঁসিয়ে মারলে। বাবা রে গেছি রে, কে আছ কোথায়? দৌড়ে এসো প্রাণ যায়। মা-গো-মা!!

(সবেগে নহুষের প্রবেশ)

নহুষ। রহো রহো। এ যে ব্রহ্মহত্যা (রক্তকে ধরে) আ-আত্মারাম! সর্বনাশ উপস্থিত। কনস্‌টেবল, পুলিশ—

রক্তমূর্তি। যাও ছাড়ো। আমার এখনও শেষ হয়নি। কথা রয়েছে বাকি। ছেড়ে দাও এক্ট করি।

নহুষ। ও হর্তা, ও কর্তা—দেখোসে!

ছাগল। (নহুষকে ঢুঁ দিয়া) পালাও ওধারে। (ক্রমাগত ঢুঁ)

নহুষ। গেছি গেছি! ও— কে আছে? নরহত্যা হত্যা হল। ও জমাদার, ও চাপরাশি, ও ইনস্‌পেক্‌টার।— হে আত্মারাম!

রক্তমূর্তি। (নহুষকে ঘুঁষি) আমার যাত্রা ভঙ্গ করলে, রাসকেল কোথাকার! আসরে ঢুকলে কার হুকুমে? নিকালো বদমাশ, বে-আক্কেল, বে-আদব!

নহুষ। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না। কলিকালে ধর্ম নাই? হে আত্মারাম!

(আত্মার প্রবেশ)

আত্মা। কী কী কী হয়েছে, একী ব্যাপার?

নহুষ। গেছি। একেবারে ঘুঁষায়ে ঘুঁষায়ে দফা নিকাশ করেছে।

আত্মা। এঃ এ যে দেখি রক্তগঙ্গা!

নহুষ। ওই ওই রক্তমূর্তিটার কাজ।

রক্তমূর্তি। অ্যাকটিং-এর সময় বাধা দিতে আসো কেন? মাতাল কোথাকার!

ছাগল। ঠিক হয়েছে। উত্তম-মধ্যম হয়েছে।

রক্তমূর্তি। ইন্‌টরপ্ট করেছে মশায়। রাগে আমার গা কাঁপছে। আমার অমন শ্যামাসংগীত মাটি করে দিলে।

নহুষ। ইন্‌টরপ্ট না করলে,— চক্ষের সামনে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত যে!

আত্মা। তোমার মাথামুন্ডু হত। প্লে হচ্ছে বুঝলে না?

রক্তমূর্তি। জমা আসরটা ভেঙে দিয়ে তছনছ করলে এমন প্লে-টা!

নহুষ। কী বললে 'পেলে'! আমি বলি ম্যাড়ার লড়াই! দেখে হৃৎকম্প হল, সামলাতে এলাম ছুটে।

রক্তমূর্তি। আমার এমন অ্যাকটিং মাটি হল। তোকে ধরে বলিদান দিলে তবে আমার রাগ পড়ে।

ছাগল। আর হ্যাঁ! এই ফাঁকে আমিও বেঁচে যাই।

নহুষ। কী-ই-ই! ভদ্রসন্তানকে বলিদান দিতে চাও, নরহত্যা করবে? জানো এ কোম্পানির মুল্লুক! তোমায় ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝোলাই তো—

রক্তমূর্তি। তো কী, তো কী?

আত্মা। আঃ নহুষ! ঠান্ডা হও, ঠান্ডা হও।

নহুষ। পামর, নররাক্ষস, পাঁঠা পেয়েছ আমায়— বলিদান দিয়ে মস্তক চর্বণ করবে?

রক্তমূর্তি। দেখেন মশায়রা! যাত্রা ভঙ্গ— আবার রোখ দেখেন ওরে—

(হর্তা-কর্তার প্রবেশ)

কর্তা। ও হর্তা, ব্যাপার দেখছ কী?

হর্তা। ব্যাপার ক্রমেই গড়াচ্ছে।

নহুষ। দেখেন কর্তা আমি নিরপরাধ।

রক্তমূর্তি। আবার বলে নিরপরাধ! তোমার তো এসময়ে আসবার কথা নয়।

নহুষ। জানি জানি। কিন্তু মশায় যে তারস্বরে চিৎকার করলে।

রক্তমূর্তি। আমি চিৎকার করে মাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, তোমায় তো নয়?

নহুষ। কে জানে, ডাক শুনে কেমন হয়ে গেলাম। ভাবলাম গো-হত্যা কী ব্রহ্মহত্যা হচ্ছে।

ছাগল। দেখেন, এখনও ভদ্রলোক গোরু বলছে!

নহুষ। যত নষ্টের গোড়া এই ছাগলটা। ওর শৃঙ্গ মুড়ায়ে, ঘোল ঢালায়ে, শহর ঘুরায়ে আনেন। দেন কড়া শাস্তি। বড়ো টুঁসায়েছে কর্তা।

ছাগল। বটে বটে—

আত্মা। যেতে দাও যা হবার হয়েছে—

কর্তা। মাঝে গ্যাপ পড়ল, যাত্রা চলে কেমন করে—ও হর্তা?

হর্তা। একটা ইন্টারবেল দিয়ে দাও।

আত্মা। তা হয় না, এ তো থিয়েটার নয়। ওই নহুষ যেমন করে পারেন আসর জমান। আমরা চলো মাছভাজা খাইগে।

(নহুষ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

নহুষ। বড়োই তো বিপদে পড়লাম। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? মাছ ছাড়ি না আসর ছাড়ি? হায় বিধাতা এ তোমার কেমন বিচার হল? নহুষের জিহ্বা, দন্ত, পেট এখানে রইল উপোস করে, আর সেখানে নহুষের আত্মাপাখি রইল মাছ-ভাতে!

(গীত)

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা বাসরে নাহিকো দিয়া,
সাজিয়া-গুজিয়া রহিনু বসিয়া
পুথিখানা হাতে নিযা
খালি এ আসরে কে-বা গান ধরে,
কে-বা ধরে হারমোনিয়া।
রাজা আছে ভাই রানি কাছে নাই
সখী গেছে পলাইয়া॥

নহুষ। বলি মহিষী, ও সখীগণ।

(দুই ছোকরার প্রবেশ)

১ম। চাই সোডা লেমনেড?

২য়। পান বিড়ি সিগারেট?

নহুষ। বলি তোমরা কে, পরিচয় দাও।

১ম। আমি পূর্বকালে ছিলাম কালু ব্যাধ। এখন বিলাতি পানির দোকান খুলেছি।

২য়। আর আমি ছিলেম চোর চক্রবর্তী। এখন তামাকের দোকান খুলেছি।

নহুষ। দেখো ব্যাধ, ফাঁদ পেতে আমার আত্মারাম-পাখিকে যদি তুমি বেঁধে আনতে পার তো তোমায় কোতোয়ালির কাজ দিতে পারি।

১ম। রাজি। আমি গুর্জর দেশ জয় করেছিলেম। আমার দেবীও আমার ফাঁদে পড়েছিলেন। এ সহজ কাজ আর পারব না? —চললাম ধরতে আত্মারাম-পাখি।

নহুষ। আত্মারাম আমায় বড়ো ফাঁকি দিয়েছে। খাওয়াচ্ছি তারে মাছভাজা। দেখো চোর চক্রবর্তী, তোমায় আমি রাজমন্ত্রী করব। যদি আত্মারামের মুখের গ্রাস তপসি মাছভাজা দুই-কুড়ি এখানে উড়ায়ে আনতে পার।

২য়। এ আর শক্ত কাজ কী। এক শেঠির বাড়িতে সিঁদ দিতে দেয়াল-চাপা পড়েও সিঁদকাঠিটি ছাড়িনি।

১ম। যে অন্ধকার, এখানে ছুঁচ গলে না। তবু তোমায় চিনি চিনি করছি!

২য়। তোমার গলাটা যেন শোনা শোনা বোধ হচ্ছে!

১ম। আমার দিকে চেনা, তোমার দিকে শোনা!

২য়। চেনা-শোনা হয়ে গেল তো এখন?

১ম। তোমার সঙ্গে সন্ধি।

২য়। সন্ধি দিতে আমি চিরকালই মজবুত।

১ম। ফন্দিতে আমায় পেরে ওঠা শক্ত।

২য়। কিন্তু যমের ফাঁদ তো এড়াতে পারছ না দাদা!

১ম। তুমিই কি যমের ঘরে সন্ধি দিয়ে বসে আছ নাকি?

২য়। যমের বাড়িতে সিঁদ দিয়ে সোজা গিয়ে যখন উঠব স্বর্গের দুয়ারে,—তখন দেখবে!

১ম। দেখব, স্বর্গের দুয়ারেই চোর আমাদের আটকে আছেন!

২য়। এবং আস্তে আস্তে দেবলোকের দেউড়িতে সিঁদ কাটছেন।

১ম। তারপর?

২য়। সব কথা তোমার কাছে ফাঁস করব নাকি? এইখান থেকে আরম্ভ করলেম সিঁদ দিতে—

'ওরে, ওরে সিঁদকাটি তোরে বিশাই গড়িল
সিঁদ কেটে বিঁধ করো কামিনা কহিল।
ইট কাটো মাটি কাটো মেদিনী পাহাড়
অথর পথর কাটো কেটে ফেলো হাড়।
নাগ-নাগ মোহিনী-ফাঁস, নাগ দেশজুড়ে
আনাচে-কানাচে নাগ, নাগ ঝাড়েঝোড়ে।'

(১ম ও ২য়-এর প্রস্থান)

(গীত)

নীল আকাশের রঙিন পাখি
তোমারে-আমারে এই বাঁধনে, ধরে রাখি কেমনে
অচিন পাখি লুকিয়ে থাকো ফুলবনে

শুধু ডাকো মোরে ডাকো গোপনে,
ভাবি মনে কেমনে; নয়নে নয়নে ধরে রাখি ॥

নহুষ। আঃ! নিদ্রা আসছে। (নিদ্রামগ্ন)

(আত্মার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

আত্মা। নহুষ, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরে আমার বড়ো সাধের ধন—হায় হায়, আমার সাত রাজার ধন মানিক কোথা গেল রে! আ হা হা, উঃ কী জ্বালা জ্বালা। আমার হাতের সোনা ছিনিয়ে নিয়ে গেল! ও-হো-হো...।

নহুষ। কী হল? কী বিপদ উপস্থিত হল দেখো! আত্মারাম যে নির্জীব হন দেখি!

আত্মা। নহুষ কী হল! প্রাণ বাঁচে কীসে? হায় হায়, একেবারে শূন্য করে গেল!

নহুষ। সেকী? সংসার শূন্য হল, হ্যাঁ? ডাক্তার-বদ্যি কি কিছুই করতে পারলে না, হ্যাঁ?

আত্মা। বেড়ালে মাছ খেয়ে গেল—ডাক্তার-বদ্যি কী করবে? আ হা হা—!

নহুষ। রোদন কোরো না, স্থির হও। সব তাঁরই ইচ্ছা।

আত্মা। কাঁটাটি পর্যন্ত পড়ে নেই। বেড়াল হয়ে ওই মাছভাজা-ঠাকুরটাই পার করেছে সব কটা। ও নহুষ কী করি এখন?

নহুষ। তাই বলো, বিড়ালে মাছ গিলেছে। এ যে দেখি, মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে। যাকগা, অমন কত মাছ মিলবে। বসো এখানে।

(আরব্য উপন্যাসের মাহিগীরের প্রবেশ)

মাহি। চার মছলিঁও চার রং কী,—সফেদ, সুর্খ, জর্দ, ঔর সিহা।

নহুষ। ও আত্মারাম, এ মছলির কথা কয় বোধ হচ্ছে যে।

আত্মা। রও রও। শোনো হে, এসো তো এধারে বসো। তারপর?

মাহি। রায়সাহিবকি খিদমৎমে বন্দাগি আরজ্ করতা হুঁ।

নহুষ। হুঁ হুঁ, তারপর?

মাহি। সবেরে ম্যয় মহারাজ বাহাদুরকে গুলবাগমে গ্যয়া থা। বাগকো ই হাতে মে, কোয়ি তালায়ে হ্যঁয়। উনকে দরমিয়ান এক তালাওঁ ব্যয়ঠকখানেকে সামনে, জিস্‌মে ইত্‌নি মছলিয়া হ্যঁয়—কী কিয়া কহুঁ!

নহুষ। ইনি কী কইছেন?

আত্মা। আরে উদ্দু গো, বুঝলে না? ইনি তোমার বাগানে এক-পুকুর মাছ দেখে এসেছেন।

নহুষ। শুধাও তো ধরেছেন নাকি দু-চারটে?

মাহি। বাবুজি দেখিয়ে ম্যয়নে মছলিকা পেটসে কিয়া খুব চিজ পায়ি হো? দেখো, ইয়েঃ দেখো! ক্যায়সা খিলৌনা হ্যায়!

আত্মা। এ যে একটা সিসের আংটি!

নহুষ। দেখি দেখি, এ যে আসল সুলেমানি তক্তি!

আত্মা। এর কিছু গুণ আছে নাকি?

নহুষ। ওর সামনে এসব কথা কয়ো না। দুটো পয়সা দিয়ে বিদায় করো। তা হলে এ আংটিটার কিম্মত কত হবে বলো তো সাহেব?

মাহি। ক্যা, দো পয়সাকি চিজ, রাজা সাহিবকো নজর দেতা হুঁ?

নহুষ। হুঁ! তা দাও না হে আত্মারাম দুটো পয়সা ফেলে।

আত্মা। ট্যাঁক খালি—না না এই যে আছে দুটো, এই নাও সাহেব।

মাহি। বাবুজি ম্যায় কারপেট বুন সকতা হুঁ। তুমকো একঠো কাগজকা টোপি বনা দেয়োগে। ম্যয় গীত করনে ভি জানতা। কুছ কাম মিল যায় তো—

আত্মা। এও যে 'গেলাসগো'র দলের! একটু নাচ-গান করো তো শুনি। তবে তো কাম মিলবে।

মাহি। শুনিয়ে বাংলা থিয়েটারকা গীদ—

(গীত)

জাল ফেলেছি, ফেলেছি জাল
বারে বারে ফেলেছি জাল
তোমারে ধরব বলে।
নয়নজলে ফেলেছি জাল।
ধরা দিল না রে চপল চোখের চাহনি,
তাও ধরা দিল না দিল না রে॥

নহুষ। এই! এই! এ যে জলে ভেসে যায় সব!

আত্মা। একী! কলের জলের বাম্বা ফাটল নাকি?

নহুষ। আরে না, না। ভুল করে সোলেমানি তক্তি ঘসে ফেলেছি (স্বগত) চোরটা টিউবওয়েল খুঁড়ে ফেললে নাকি!

আত্মা। আংটির তা হলে গুণ আছে বলো?

নহুষ। অরগুণ না বরগুণ বুঝতে পারছি না। বেলা অতিক্রম করেন যদি সমুদ্র, তো গেলাম আমরা। জল যে ক্রমেই বাড়ে হে আত্মারাম! হায় হায়! আত্মারামের মুখের গ্রাস মাছভাজা হরণ করেই এই বিপদ ঘটালাম। ও আত্মারাম আমায় ক্ষমা করো। তোমায় বন্ধন করতে ব্যাধকে পাঠিয়েছি। মৎস্য চুরি করিয়েছি। অপরাধ স্বীকার করছি। শরণাগতকে রক্ষা করো এ যাত্রা।

আত্মা। কী বললে? এ কি সত্য না স্বপ্ন?

নহুষ। সত্যি, সত্যি, সত্যি।

আত্মা। আমি এই দিলাম উড়ান। বিশ্বাসঘাতক নহুষ, সুরের এই পর্বতের চূড়া থেকে দেখি আমি, কে তোমায় রক্ষা করে।

নহুষ। কী করি! হে মা ভাগীরথী, বাঁচাও। আমি রাজা নহুষ মা। সগরসন্তান নয়। বৃথা কেন আমায় উদ্ধার করতে দৌড়ে আসছ মা? ও যে কোটালের বান ডাকল এবারে বুঝি! ও আত্মারাম! ডুব-জলে পড়লাম!

আত্মা। বোঝাপড়ার সময় নেই,—ওই দেখো উত্তাল তরঙ্গ আসছে!

নহুষ। আমি সোনা দিয়ে তোমার ঠোঁট বাঁধাব। পক্ষ বাঁধাব গজমুক্তা দিয়া। চরণ বাঁধাব মাণিক্য দিয়া।

এবারে রক্ষা করো; এ যে অকূলে ফেললে আমায়! আমি না পারি উড়তে, না জানি সাঁতার, তোমার পায় ধরি আত্মারাম।

আত্মা। আরে টানাটানি করো কেন?

নহুষ। এ যে দেখি একটা বয়া। বিষম পিছল—ধরো ধরো।

আত্মা। ঝাঁপাঝাঁপি কোরো না। উঠে এসো, মাফ করলেম।

নহুষ। আঃ! এ যে লাটিমের মতো এ কাত-ও কাত করে! আর সকলে গেল কোথায়?

আত্মা। ওই দেখো, সব ভেসে আসছে। নাচ, গান, অ্যাকটার, অ্যাকট্রেস—মায় রিভার-পুলিশ!

নহুষ। চমৎকার দৃশ্য! হাঃ হাঃ—

(জলমগ্ন পুরো পার্টির প্রবেশ)

নহুষ। ওই দেখো আত্মারাম, মৃদং ভিজে বিগলিতপ্রায়। বেয়ালাটা ফুলে যেন হয়েছে ঢাকাই জালা একটা। হাঃ হাঃ, বলি ও র‍্যাং সাহেব ব্যান্ডমাস্টার! যন্তরগুলোকে ধরে বাজাও না একটা কুইক মার্চ ইংরাজি গৎ।

র‍্যাং। অল রাইট রাজাসাহেব।

(গৎ)

A : B : C : D : E : F : G

H : I : J : K : L : M : N : O : P

Q : R : S : T : U—V

W : X : Y : Z : A : B : C

আত্মা। বলি ও পুলিশ, তুমি একটা সুরটুর ধরে নাও এইবেলা।

পুলিশ। আমি সুর ধরি, চোর ধরি, ফাঁসিও করি।

২য় চোর। ও জমাদার আমি রাজমন্ত্রী, চোর নই।

১ম ব্যাধ। আমি শহর-কোটাল, কেউকেটা নই।

নহুষ। ওরা নির্দোষ ওদের ছাড়ো। বরং গোটাকতক মাছ ধরে দাও। তোমায় খুশি করে দিচ্ছি, এই নাও বখশিশ। নেচে-গেয়ে বাড়ি যাও।

পুলিশ। বহুত আচ্ছা রাজাসাহেব।

(গীত)

মন আমার হাকিম হতে পার এবার।

মন যদি হও হাকিম,—

আমি হই চাপরাশি,

চাপরাশি ব্রজবাসী।

নহুষ। ওই দেখো আত্মারাম, কেমন সকল 'সফরি ফরফরায়তে' আসছে এধারে!

(গীত)

অতল জলের তলে তলে

মানিক জ্বলে প্রদীপ ঝলে।

আমার মনের মানস যত
সেই আকাশে তলিয়ে চলে।
সুনীল জলের ফেনিল মালা
সাজিয়েছে যার বরণডালা
তার মিলনের বাসরপানে
পলে পলে মানস চলে॥

আত্মা। সাত সুরের সাত রঙের রামধনু দেখা দিল। আর ভয় নাই। আকাশ পরিষ্কার।

নহুষ। কী আনন্দ, কী আনন্দ, প্রলয়পয়োধিজলে চরা জেগেছে হে আত্মারাম!

আত্মা। কেমন শোভা হয়েছে দেখো, যেন বল্‌কা দুধে সর পড়েছে।

নহুষ। যেন দুগ্ধফেননিভ শয্যা পেতেছে আসরে। চলো নামা যাক। আহা এই সমুদ্র যদি লবণাম্বু না হয়ে ক্ষীরসমুদ্র হত,—আর চরখানা হত একটা আস্ত পুরু সর,—তবে মনের সাধ মিটিয়ে,—ক-জনে আমরা—বুঝেছ?

আত্মা। তা আর বুঝিনি। চলো, দেখি চরখানা ঘুরে, কোথাও একটা চায়ের দোকান পাই কি না। বড়ো কাহিল বোধ করছি। চলো এসো হে নহুষ।

নহুষ। দেখো আত্মারাম, আমারও কিছু ক্ষুধা লেগেছে। রামছাগলের শৃঙ্গের মতো যেন কী একটা প্যাঁচায়ে প্যাঁচায়ে উঠছে। মনের মধ্যেটায় যেন শূলবেদনা ধরেছে।

আত্মা। মন্তরপড়া চোর চক্রবর্তী সিঁদ দিচ্ছে হে তোমার মনে মাছভাজার সন্ধানে,—এইবেলা সাবধান হও। সরে পড়ো এখান থেকে।

নহুষ। কিন্তু কর্তা যে চটবেন, যাত্রাভঙ্গ করে গেলে অকালে।

আত্মা। অকাল কী? ওই দেখো সকাল হল। নানা পক্ষী, যারা এক বৃক্ষে ছিল তারা উড়ান দিল একে-একে,—কুঞ্জভাঙার গীত গেয়ে—

(গীত)

এক দুই তিন চার, চলে ঘরে যে যার'
পাঁচ ছয় সাত আট, মাঠে-ঘাটে ভাঙে হাট।
নয় দশ দশ নয়, পাঁচে পাঁচে দশ হয়
দুয়ে দুয়ে হয় চার, চলো সবে খালপার॥

॥ যবনিকা পতন॥

যাত্রাগানে রামায়ণ

উত্তরাকাণ্ড

মূল গায়েন। উত্তরাকাণ্ডের কথা শুন সর্বজন।
শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্মপরায়ণ।
চারিদিকে সুভিক্ষ রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ
কী অকালমরণ।

(রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

রাম। মন দিয়া ভরত শুনহ বচন
করহ রাজ্যের চর্চা লয়ে বহু ধন
অন্তঃপুরে রব আমি সহিত সীতার
যুদ্ধ করে অবসাদ হইয়াছে আমার।

ভরত। পিতৃসত্য পালিতে যবে গেলে বন
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি অযুদ্ধার প্রজা
এইবারে রাজ্যভার লউন লক্ষ্মণ।

রাম। মন দিয়া শুন লক্ষ্মণ বচন আমার
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার।

লক্ষ্মণ। চৌদ্দ বৎ-ব অনিদ্রায় কাটায়েছি বনে
বিশ্রাম চাই আমি এবে শয়নভবনে;
রাজ্যভার দাও প্রভু ভাই শত্রুহনে।

রাম। অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে।

শত্রুঘ্ন। সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাকো মনোরথে
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে।

রাম। তিন ভাই মিলি করো প্রজার পালন,
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মন।

ভরত। সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর,
ত্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ডর?

(মূল গায়েনের গীত)

তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ।

তুড়িজুড়ি। আরে! অন্তঃপুরে গেলেন রাম হরষিত মন,
সীতা করিলেন রামের চরণ-বন্দন।

রাম। রামপ্রিয়া শুন সীতা আমার বচন
লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোকবন—
তাহার অধিক পুরী রচিব অযোধ্যায়
তোমাতে-আমাতে রহিব দু-জনায়।

তুড়িজুড়ি। রঘুনাথের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্মে আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলে বিশ্বকর্মে করো অবধান
রামের অশোকবন করহ নির্মাণ।

দোহার। আরে! ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্মা হরষিত
অয্যোধ্যা-নগরে আসি হইল উপনীত।
বসি আছে রঘুনাথ হরষিত মন
হেনকালে বিশ্বকর্মা বন্দিল চরণ।

(বিশ্বকর্মার প্রবেশ)

বিশ্বকর্মা। ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান
স্বর্ণের অশোকবন করিতে নির্মাণ।

রাম। ভালো, ভালো! বিশ্বকর্মা, লহো হে আরতি—
নির্মাতে অশোকবন ধরো হে যুকতি।

(তুড়িজুড়ির গীত)

স্বর্ণের অশোকবন করো হে করো রচন
দেখিতে সুন্দর করো সর্ব ফুলবন।
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল-ফুল ধরে
ময়ুর-ময়ুরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে।
সুললিত পক্ষনাদ শুনিতে মধুর
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর।

দোহার। বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে
রাজহংস তথা আসি যেন কেলি করে।

সরোবরের চারিপাশে সুবর্ণের গাছ
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণের মাছ।
মণিমাণিক্যে বান্ধ যত গাছের গুঁড়ি
স্থানেস্থানে বসিবার স্বর্ণময় পিঁড়ি।
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে
এমন উদ্যান রচ পুরীর ভিতরে।

মূল গায়েন। আরে! বিশ্বকর্মা নির্মাইল স্বর্ণাশোকবন
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন।
অশোকবন দেখে রাম হইলেন সুখী
প্রবেশ করেন তথা লইয়া জানকী।

তুড়িজুড়ি। আরে! শত শত বিদ্যাধরী,
সীতার তারা সহচরী
শত শত দাসী, সুন্দরী রূপসী
নানা মতে সেবা করে রঘুনাথে তুষি।

(সহচরীদের নৃত্য-গীত)

চন্দ্রানন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী
দেখিয়া দোঁহার রূপ জুড়াইল আঁখি।
প্রথম যৌবনা সীতা লক্ষ্মী অবতরী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দরী —
কাঁচা সোনা সমরূপ আলো করে সীতা
এত রূপ দিয়া ধাতা সৃজিলেন সীতা।
পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা।

(সকলের গীত)

আনন্দে আছেন রাম সীতাদেবী সঙ্গে
ষড়ঋতু বঞ্চেন রাম নানা রসরঙ্গে
নিদাঘকালেতে চৈত্র বৈশাখ সে মাসে
পুষ্পকুঞ্জে রহেন রাম সরসীর পাশে।

তুড়িজুড়ি। আরে! বিকশিত পুষ্প শোভে চারু সরোবরে
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে।
রৌদ্রে পৃথিবীজুড়ে রহিল প্রবল

সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল।
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী
জলজন্তু কলরব চাতক চাতকী
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে
অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে।

দোহার। আরে! সীতার সঙ্গেতে রাম বঞ্চিয়া উল্লাস
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ।
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্মল চন্দ্রমা হেরি কুমুদ ফুটিল।

(সহচরীদের নৃত্যগীত)

ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন
ছাড়িয়া বরিষা ডাক শরৎ গর্জন।
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীর
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিল রঘুবীর।
কার্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিষে সঘনে
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে।
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর
নারিকেল সমুদয় ফলে বহুতর।
পরম হরিষ রাম সুখের বিশেষ
এইরূপে রামসীতার হেমন্ত হইল শেষ।
শিশির উদয়ে প্রবল হইল শীত,
শীতকাল পেয়ে রাম পাইলেন প্রীত।

তুড়িজুড়ি আরে! দিনে দিনে ক্ষীণ নির্মল শশধর
রজনী প্রভাত হইল অতি ভয়ংকর।
দেখি কোটি সূর্যতেজ ধরেন রঘুবীর
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির।

দোহার। উদয় বসন্ত ঋতু সর্বঋতুসার
কৌতুকসাগরে রাম করেন বিহার।

(সহচরীদের গীত)

ফুটিল অশোক ও মাধবী নাগেশ্বর
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর।

ঋতুরাজ আইল দেখি সবার উল্লাস।
রাম বলেন, সীতা, কী তব অভিলাষ?

রাম। কোন দ্রব্য পাইলে সীতা হও তুমি সুখী
প্রকাশিয়া বলো তাহা মোরে চন্দ্রমুখী।

সীতা। এক অভিলাষ মোর জাগিতেছে মনে
একদিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবনে।
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে।
মুনিপত্নীগণ সঙ্গে স্নান করি নীরে
হংস খেদাড়িয়া মোরা উঠিতাম তীরে।
বসি মুনি ঋষি তথা করে পিণ্ডদান,
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড মোরা খাইতাম।
সত্য করিয়াছিলাম মুনিপত্নী সনে
দেশে গেলে পুনরায় আসিব তপোবনে।
এই সত্য পালিবারে মাগি যে মেলানি
দেখি গিয়া পুনরায় তপোবনখানি।

রাম। তোমার কথায় মোর বিস্ময় লাগে মনে
কালই দিব মেলানি যাইতে তপোবনে।

[সকলের প্রস্থান]

মূল গায়েন। আরে! সীতারে আশ্বাস দিয়া রাম রঘুবর
বিশ্রামান্তে চলিলেন সভার ভিতর।

(জুড়িজুড়ির গীত)

প্রাতঃকালে আইলেন পাত্রমিত্রগণ
আইলেন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।
বাহির দেয়ালে রাম আসিছেন শুনি
কানাকানি করে সবে মনে ভয় গুনি।
সহস্রবৃন্দের বাহির আইল যখন
পাত্রমিত্র কানাকানি করিছে তখন।

(বুড়ো-বুড়িদের প্রবেশ)

১ম। রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস
২য়। হেন সীতা লইয়া রাম করেন বিলাস।

৩য়। সভামধ্যে সীতানিন্দা না করো আপুনি

৪র্থ। কী জানি কী করে বসেন রঘুনাথ শুনি।

(দ্বারবানের প্রবেশ ও গীত)

আরে! ক্যাবাত করতা বুড্ডাবুড্ডি
নিকালো হিঁয়াসে, তোড়েঙ্গে হাড্‌ডি।
বকবক না করো চাকরবাকর
বাতচিত বন্ধ করো ঝুটমুট রদ্দি।
কাঁহা রে চৌবে গোল কাঁহে করতা
রাজাকে নিন্দা ধরমনাশ করতা
ছোড় দেও ছোড় দেও শুনো মেরা বাত
বদনামি কামসে বহু তফাত।
যো হোগা সো হোগা, যানে দেও দ্বারবান
রাম রাম বদনাম ছোড়ো জি।

প্রতিবেশী। শুন কই দ্বারবান, যেখানে নাম সেখানে বদনাম,
প্রমাণ তার ভুতো বোম্বাই আম।
খাইতে মিষ্টি নামেতে অনাছিষ্টি
নামের পাছে আছেই বদনাম
বলে গেছেন স্বয়ং হনুমান।

(চোপদারের প্রবেশ)

চোপদাব। চুপ দ্যেন চুপ দ্যেন রামচন্দ্র এসতেছেন
পদশব্দ হতেছেন শ্রবণগোচর।
সঙ্গে এসতেছেন মন্ত্রীবর সুমন্ত্র গুণধর
মহারাজ হইয়েছেন চলচ্চিত্ত,
তাইতে পাত্রমিত্র হিতাহিত ভাবতেছেন।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। মহারাজ! বুঝিতে না পারি যে কারণ
আচম্বিতে কেন আজি করেন রোদন?
নিশ্বাস বহয়ে উষ্ণ দীর্ঘ ঘনে ঘন
তব পানে চাহি আজি ব্যাকুল জীবন।

রাম। আমি রাজা হইতে কে আছে কেমন
রাজ-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ।

সুমন্ত্র। রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান
সর্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
কহি প্রভু রঘুনাথ করো অবধান
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাই অসম্মান।

সুভদ্র। আমি ভদ্র মহাপাত্র দ্বিতীয় সভাতে
প্রভুবর সম্মুখে কথা কহি জোড়হাতে।
ধর্মে রাজ্য কৈল বড়ো দশরথ বাপ
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ।
দশরথ রাজার রাজত্ব যেইকালে
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে।
এখন যেতেছে পাত্র দিনের অন্তর
নির্ধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর।

রাম। রাজা হয়ে করিলাম কোন অবিচার
যাহাতে নির্ধন হল প্রজার সংসার?

সুভদ্র। রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে নানা সুখে,
রাজা পাপ করিলে প্রজারা থাকে দুখে।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে না পারি —

দুর্মুখ। অভয় দেন তো সত্য কথা কহিবারে পারি।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কহে ত্রাসে
কহিব একাতে কথা চলুন একপাশে।

রাম। পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত
নগরের সমাচার শুনাও কিঞ্চিৎ।

সুভদ্র। মম এক নিবেদন শুন প্রভু রাম
দুর্মুখের কথায় কভু নাহি দেহ কান।

(তুড়িজুড়ির গীত)

পাগলে কী না বলে, রামছাগলে কী না খায়
রামঃ, কান দিতে নাই লোকের কথায়।

দোহার। শহরে বাজারে লোক কয় কত কথা
শুনতে গেলে কাজ চলে না তাহা যথা তথা।

দুর্মুখ। অভয় দেন রঘুনাথ দুটা কথা কই
অন্য কথা নাই শহরে সীতার কথা বই।
দেবাসুরের যুদ্ধমতো হইল বটে রণ —

সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।
যিনি ছিলেন দশমাস রাক্ষসের বাসে
তিনিই গৃহিণী হইলেন তব গৃহবাসে।
দোষ না বুঝিয়া সীতায় করিলে গ্রহণ
এই অপযশ তব ঘোষে সর্বজন।

তুড়িজুড়ি। কেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত করিলি দুর্মুখ
রামের মনে দুঃখ দিয়ে কী পাইলি সুখ?
সীতানিন্দা রঘুনাথের শুনাইলি কানে,
অন্তঃপুরে আছেন সীতা একথা না জানে।
অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি কোন প্রাণে?

রাম। আমার নিকট আছ যত পাত্রগণ
বলো কি না যথার্থ দুর্মুখ-বচন।

সুমন্ত্র। দুর্মখ কহিল নিষ্ঠুর সঠিক বচন।

ভরত। সভাভঙ্গ করো এবে ভাই রে লক্ষ্মণ।

[প্রস্থান]

দোহার। সভাভঙ্গ করো এবে ভাই রে লক্ষ্মণ —
শুনিলাম একী কথা বড়ো অলক্ষণ।
অকীর্তি করিল বড়ো বিশ্ব-নিন্দুকজন —
দুর্মুখ মুখপোড়ার নাইকো মরণ।
রাজার অপযশ গায় প্রজার সম্মুখে
ঝাঁটা মারো ঝাঁটা মারো দুর্মুখের মুখে।

(গীত)

কীসের এত রোষ? দুর্মুখ কী করেছে দোষ?
যা কও তোমরা হাটে বাজারে বসে মনের খোশে,
সেকথাটা পেটে না রেখে
প্রকাশ করেছে দুর্মুখ সভায় ও সে।
করেছে কী দোষ নন্দ ঘোষ?
মুখে রাশ দাওগা আপনার কসে।

[সকলের প্রস্থান]

(তুড়িজুড়ির গীত)

অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে বয় পানি
পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।

দোহার। আরে! নিদাঘ সময় অতি রবি ঘোরতর
সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর।
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত
সরসীর কূলে গিয়া হন উপনীত।
পর্বত জিনিয়া সেই সরসীর পাড়
রজকের পাট ছিল একধারে তার।
উত্তরঘাটে রাম বসেন হাত দিয়া গালে,
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন হেনকালে।

(দুই রজকের প্রবেশ)

শ্বশুর। সর্বগুণধর তুমি ধোপাতে কুলীন।
জামাতা। আপুনি শ্বশুর মোর কুলেতে কুলীন।
শ্বশুর। নিজ গোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা
ধনী-মানী দেখে তোকে দিলাম দুহিতা।
কোন দোষ করে কন্যা? মার কোন ছলে?
আমার বাটীতে আসে একা রাত্রিকালে।
পিতৃগৃহে যুবতী কন্যা বড়ো ভয় পাই
একেশ্বরী রহিলে কন্যা শোভা নাহি হয়।
জামাতা। যে বাক্য শুধালে তুমি কহিতে না পারি
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারি।
রামা ধোপা হই আমি নই রামচন্দ্র
জ্ঞাতিবন্ধু খোঁটা দিবে পাইলে কথার গন্ধ।
রাবণ হরিলে সীতা ফিরে আনে ঘরে
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে;
বউটারে ঘরে নিতে কয়ো না আমারে।

(দুই রজকের গীত)

আরে! কুন্ডামুন্ডা পুখরি ধোবির বেটি কাপড় কাচে
ধোবির বেটি ডুবি মরি গেলা —
আনো রে জামাতা বেটা সরু সূতার জাল রে
বহুটারে ছাঁকি উঠাইলে বা।
জামাতা। যাক, লেঠা চুকে গেল, বউ ডুবে মলো!
শ্বশুর। জামাইবাবাজি ছাদ্দ খেয়ে

ছোটো শালিডারে
ঘরে নিয়ে তোলো।

জামাতা। শততঙ্ক চাই কুলীনবিদায় —

শ্বশুর। উদ্ধার করো বাবাজি, কন্যাদায়!

জামাতা। স্বর্ণালংকার গা-ভরা গড়তে দাওগা স্যাঁকরায়।

[প্রস্থান]

মূল গায়েন। রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন
গৃহে ফিরিলেন রাম বিরস বদন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

মনোদুঃখে রামের নয়নে অশ্রু ঝরে
দুঃখ ঘটায় বিধাতা সুখের সায়রে।
সীতানিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে,
সীতাদেবী না জানেন আছেন অন্দরে।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসিয়াছে ঘরে
সখীগণ করে যতন গল্পগাছা করে।
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুনি
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী।

(সখীগণ ও সীতার প্রবেশ)

সখী। একটি কথা।

সীতা। কী কথা?

সখী। রাবণের ছিল কয়টি মাথা?

সীতা। দশটা মাথা।

সখী। কয়টা হাত?

সীতা। এক কুড়ি হাত।

সখী। পা কয় জুড়ি?

সীতা। পা এক জুড়ি, তায় গাধার খুরি।

সখী। তার হাঁকডাক ছিল কেমন?

সীতা। বোকা ছাগল যেমন!

সখী। এখন? লিখে দেখাও দেখি রাবণ কেমন!

উর্মিলা। তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে ভোগালে দুর্গতি—

মাণ্ডবী। ভূমিতে লিখহ তারে, মুণ্ডে মারি লাথি।

সীতা। সে ছার রাবণে দেখি নাই কোনো ছলে,
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি একবার সাগরজলে
যবে সে ধরে নিল বলে।

(সখীদের গীত)

জলেতে যার দেখলে ছায়া লিখে দেখাও রামজায়া
দেখি মায়াবী সে কেমন রাবণ।
সেজে সন্ন্যাসী দণ্ডক অরণ্যে আসি
করে গেল সর্বনাশী ভাণ্ডায়ে রাম-লক্ষ্মণ।
লেখো কেমন সে সোনার হরিণ
দেখাও তা, দেখিনি কোনোদিন।

সীতা। ছায়া তো দেখেছি জলে,
চলো এবে শয়নঘরে —
ভূমিতলে লিখে দেখাব
রাবণের কায়া

[প্রস্থান]

(তুড়িজুড়ির গীত)

আরে! রাবণ লিখিতে সীতার মনে হইল সাধ
বিধির নির্বন্ধ হেতু পড়িল প্রমাদ।
হস্তে খড়ি ধরেন সীতা দৈবের নির্বন্ধ
কম্পিত হস্তে লিখেন সীতা কুড়ি হস্ত দশ স্কন্ধ।

দোহার। পঞ্চমাস গ ´ বতী আলস্য সর্বক্ষণ
চিত্র লিখি ভূমে সীতা করিল শয়ন।
হা রে, নেতের অঞ্চল পাতি নিদ্রা যান সীতা।
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটাল বিধাতা।
অন্তঃপুরে আইলেন রাম আজি অন্যমন
সীতার পাশে দেখিলেন লিখন রাবণ।

তুড়িজুড়ি। দেখেন চিত্রিত রাবণের কোলে
শায়িত স্বর্ণসীতা,
হল রাক্ষসের হাতে পুনঃ যেন অপহৃতা।

দোহার। হা রে! সীতারে দেখিয়া রাম চলেন বাহির
মনোদুঃখে বহে চক্ষে তপ্ত অশ্রুনীর।

(রাম-লক্ষ্মণের গীত)

রাম। সীতার পাশে দেখে এলাম লিখন রাবণ
সত্য অপযশ মোরে করে সর্বজন।
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ?
সীতাত্যাগী হব আমি, সংসারে নাই সাধ।
সত্য হেতু মম পিতা আমা পুত্র বর্জে,
সত্য কার্য করি যদি লোকে নাহি গর্জে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আহা, পড়িয়া রামের হস্তে জন্ম গেল দুঃখে,
তবু উচ্চবাচ্য না করেন সীতা মুখে।
কী কহিব সীতার গুণ, ওহে রঘুমণি!
চিতা হইতে ব্রহ্মা তারে উঠাল আপনি।
অগ্নিপরীক্ষায় সীতা হইলেন পার,
তবু নিন্দুকের হাতে নাহিক নিস্তার।

দোহার। হায় হায়, শুনি নাই কোথাও হেন ব্যবহার!
পাঁচ ভূতে আসি কিলায় থাকিতে সুখে,
সুজনের দায়, দুর্জনে নিন্দা রটায় শত মুখে।

লক্ষ্মণ। দেশে আনিলেন সীতা করিয়া আশ্বাস—

রাম। সহিতে না পারি ভাই লোকের উপহাস।
যুক্তি করিয়াছি আমি সীতা পরিত্যাগে

লক্ষ্মণ। হেন কর্ম করা তোমারে নাহি লাগে।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি আর না করো উত্তর
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর।
অপযশ কত সব নারীর কারণ
অকীর্তি হইলে বর্জি ভাই তিন জন।
আমার বচন শুন, ভাই রে লক্ষ্মণ!
সীতা লয়ে রাখো ভাই মুনির তপোবন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

শীঘ্র যাহ রে—আমার করো হিত,
রথে চড়ি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত।
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সুজন
আর কোনোজন যেন না করে গমন।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ : দোহারের গীত)

এ কেমন নিষ্ঠুর বচন বলেন রঘুনাথ
অকস্মাৎ শিরে কেন করেন বজ্রাঘাত?
কী দোষেতে সীতারে করিলে বনবাস
অকারণে বিসর্জন, একী সর্বনাশ!
হা রে! কেমনে বঞ্চিবে বনে হয় রাজরানি,
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনি?
বিনা দোষে সীতারে দিয়ো না মনস্তাপ
রঘুবংশ ধ্বংস হবে সীতা দিলে শাপ।
দেশের বাহির না করিহ সতী স্ত্রী
সীতা ছাড়া হইবে রাজলক্ষ্মী হতশ্রী।

রাম। বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে।
কালই সীতা বলিলেন আমারে আপনি
নানা রত্নে তুষিবে সে মুনির রমণী।
এইকথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ —
রামের আজ্ঞায় দেবী চলো তপোবন।
একথা কহিলে তার পড়িবেক মনে
সীতা যাবে আপনি বাল্মীকি তপোবনে।

লক্ষ্মণ। যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জন
ভিন্ন গৃহে রাখো সীতা এই নিবেদন।

রাম। বৃথা লক্ষ্মণ ভাই না করো বিবাদ,
সীতা গৃহে থাকিলে না যাবে অপবাদ।
দিলাম আমার দিব্য তাহ পরিহার,
সীতার লাগিয়া কেন কহ বারবার?

সকলের প্রস্থান]

মূল গায়েন। শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণের লাগে ভয়
সুমন্ত্রেরে নিয়া তবে কথাবার্তা কয়।
রথ সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে
প্রবেশনে লক্ষ্মণ সীতার আগারে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

শ্রীরামের বচন শুনিতে

লক্ষ্মণ নয়নজলে তিতে
ভাবেন মনে একা মহাবনে
কেমনে বর্জন করিবেন সীতে।
অধোমুখে কান্দে লক্ষ্মণ চক্ষে বহে পানি,
উত্তর না করেন লক্ষ্মণ রামবাক্য মানি।

দোহার। সীতার মন্দিরে যান
এক পা আগান দুই পা পিছান।
নয়নজলে ভেসে যান
উদাস দৃষ্টি ফিরে-ফিরে চান।
সুখ না পান চিতে
লক্ষ্মণ দেখেন অলক্ষণ চারি-ভিতে
পথেতে চলিতে।

(সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

সীতা। আইস আইস দেবর আজি বড়ো শুভদিন,
এবে যে দেবর হয়েছে পর, নাহিক সেদিন!
চৌদ্দ বর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে,
রাজ্য স্ত্রী পাইয়া আর সেদিন নাই মনে!
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়
তে কারণে হইয়াছ দেবর নির্দয়।
বৈসহ এ স্থানে লক্ষ্মণ এই ভূমিতলে, (চিত্রমার্জন)
বার্তা কহ হে দেবর, আছ তো কুশলে?
তোমারে না দেখি মম সদা পোড়ে মন,
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন?

লক্ষ্মণ। রাজার মহিষী তুমি থাকো অন্তঃপুরে
সেবক যে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারে।

সীতা। ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন,
অকস্মাৎ এলে কী বা আজ্ঞা করিয়া বহন?

লক্ষ্মণ। করি নিবেদন মাতা করো অবধান
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান।
কালূই তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী স্থানে।
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ,

মম সঙ্গে চলো বাল্মীকি তপোবন।

তুড়িজুড়ি। তমসার অপর তীরে বাল্মীকির তপোবন
আনন্দে বিচরে সেথা শান্ত মৃগ পক্ষীগণ।
সন্ধ্যার বাতাস বয় ছায়া বনে সুশীতল
কলস্বনে বয় সেথা তমসার পুণ্যজল।
নিত্য হোমগন্ধ বয় সে স্থানে পবন
আনন্দে বসেন সেথা যত মুনিপত্নীগণ।

লক্ষ্মণ। মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে
রথে চলো উঠি গিয়া সুমন্ত্র সহিতে।

সীতা। দেবর, তোমার বাক্যে বাড়িল উল্লাস,
স্বরূপ কহিছ তুমি কিংবা পরিহাস?

লক্ষ্মণ। পরিহাস করিতে তোমারে কে-বা পারে?
কহিলাম যাহা রাম বলিলেন আমারে।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ : সখীদের গীত)

আজ্ঞা দিলেন রামধন
ঠাকুরানি চলো তপোবন
মণি রত্ন লহ ধন যেবা লয় চিতে।
সখীগণ মোরা তোমার সহিতে
বন ভ্রমিতে করিয়াছি মন।
চলো লয়ে সবে নানা রত্নধন
বস্ত্র অলংকার গন্ধ চন্দন।
সুমন্ত্র করিয়া রথের সাজন
অপেক্ষা করিছে দ্বারে বহুক্ষণ।

লক্ষ্মণ। রামের এরূপ আজ্ঞা শুন সখীজন
একাকিনী সীতাদেবী যাবেন তপোবন।
রামের আছয়ে আজ্ঞা যেতে গুপ্তবেশে
বাল-বৃদ্ধ-যুবা কেহ না জানিবে দেশে।

সখীগণ। এ কেমন কথা, একা যাবেন সীতা,
আমরা হেথা রইব ঘরে,
শুনে যে প্রাণ কেমন করে!
মনে হয় সেই আর এক বনবাস
কোথা রাম হবেন রাজা

না হয়ে হল সর্বনাশা!
শুনহ ঠাকুর লক্ষ্মণ, অনুমতি করো মোদেরও
সাতে সাতে যাবার তরে তথা।

সীতা। মায়া সম্বরিয়া সবে থাকো নিজ ঘরে
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান, নেপথ্যে রথের ঘর্ঘর]

(সখীদের গীত)

রহিলাম ঘরে মোরা তোমার আসার আশে,
তোমা বিনা মন কিনা লাগে কর্মে কাজে।
সীতার সুখেতে মোরা সুখী সখীজন
সীতা বিনা অন্ধকার দেখি এ ভবন।
মনে হয় কেন যেন যায় ছাড়ি রাজলক্ষ্মী,
গৃহের চূড়া দুঃখে ঝিমায় বেজোড় কপোত পক্ষী!
দিবা দুই প্রহরে যেন দেখি অন্ধকার
কী জানি কী অদৃষ্টে আছয়ে আবার।
হের দেখো রথ গেল যমুনার পার
পথের ধুলায় কিছু না ভায় নয়নেতে আর।

মূল গায়েন। ভরত শত্রুঘ্ন রহেন রামের নিকট
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট।
এ কূলে রহিল রথ ও কূলে তপোবন
পার হইয়া সীতাদেবী করেন গমন।
বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়
পথ চলিতে সীতাদেবী পায়ে ব্যথা পায়,
লক্ষ্মণ বসাল নিয়ে বৃক্ষের ছায়ায়।

(সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

সীতা। শাশুড়িরে না কহিলাম আসিবার কালে
না জানি কী মনোদুঃখ ঘটিবে কপালে।
নানা অলক্ষণ লক্ষণ দেখিলাম পথে
ভালো করি নাই আসি রামের নিকট হতে।
না যাব, অযোধ্যায় ফিরে চলো ওই রথে।
অধোমুখে কান্দ লক্ষ্মণ চক্ষে বহে পানি —

উত্তর না করো কেন মোর বাক্য শুনি?
নিরুত্তর আছ কেন বিরস বদন?
দেশে ফিরে যাব রথ আনহ লক্ষ্মণ।
আপুনি বিদায় লব শাশুড়ি চরণে
রামচন্দ্রে সাথে লয়ে যাব তপোবনে।

লক্ষ্মণ। কী বলিব মা জানকী, হয়ো না হতাশ —
শ্রীরামের আজ্ঞায় তোমার বনবাস।

সীতা। এতদূরে আসি তবে বলিলে, লক্ষ্মণ —
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন?

লক্ষ্মণ। ধর্মেতে ধার্মিক রাম সংসারে প্রশংসা,
তাঁহার আজ্ঞার পর কী আর জিজ্ঞাসা।

সীতা। নাহি দিবেন দেশে আনি থাকিবার স্থান
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান?
দেশে থাকিলে এইকথা করিতাম জিজ্ঞাসা,
যমুনায় ত্যজিব প্রাণ, আর কী বা আশা!

(বাল্মীকি ও মুনিপত্নীর প্রবেশ)

বাল্মীকি। যমুনায় না ত্যজ প্রাণ আমার সম্মুখে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ বনে রহ সুখে।

সীতা। আমা হইতে প্রভু লজ্জা পাইলেন সভায়,
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলেন আমায়।

মুনিপত্নী। রাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে
স্বামীর চরণে স্থির করহ অন্তরে।

বাল্মীকি। জনকের কন্যা তুমি, রামের গৃহিণী,
দশরথের বহুয়ারি মেদিনী-নন্দিনী,
লোক অপবাদে রাম পাইয়া তরাস
বিনা অপরাধে তোমায় দিল বনবাস।

লক্ষ্মণ। ত্রিভুবনে সাধ্য নাই সীতার সমান
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ।
সীতারে ঘরেতে লও যতনে ব্রাহ্মণী
সীতারে জানিবে সবে সতী শিরোমণি।

(মুনিকন্যাদের গীত)

শুভদিনে লক্ষ্মী আজি আইল মোদের ঘরে

তোমা দরশনে সুখ পাইনু অন্তরে।
কী করিবে কর্মদোষে তোমার বর্জন
তোমার আগমনে আলো হল তপোবন।
রামের লাগিয়া তুমি না করো ক্রন্দন
অযোধ্যায় পুন ফিরে করিবে গমন।
চলো এবে তপোবনে মুনিদের ঘরে —

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ বিদায় মাগে, মাগো জোড়করে।

[সকলের প্রস্থান]

মূল গায়েন। রামের আজ্ঞায় সীতায় রাখি তপোবনে
কান্দিয়া লক্ষ্মণ ফিরে অযোধ্যা-ভবনে;
বিধির নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

পূর্বাপর কাহিনী করহ স্মরণ
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম গেলেন বন।
শূন্যঘর পেয়ে সীতা রাবণ হরিল
বান্ধিয়া সাগর রাম লঙ্কায় হানা দিল।
রাবণ বধিয়া সীতার হইল উদ্ধার
রাম রাজা হইলেন সত্যে হয়ে পার।
এগারো হাজার বর্ষ প্রজার পালন
সাত হাজার বর্ষমধ্যে সীতার বর্জন।

দোহার। আরে! তপোবনে সীতারে করিয়া বর্জন
অযোধ্যায় রাম অগ্রে গেলেন লক্ষ্মণ।
কান্দিতে কান্দিতে বীর রামে নোয়ায় মাথা
রামচন্দ্র লক্ষ্মণে শুধান সীতার কথা।

(রামের গীত)

কোথা থুয়ে আইলে জনকসুতারে, লক্ষ্মণ?
চঞ্চল হইল যেন আমার পাপিষ্ঠ মন।
বর্জিলাম সীতায় কেন লোকের কথায়
রামপ্রিয়া বিনা এবে রামের প্রাণ যায়।
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার
সীতার বিহনে মম সব অন্ধকার।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আহা, কোন বনে রহিলেন সীতা সে রূপসী,
কী বলিবেন শুনিলে জনক রাজঋষি?
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতা পাইলে তরাস
কার মুখ দেখে আর পাইবে আশ্বাস?
কহ কহ ভাই লক্ষ্মণ, সমাচার কী?
কোন বনে রেখে এলে রামের জানকী?

লক্ষ্মণ। লোকের কথায় তাঁরে করিলে বর্জন
আপনি বনে দিয়া কেন করহ্ ক্রন্দন?
ক্রন্দন সম্বর প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে,
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে।

(দোহারের গীত)

দিয়ে কাননে বিদায় রাম-প্রমদায়
শূন্য বনে আগত লক্ষ্মণ অযোধ্যায়।
ওহে দনুজ নিবারি অনুজ তোমারই
সীতারে করে এল বনচারী
বিনা শাপে হায় হায়—

(রামের গীত)

ওরে ভাই, কী দিয়ে নিভাই সীতার বিরহানল
কী করিলাম হায় নিশি না পোহায়
অনিবার চক্ষে বহে জল।
নাই সংসার স্বীকার বিশ্ব অন্ধকার
দুঃখ অন্ধকূপ—
আলো দশ-যোজন করিত এমন
ছিল জানকীর রূপ।
সীতা বিনা অন্ধকার সকলই নিরখি
দুর্বল হইলে লোকে ছাড়ে রাজলক্ষ্মী;
সীতার বর্জন বিসর্জন হল মঙ্গল সকল।

লক্ষ্মণ। যদি রঘুনাথ করো অনুমতি দান
রাত্রির মধ্যেতে সীতা আনি তব স্থান।

রাম। লোকলজ্জায় সীতায় থুয়েছি বাহিরে—

লক্ষ্মণ। বড়ো লজ্জা হবে পুন ঘরেতে আনিলে!
রাম। সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে
লক্ষ্মণ। কেমনে সীতার শোক পাসরিবে চিতে?

(রামের গীত)

আমার বচন শুনহ লক্ষ্মণ
রাত্রেতে সোনার সীতা করহ গঠন।
জানকী আনিলে নিন্দা করিবেক লোক
স্বর্ণসীতা দেখিয়া পাসরিব শোক।

(তুড়িজুড়ির গীত)

সীতা সীতা বলিয়া ক্রন্দন করেন রাম
সোনার সীতা হল উদিতা বিশ্বকর্মার নির্মাণ।
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে
সবে মাত্র ভিন্ন এই বাক্য নাহি সরে।

(দোহারের গীত)

সোনার সীতার গায় বস্ত্র আভরণ
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর
সীতা নয় রঘুনাথে কে দিবে উত্তর?
উত্তর না পেয়ে রাম ভাবে বড়ো দুখ
একদৃষ্টে চাহেন সোনার সীতার মুখ।
সোনার সীতা দেখিয়া বঞ্চিল সাত রাতি
সাত হাজার বৎসর যেন দুঃখে গেল কাটি।
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইল বাহির
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর।

(তুড়িজুড়ির গীত)

হা রে শূন্য মনে সিংহাসনে বসেন রামধন
সম্মুখে সোনার সীতা রাখেন সর্বক্ষণ।
পাত্রমিত্র-বন্ধুগণ বুঝায় সকলে,
বিবাহ করহ রাম, মাতৃগণ বলে।

যার যত কন্যা আছে স্থানে স্থান
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান —
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে
অন্য কন্যা মনোনীতা হইবে কেমনে!
কন্যাগণ মনে যুক্তি করে নিরন্তর
মোরে বিভা করিবেন রাম রঘুবর।

রামাশ্বমেধ বা লবকুশি পালা

মূল গায়েন। অখিল ভুবনে হয় জয়রাম ধ্বনি
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি।
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে
স্বর্ণসীতা বিভা হল যে শাস্ত্রের বিধানে।
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি
নৃত্যগীত মঙ্গল করে যতেক রমণী।

(তুড়িজুড়িব গীত)

আরে! বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি
কারও যজ্ঞ না হইল এমন পরিপাটি।
তুরঙ্গ নগর হইতে আইল তুরঙ্গ
শত শত তুরঙ্গী আইল তার সঙ্গ।
হেমঙ্গ তৈলঙ্গ আর কলিঙ্গ গান্ধার
নানা জাতি আইল তুরঙ্গ সারে সার।
তুরঙ্গ সওয়ার আইল সঙ্গে কত ঠাট
অযোধ্যায় বসে গেল চতুরঙ্গ হাট।

(দোহারের গীত)

স্বর্ণপুচ্ছ যজ্ঞ-অশ্ব কর্ণ পরিপাটি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।
গলে লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা,
রাঙা জিহ্বা মেলে যেন আগুনের পারা।
যজ্ঞক্ষেত্রে রাম অশ্ব করিল মোচন
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে লিখন।

(ঘোড়ার নৃত্যঃ তুড়িজুড়ির গীত)

রাম ছাড়িলেন ঘোড়া, যায় দেশে দেশে—
বাতাসে উড়িল ঘোড়া চক্ষের নিমেষে।
পূর্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদুর পথ
নদনদী এড়াইল উঠিল পর্বত।
লঙ্ঘিয়া উত্তরে ঘোড়া বিরূপাক্ষ গিরি
ঘোড়া গড় হইয়া যায় পশ্চিম মুখে ফিরি।
তড়বড় যায় ঘোড়া পশ্চিমের দেশে
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে।
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এই ক্ষণে
দৈবে যজ্ঞ-অশ্ব যায় দক্ষিণের বনে।

(দোহারের গীত)

আরে! সেই বনে লব-কুশ জানকীনন্দন
বাল্মীকি মুনির আজ্ঞায় রাখে তপোবন।
পবন বেগে তুরঙ্গ সেথা উপস্থিত হইল,
অশ্ববরে দেখি বড়ো আনন্দিত হইল;
বাঁধিবারে আগাইল ভাই দুইজন।

(লব-কুশের প্রবেশ)

লব। কার ঘোড়া কোথা হইতে আইল কে-বা জানে
কুশ। এমন ঘোড়া দেখা নাহি যায় কোনোখানে।
লব। আপনি কে? কী জন্য বনে? বিস্ময় জন্মিল মনে।
কুশ। দেখিতেছি লক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ধরনে।
ঘোড়া। রামাশ্বমেধের হয় মম পরিচয়
কপালেতে রয়েছে লিখন।
পড়ে দেখো জয়পত্র কপালের মাঝে অত্র
গাঁই-গোত্র পড়ে নিয়ো ভাই।
থাকে যদি জমা যোত্র কুশ কাশ শুষ্ক পত্র
সদ্য আনি জোগান দ্যাও তাই।
সওয়ারি বা সহিস কেন সাথে নাই আর—
লব। আমাদেরও তাই, লেখাপড়ার ধারি না ধার।
গীদ গাই কাঁসি বাজাই খাইদাই

ধনুকে গুণ চড়াই কোনো কাজ নাই আর।
বনবাসিনী মায়ের সন্তান
লব-কুশ জানি দু-জনার নাম
কুশ বড়ো লব ছোটো
গোটা রামায়ণ পাঠ মুখে মুখে!

(ঘোড়ার গীত)

লেখাপড়া করে যেই
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
কথাটা কি দু-জনার
একেবারে জানা নেই?
দেখেশুনে লাগে অবাক
কেমনে হয় অন্নপাক?
কাঁসিবাদন নাচন-কোঁদন
আর ধেই ধেই, এ ছাড়া কি কাজ নেই?

লব-কুশ। লিখিব পড়িব মরিব দুখে
ঘোড়া পাকড়িব চড়িব সুখে।
রথের ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া,
জল পী পী, মাটির ঘোড়া,
আয় না কাছে দে না ধরা।
অশ্বমেধের পাগলা ঘোড়া
পড়েছ ধরা! যাবা কোন মুখে?

ঘোড়া। যেই ঘোড়া অশ্বমেধে পেট দান করে
নিশ্চয় বৈকুণ্ঠবাসী সেই হয় পরে—
রয় সুখে।

লব-কুশ। পরের কথা পরে হবে, এখন ঘরে যাই চলো।

ঘোড়া। অশ্বমেধের ঘোড়া আমি
যাত্রাভঙ্গ নাহি করো,
জয়পত্রে লেখা পড়ো।
যজ্ঞেশ্বরের অশ্ব আমি
আমারে না ধরো, বাধিবে সমর।

(লব-কুশের গীত)

লব। হোঃ ঘোড়াটা লাফায় বড়ো,
কুশ। আমি ল্যাজ মলি, তুমি দড়াটা ধরো।
লব। এ যে দুষ্টু ঘোড়া কামড়াতে চায়,
কুশ। কান দুটা ওর মুচড়ে ধরো।

(ঘোড়ার নৃত্য-গীত)

অশ্বমেধের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবার জোড়া
কুচ নেই তো আছে চিকনচাকন চামোড়া।
এক ভাগ আছে ঠিক, তিন ভাগ খোঁড়া
উলটোরথ টানতে পারি ল্যাজে দিলে মোড়া।

(কুশের গীত)

ঘোড়া নিয়ে হল বড়ো দায় —
ডানে চালাইতে ঘোড়া বামে যেতে চায়।
ভাবলেম নেব ঘর মনোহর অশ্ববর
কাজ দিবে বিস্তর তিন পায় মোট বহায়।
এখন যে চলতে এলে মাথা চালে
অনিচ্ছাতে ঘাড় ঝাঁকায়।

লব। কশাঘাত করো রে কুশ
নইলে বাগ মানানো দায়।
ঘোড়া নয় এটা বোকা ছাগল
বেঁধেছে জয়পতাকা মাথায়।

কুশ। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি ডাকে
কোড়া খেলে জোড়া লাত কষায়।

লব। খাওয়াও ওটায় তিন্তিড়ি
লাফাতে দাও তিড়িবিড়ি।
ছিরি বার হবে গেলে মশায়
সিধে হবে কশায় কশায়।

(ঘোড়ার নৃত্য-গীত)

দানা না পেলাম পানি না পেলাম
দাহানা চিবায় দাঁত পড়ালাম।

কিন্তু ফলল না ফল আসাই বিফল,
বেগার খেটে এবার গেলাম।
মন কেবলই মরল ছুটে
বোঝা বইল দেহ মুটে.
খেয়ে গালাগাল হলেম নাকাল
ছেলে ঠেকাতে এসে গেলাম।

(লব-কুশের গীত)

দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া হামে চলি যাও রে
সমরে চলিনু আজ, হামে না ফেরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমরতরঙ্গে।
ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা
নাচিবে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।
উড়িল ছকড়া ঘোড়া এরে না থামাও রে।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। দুই কানে দাও মোড়া যতই চাবকাও রে
ঘোটক আটক রাখা কারু সাধ্য নয় হে।
সর্বসুলক্ষণযুক্ত যজ্ঞের অশ্ব
মুনি মন্ত্রে অভিষেক করিলেন তস্য,
পাছে আসছে রামসৈন্য ভুবন বিজয় রে।

লব-কুশ। লব-কুশ [illegible] ভাই রক্ষা করি তপোবন
চিত্রকুট পর্বতে গিয়াছেন তপোধন।
দেখিয়া বিচিত্র ঘোড়া বাঁধিয়াছি বলে
বান্ধিয়া রাখিব নিয়া বনতরুতলে।

হনুমান। অবোধ বালক তোরা ঘোড়া ছেড়ে দে রে —
কী তোদের নাম, কোথায়-বা ধাম,
আমি হনুমান ধেড়ে।
ক্ষুদ্র দেখে যুদ্ধ ইচ্ছা না করি আমি বুড়া,
নয়তো একটা চপেটাঘাতে
মাথা করতাম গুঁড়া,
ঘোড়া নিতাম কেড়ে!

লব। বানর আসি চাহিতেছ মোদের পরিচয়?

কুশ। দুটি ভাই যমের দূত, আর কেহ নয়!

হনুমান। পবননন্দন আমি সকলেই জানে
এনেছি তলব চিঠি তোমাদের নামে—
ঘোড়া ধরলে যাইতে হবে শমনের ধামে।
তবু যদি যুদ্ধ করো না বুঝিয়ে মর্ম
সেটা কেবল মৃত্যুকালে প্রলাপের ধর্ম।

(লব-কুশের গীত)

কাঁচা কাঁচা কথা কসনে ভেবে কাঁচা ছেলে—
ঘোড়া দে না বললে যেন ঘোড়ায় চড়ে এলে
কোথাকার পুন্‌কে কপি নাম হনুমন
চটক ফটক লাগাল আসি ঘোটকের কারণ।

হনুমান। ভালোমন্দ যা বললে শুনে হলেম তুষ্ট
বালকের বচন শুনিতে বড়ো মিষ্ট।

(হনুমানের গীত)

শুন শুন ওরে অবোধ,
বালকের প্রতি করলে ক্রোধ
অপযশ আমারই ঘোষণা।
তোরা শিশু হয়ে শুধালি মোরে
পরিচয় দিলাম তোরে।
তোরা কেন করিস প্রবঞ্চনা,
করতে কথা কাটাকাটি
হবে শেষে চটাচটি
একথাটি সেকথাটি করো না।
তোদের অঙ্গ অবয়ব
রামেরই মতো দেখছি সব
কোলে নিতে করছি বাসনা।

কুশ। প্রাণের বিষয় সন্দ পাতাতে চাও সম্বন্ধ
তুষ্ট করো মিষ্ট আলাপনে—
কাল পূর্ণ হলে পরে ঔষধে কে রক্ষা করে
বাঁচাবাঁচি হবে না বচনে।

লব। শুন শুন কুশিভাই কী অপরূপ শুনতে পাই
পশুর মুখে মানুষের বাণী,
ধনুগুণে বন্দি করে লও এটারে স্কন্ধে করে
নাচ দেখাবে দু-দিনে পোষ মানি।

(উভয়ের গীত)

গাটি সাদা মুখটি কালো
এ একতরো দেখতে ভালো।
মুনিমশায়ে তামাশা দেখাব
এনে তপোবনে।
এটা যদি ভাই পোষ মানে
মাকড়ি গড়ায়ে পরাব কানে,
কাপড় পরালে বানরে মানাবে ভালো।

হনুমান। কারে নিচ্ছ স্কন্ধোপরে প্রকাশ পাইবে পরে
এখন তো সামান্য অনুমান—
দুই ভাই হইয়ে মত্ত করছ কত পুরুষত্ব,
এর পরে দেখাব মজাখান—
নাম যদি হয় হনুমান।
বড়ো আয়েসে যাচ্ছ চলে ভর দিচ্ছি না বালক বলে
ভার দিই তো নিকলে যাবে প্রাণ।
বেন্ধেছ বৃহৎ অঙ্গ ওই রসে করিছ ব্যঙ্গ
হেতু বি[illegible] কি কপি বান্ধা যান?
মিছা তো[illegible] আস্ফালন হনুমন আপনি বন্ধন লন
নইলে কি তোদের ধরে টান।

কুশ। করেছিলেম এইটে মন
বুঝি শয়েক দেড়শো মণ
ওজন হবে দু-জনে তোলা ভার।

লব। শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা
কিছুই নাই ভার যেন শোলা,
এইটে দেখি ভারী চমৎকার!

কুশ। বল বুদ্ধি কিছুই নাই
হনুটোর কেবল তনুটো ভাই
যে কেতে থোও সেই কেতেই পড়ে।

লব।	প্রাণের ডরে করে উপ
	চুপ বললে অমনি চুপ
	কুড়িয়ে লেজুড় জড়সড় করে।

(জাম্বুবানের প্রবেশ ও গীত)

ওরে কুশি-লব করিস কী গৌরব
বান্ধা না দিলে পারিতে না বাঁধতে।
ভববন্ধন বারণ কারণ
হনুমান-জাম্বুবান বান্ধা গেছি
ছিরি রামের চরণপান্তে।

লব।	রামরাজার এ ভারী যশ
	বানর ভল্লুক এমন বশ।
কুশ।	এইটা বড়ো চমৎকার লাগছে মনে।
লব।	ভালুকটারে যদি পাই
	নাকে দড়া দিয়া নাচাই।
কুশ।	আমিও তাই করতেছি মনে মনে।
জাম্বুবান।	সম্প্রতি সুবুদ্ধি দিয়ে
	বারেক দুটি আঁখি মুদিয়ে
	বিবেচনা করিয়ে দেখো লব—
	পশু সনে সাধ সংগ্রামে
	ভয় না আছে তাহাতে প্রাণে
	সাধুর একথা সত্য বটে সব।
	মনেতে করহ্ চিন্তে
	জাম্বুবানে রণে জিনতে
	চাই করতলে মস্ত তিনটে নখ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ।	কে তোরা বালক জীবন হারাতে
	বিপদসাগরে যেয়ো না পা বাড়াতে,
	পাবে শেষে মনস্তাপ।
	ভয় করি পাছে বধ হয়ে যাও বিভীষণের হাতে।
	সময় দিলাম ছেড়ে সংগ্রাম ঘরে পালাতে।

(যুদ্ধবাদ্য)

লব-কুশ। ধর রে ধর পলারে পলা
চেপে ধর ল্যাজ ঠেসে ধর গলা।
রণে জিনতে কাহার শকতি
মা আমাদের জানকী সতী।
ও ভাই চরণে করছি নতি
কথাটা আগে উচিত ছিল বলা।

হনুমান। চলো মার কাছে খাব ছোলা।

লব। দ্বারের বাহিরে মাতা দেখো গো আসিয়া
দুর্জয় কয়টা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।

কুশ। দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির
হনুমান জাম্বুবান দুর্জয় শরীর।
হস্ত পদ বান্ধা হনুমান জাম্বুবান
বাহিরে আসিয়া মাতা দেখো বিদ্যামান।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। আরে লব, আরে কুশ, করিলি কুকর্ম—
তোরা বিদ্যা শিখে নাশিলি জাতি ধর্ম।

জাম্বুবান। মোদের জন্ম অতি বিফল
বনের পশু খাই বনফল
ধর্মাধর্ম নাইকো জ্ঞানোদয়।

হনুমান। গাছে গাছে করি ভ্রমণ
জানি না শৌচ আচমন
ছুঁলে মোদের স্নান করতে হয়।

বিভীষণ। এরা স্কন্ধে করে নিলে তারে
ছুঁয়েছে রাক্ষস আমারে।

ঘোড়া। এখন এদের ধরে পঞ্চগব্য খাওয়ালে হয়

সীতা। হনুমান পুত্র আমায় করেছে উদ্ধার,
বিভীষণ স্বামী হন সখী সরমার।
জাম্ববান শ্রদ্ধাবান সদা প্রভুর প্রতি,
যজ্ঞের অশ্ব ইনি সর্বত্র এঁর গতি।
ইহাদের বাঁধিলি তোরা অবোধ বালক
শুনিলে এসব কথা কী কহিবে লোক?
লব-কুশ অতি শীঘ্র ঘুচাও বন্ধন

হনুমানে জাম্বুবানে করহ মোচন।.
এক কথা হনুমান করহ পালন
কারও ঠাঁই না কহিয়ো এসব বচন।
তোমার রামের পুত্র এরা দুই ভাই
না চিনে করিল যুদ্ধ দোষ দেহ নাই।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি। এতদিন ভালো ছিলে করে গীত-নাট
ধনুর্বিদ্যা শিখাইয়া পাড়িনু প্রমাদ।
ধনুর্বিদ্যা তোমাদের করাইয়া শিক্ষা
সাক্ষাতে পাইলাম আমি তাহার পরীক্ষা।
গীত-বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দুইজন
রাম-যজ্ঞে গিয়ে দোঁহে গাবে রামায়ণ।
দুই ভাই করো মোর কবিত্ব প্রচার
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার।
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
সাবধানে গাহিবে তোমরা রামায়ণ।
পরিচয় চাহিলে রাম সভার ভিতর
বাল্মীকির শিষ্য যেন করিয়ো উত্তর।

লব। অযোধ্যার রাজা রাম
অশ্ব তার বেন্ধে নিলাম।
উথ্যা করে রণে এলেন ধনুকে দিয়ে চাড়া
চার ভাই সসৈন্যে রণে পড়েছেন তাঁরা।

কুশ। ধনুর্বাণ আনিয়াছে যুদ্ধের সাজন
এই দেখো আনিয়াছি রামের আভরণ।

বাল্মীকি। আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হয়ে শ্রীরামেরে জিনে দুইজনে।

সীতা। রঘুনাথ বিনা মম নাহিক জীবন
যমুনাতে এই তনু দিব বিসর্জন।

লব। পিতৃবধ করিয়া পাইলাম বড়ো লাজ
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাহি কাজ।

কুশ। এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার।

সীতা। যমুনার জলে আগে করিব প্রবেশ
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিহ অবশেষ।

বাল্মীকি। শুন শুন মা জননী, প্রাণ ত্যজ নাই,
বাঁচিবে এখনই রাঘবেরা চারি ভাই।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন
উঠিবেক, পড়িয়াছে আর যত জন।
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে যাও তুমি।

সীতা। আগে তো প্রভুর আমি দেখিব চরণ
তবে তো আশ্রমে ফিরে করিব গমন।

বাল্মীকি। তপোবনে কুণ্ডে আছে মৃতজীবী জল
সেই জল ছিটাইয়া বাঁচাব সকল
আমি হেথা রহিলে না হইত এমন
শ্রীরামে এক্ষণে সীতা করো সম্ভাষণ।

(রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

রাম। বাঁচিলাম মুনিবর তোমার প্রসাদে
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে।

বাল্মীকি। অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে
যজ্ঞ পূর্ণ করো গিয়া অশেষ বিশেষে;
লব-কুশের রামায়ণ গাহাইয়ো শেষে।
লব-কুশ যুক্তি শুন তোমরা দুইজন
মিষ্টস্বরে উভয়ে গাহিবে রামায়ণ।
যখন গাহিবে গীত মায়ের বর্জন
না বলিয়ো শ্রীরামেরে কোনো কুবচন।

রাম। ভাইগণ অযোধ্যায় চলহ ত্বরিত
শিশুমুখে মিষ্ট গান শুনিতে উচিত।

স্মৃতিচিত্র

পদ্মদাসী

রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পল-তোলা থাম, এরই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতলার উত্তর-পুব কোণের ছোটো ঘরটা; এক কোণে জ্বলছে মিটমিটে একটা তেলের সেজ। হিমের ভয়ে লাল খেরুয়ার পুরু পরদা দিয়ে সম্পূর্ণ মোড়া ঘরের তিনটে জানলাই, ঘরজোড়া উঁচু একখানা খাট—তাতে সবুজ রঙের মোটা দিশি মশারি ফেলা রয়েছে। ঘরে ঢোকবার দরজাটা এত বড়ো যে, তার উপরদিকটাতে বাতির আলো পৌঁছোতে পারেনি! এই দরজার একপাশে একটা লোহার সিন্দুক, আর তারই ঠিক সামনে কোথা থেকে একটা কাঠের খোঁটা হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে হাত-তিনেক উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই খোঁটা — ঘরের মধ্যে যার দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ ছিল না — সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেড়হাত-প্রমাণ একটা ছেলে! খোঁটার মাথার কাছে এতটুকু কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত, তারই মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনে কুলুঙ্গিটার। আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্মদাসী মস্ত একটা রুপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে—তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ 'দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে—উঠছে! চারদিক সুনসান, কেবলই দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি! আর দাসীর কালো হাতের ওঠা-পড়ার দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবছি— উঁচু খাটে উঠতে পারা যাবে কি না। পরদার ওপারে অনেক দূরে আস্তাবলের ফটকের কাছে নন্দ—ফরাশের ঘর, সেখানে নোটো - খোঁড়া বেহালাতে গৎ ধরেছে—এক দুই তিন চার, এহেক দুহি তিহিন চার। এক দুই তিন চার জানিয়ে দিলে রাত কত হয়েছে তা—অমনি তাড়াতাড়ি খানিক আধ-ঠান্ডা দুধ কোনোরকমে আমাকে গিলিয়ে খাটের উপর তিনটে বালিশের মাঝখানটায় কাত করে ফেলে মনে মনে একটা ঘুমপাড়ানো ছড়া আউড়ে চলল আমার দাসী। আর তারই তালে তালে 'অন্ধকারে তার কালো হাতের রহে-রহে ছোঁয়া ঘুমের তলায় আস্তে আস্তে আমাকে নামিয়ে দিতে থাকল।

একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াত কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত সে, দেখতে পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে। কোনো কোনো দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চালভাজা কটকট চিবোত, আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াত। শুধু শব্দে জানতাম এটা। আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপিচুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু অন্ধকারেই আমার মুখে গুঁজে দিত— নিত্য খোরাকের উপরি-পাওনা ছিল এই নাড়ু!

খাটে উঠব কেমন করে এই ভয় হয়েছিল; কাজেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম। জানিনে তার আগে কোথায় কোন ঘরে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিত কোন বিছানায় সে।

চারদিকে সবুজ মশারির আবছায়া-ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারী নতুন ঠেকেছিল সেদিন—একটা যেন কোন দেশে এসেছি—সেখানে বালিশগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড়-পর্বত, মশারিটা যেন সবুজ কুয়াশা-ঢাকা আকাশ যার ওপারে—এখানে আর মনে করতে হত না, দেখতে পেতেম চিৎপুর রাস্তা থেকে যে সরু

গলিটা আমাদের ফটকে এসে ঢুকেছে সেটা একেবারে জনশূন্য! দু-নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপালিটির দেওয়া একটা মিটমিটে তেলের বাতি জ্বলছে, আর সেই আলো-আঁধারে পুরনো শিবমন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে একটা কন্ধকাটা দুই হাত মেলে শিকার খুঁজে খুঁজে চলেছে। কন্ধ-কাটার বাসাটাও সেইসঙ্গে দেখা দিত— একটা মাটির নল বেয়ে দু-নম্বর বাড়ির ময়লা জল পড়ে-পড়ে খানিকটা দেওয়াল সোঁতা আর কালো, ঠিক তারই কাছে আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে তার বাস—দিনেও তার মধ্যে অন্ধকার জমা হয়ে থাকে।

সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোক গেলে; যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো হাত দুটো যার পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার! আর-একটা ভয় আসত সময়ে সময়ে. কিন্তু আসত সে অকাতর ঘুমের মধ্যে—সে নামত বিরাট একটা আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপর! যেন আমাকে চেপে মারবে এই ভাব— নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই। কখনো আসত সেটা এগিয়ে জ্বলন্ত একটা স্তনের মতো একেবারে আমার মুখের কাছাকাছি, ঝাঁঝ লাগত মুখে-চোখে! তারপর আস্তে আস্তে উঠে যেত গোলাটা আমাকে ছেড়ে, হাঁফ ছেড়ে চেয়ে দেখতেম সকাল হয়েছে—কপাল গরম, জ্বর এসে গেছে আমার। দশ-বারো বছর পর্যন্ত এই উপগ্রহটা জ্বরের অগ্রদূত হয়ে এসে আমায় অসুস্থ করে যেত। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিল না কোনো কিন্তু উপদেবতা আর কন্ধকাটার হাত থেকে বাঁচবার উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছিলেম। লাল শালুর লেপ, তারই উপরে মোড়া থাকত পাতলা ওয়াড়, আমি তারই মধ্যে এক-একদিন লুকিয়ে পড়তাম এমন যে, দাসী সকালে বিছানায় আমায় না দেখে, 'ছেলে কোথা গো' বলে শোরগোল বাধিয়ে দিত। শেষে পদ্মদাসীর পদ্মহস্তের গোটাকয়েক চাপড় খেয়ে জাদুকরের থলি থেকে গোলার মতো ছিটকে বার হতেম আমি সকালের আলোতে।

জীবনের প্রথম অংশটায় সকালের লেপের ওয়াড়খানা গুটিপোকার খোলসের মতো করে ছেড়ে বার হওয়া আর রাতে আবার গিয়ে লুকোনো লেপের তলায়, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে বাটি, ঝিনুক, খাট, সিন্দুক, তেলের সেজ, পদ্মদাসী, এমনি গোটাকতক জিনিস, আর শীতের রাতের অন্ধকারে কতকগুলো ভূতের চেহারা, দিনের বেলাতেও অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো কতকগুলো চমকে-দেওয়া শব্দ— দরজা পড়ার শব্দ, চাবির গোছার ঝিনঝিন মাত্র আছে আমার কাছে, আর কিছু নেই— কেউ নেই।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনের বেলা ১২টা ১১মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়স পর্যন্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের পুঁজি—এক দাসী, একখানি ঘরে একটি খাট, একটি দুধের বাটি, এমনি গোটাকতক সামান্য জিনিসের মধ্যেই বদ্ধ রয়েছে। শোওয়া আর খাওয়া এ ছাড়া আর কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগ নেই আমার। অকস্মাৎ একদিন এক ঘটনার সামনে পড়ে গেলেম একলা। ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন সকাল দেড়-প্রহর হবে, তিনতলার বড়ো সিঁড়ির উপর ধাপের কিনারা—যেখানটায় খাঁচার গরাদের মতো মোটাসোটা শিক দিয়ে বন্ধ করা—সেইখানটায় দাঁড়িয়ে দেখছি কাঠের সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধাপগুলো একটা চৌকোনা যেন কুয়োকে ঘিরে ঘিরে নেমে গেছে কোন পাতালে তার ঠিক নেই! এই ধাপে ধাপে ঘূর্ণির মাঝে একটা বড়ো চাতাল। পশ্চিমদিকের একটা খোলা ঘর হয়ে চাতালের উপরটায় এসে পড়েছে চওড়া সাদা আলোর একটি মাত্র টান। ঠিক এইখানটায় আমার কালো দাসী আর 'রসো' বলে একটা মোটাসোটা

ফরসা চাকরানি কথা কইছে শুনছি। আমি তো তাদের কথা বুঝিনে—কথার মানেও বুঝিনে—কেবল স্বরের ঝোঁক আর হাত-পা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেধেছে। খাঁচার পাখির মতো গরাদের মধ্যে থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি কী হয়। হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের উপর। আবার তখনই সে ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে থাকল। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উসকো— চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে সিঁদুর-পরা যেন কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি সে একটি! আমি চিৎকার করে উঠলেম, 'মারলে, আমার দাসীকে মারলে'। লোকজন ছুটে এল, ডাক্তার এল, একটা ছেঁড়া কাপড়ের সাদা পটি দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল; কিন্তু আমার মনে জেগে রইল সিঁড়ির ধারে সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই দাসীর। সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে। তারপর থেকে দেখি দাসী কাছে নেই কিন্তু তার ভাবনা রয়েছে মনে— দেশ থেকে খেলনা নিয়ে ফিরবে দাসী। সিঁড়ির দরজায় বসে বীরভূমের গালার তৈরি একটা কাছিম নিয়ে খেলি আর রোজই ভাবি দাসী আসবে। কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী! শুনি সে ভীষণ কালো ছিল। পদ্ম নামটা মোটেই তাকে মানাত না। সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিল এ বাড়িতে। রাগ করে গেছে, গল্প বলেছে, ঝগড়া করেছে, কাজও করেছে এবং মানুষ করবার বকশিশ সোনার বিছে-হার আর রক্তের টিপ পরে চলেও গেছে বহুদিন। পৃথিবীর কোনোখানে হয়তো আর কোনো মনে ধরা নেই তার কিছুই এক আমার কাছে ছাড়া। হয়তো-বা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে সেই নিতান্ত পর এবং একান্ত দূর যে তাকেই দেখতে পাচ্ছি— পঞ্চান্ন বছরের ওধারে বসে সে দুধ ঢালছে আর তুলছে আমার জন্যে! ...

আমার কুষ্ঠিখানা লিখেছে দেখি বেশ গুছিয়ে; সন তারিখ বছর মাস দিন মিলিয়ে পরেপরে ঘটনাগুলো ধরে দিয়েছে সেখানে গনৎকার। কিন্তু এভাবে জীবনটা তো আমার চলল না লতার পর লতা পারম্পর্য ধরে। কাজেই কুষ্ঠি অনেকটা ফলে গেলেও আমাদের সেকালের 'কালী আচায্যি'কে দ্বিতীয় বিধাতাপুরুষ বলে স্বীকার করা চলল না। আচমকা যেসব ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে পড়ে আজও সেইগুলোকেই আমি জানি বিধাতার সাটে লেখা বলে— যেটা তিনি ছ-দিনের দিন সব ছেলেরই একটুখানি মাথার খুলিতে ঘুণাক্ষরের চেয়েও অপাঠ্য অক্ষরে লিখে যান। ঘটনা ঘটল তো জানলে· কপালে এইভাবে এটা লেখা ছিল।

একটা বিস্ময়চিহ্ন কালো কালিতে, তার মাথায় লাল কালির একটা টান—এই সাটটুকুর মধ্যেই ধরা গিয়েছিল আমার আর দাসীর আদ্যন্ত ইতিহাস। তারপর হয়তো খানিকটা ফাঁকা মাথার খুলি; তার পর আর-একটা অদ্ভুত চিহ্ন, ঘটাকার কী পটাকার, কী একটা পাখি, কী একটা বাঁদর, কী একটা গোলাকার, কত কী যে তার শেষ নেই— সেঁজুতি-ব্রতের আলপনার মতো বিধাতার জল্পনা-কল্পনা জানাতে রইল।

জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রথম বিস্ময়ের চিহ্নটাতে এসে আমার পনেরো মাস কী পঁচিশ মাস কী কতটা বয়স কেটেছিল তা বলতে পারা শক্ত; তবে হঠাৎ অসময়ে এসে যে চিহ্নটাতে কপাল ঠুকেছিলেম আমি এবং আমার দাসী দু-জনেই— এটা ঠিক!

সাইক্লোন

এটা জানি তখন — দিন আছে, রাত আছে, আর তারা দু-জনে একসঙ্গে আসে না আমাদের তিনতলায়। এও জেনেছি, বাতাস একজন ঠান্ডা, একজন গরম; কিন্তু তাদের দু-জনের কারও একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার। রোদে পোড়ে, বিষ্টিতে ভেজে ওদের গা। এও জেনে নিয়েছি যে একটা-একটা সময় অনেকজন রোদ বাইরে থেকে ঘরে এসেই জানালাগুলোর কাছে একটা-একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়। কোনোদিন-বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানালা দিয়ে সক্কালেই। তক্তপোশের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি রোদটা গড়িয়ে নেয় বালিশে তোশকে চাদরে আমার খাটেই। তারপর চট করে রোদ ধরা পড়ার ভয়ে বিছানা ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়িকাঠে। ছাতের কাছেই আলসের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি, আলো হলেই তারা দু-জনে পড়া মুখস্থ করে— পাক্‌পাখম্‌.... মেজদি... সেজদি....

কড়ে-আঙুল বলে খাব; আংটির আঙুল বলে কোথায় পাব; মাঝের আঙুল বলে ধার করোগে; আর-একটা আঙুল তার নাম যে তর্জনী, তা জানিনে কিন্তু সে বলে জানি, শুধব কীসে, বুড়ো-আঙুল বলে লবডঙ্কা। কী সেটা, দেখতে লঙ্কার মতো আর খেতে ঝাল-না মিষ্টি তা জানিনে, কিন্তু খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলে মজা পাই।

বন্ধ খড়খড়ির একটু ফাঁক পেয়ে জানি রাত আসে, এক-একদিন সাদা প্রজাপতির মতো একফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়, উপুড় হয়ে চেপে পড়লেই মুশকিল বাধে তার — ধরা পড়ে যায় একেবারে, ওইটা নিশ্চয় করে জেনেছি তখন।

পড়তে শেখার আগেই, দেখতে-শুনতে চলতে-বলতে শেখারও আগে, ছেলেমেয়েদের গ্রহ-নক্ষত্র, জলস্থল, জন্তুজানোয়ার, আকাশ-বাতাস, গাছপালা, দেশবিদেশের কথা বেশ করে জানিয়ে দেবার জন্যে বইগুলো তখন ছিলই না। বই-লিখিয়েও ছিল না হয়তো, কাজেই খানিক জানি তখন নিজে নিজে, দেখে কতক, ঠেকে কতক, শুনে কতক, ভেবে ভেবেও-বা কতক। আমি দিচ্ছি পরীক্ষা তখন আমারই কাছে, কাজেই পাসই হয়ে চলেছি জানাশোনার পরীক্ষাতে। আমাদের শান্তিনিকেতনের জগদানন্দবাবুর 'পোকামাকড়' বই কোথায় তখন, কিন্তু মাকড়সার জালসুদ্ধ মাকড়সাকে আমি দেখে নিয়েছি। আর জেনে ফেলেছি যে, মাকড় মরে গেলে ধোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলা। 'মাছের কথা' পড়া দূরে থাক, মাছ খাবারই উপায় নেই তখন, কাঁটা বেছে দিলেও। কিন্তু এটা জেনেছি যে, ইলিশ মাছের পেটে এক থলিতে থাকে একটু সতীর কয়লা, অন্য থলি কটাতে থাকে ঘোড়ার খুর, বামুনের পৈতে, টিকটিকির ল্যাজ এমনি নানা সব খারাপ জিনিস যা মাছ কোটার বেলায় বার করে না ফেললে খাবার পরে মাছটা

মুশকিল বাধায় পেটে গিয়ে। জেনেছি সব বুই মাছগুলোই পেটের ভিতরে একটা করে ভুঁইপটকা লুকিয়ে রাখে। জলে থাকে বলে পটকাগুলো ফাটাতে পারে না; ডাঙায় এলেই তারা মরে যায় বলে পটকাও ফাটাতে পারে না নিজেরা। সেজন্য মাছের দুঃখ থাকে, আর এইজন্যেই মাছ কোটার বেলায় আগেভাগে পটকাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয়। না হলে মাছ রাগ করে ভাজা হতে চায় না—দুঃখে পোড়ে নয়তো গলায় গিয়ে কাঁটা বেঁধায় হঠাৎ।

কালোজামের বিচি পেটে গেলেই সর্বনাশ, মাথা ফুঁড়ে মস্ত জামগাছ বেরিয়ে পড়ে, আব কাগ এসে চোখদুটোকে কালোজাম ভেবে ঠুকরে খায়। জোনাকি—সে আলো খুঁজতে পিদুমের কাছে এল তো জানি লক্ষণ খারাপ, তখন 'তারা' 'তারা' না স্মরণ করলে ঘরের দোষ কিছুতেই কাটে না।

বটতলার ছাপা 'হাজার জিনিস' বইখানার চেয়েও মজার একখানা বই— তারই পাণ্ডুলিপির মালমশলা সংগ্রহ করে চলেছে বয়েসটা আমার তখন। বড়ো হয়ে ছাপাবার মতলবে কিংবা শর্টহ্যান্ড রিপোর্টের মতো ছাঁট অক্ষরে সাটে টুকে নিচ্ছে সব কথা—এ মনেই হয় না।

আজও যেমনি বোধ করি—যা কিছু সবই—এরা আমাকে আপনা হতে এসে দেখা দিচ্ছে—ধরা দিচ্ছে এসে এরা। খেলতে আসার মতো এসেছে, নিজে থেকে তাদের খুঁজতে যাচ্ছিনে—নিজের ইচ্ছামতো তারাই এসে চোখে পড়ছে আমার, যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলাশেষে। সেই পঞ্চাশ বছর আগে তখনও তেমনি বোধ হত। দেখছি না আমি, কিন্তু দেখা দিচ্ছে আমাকে সবাই; আর এই করেই জেনে চলেছি তাদের নির্ভুলভাবে। রোদ, বাতাস, ঘর, বাড়ি, ফুল, পাতা, পাখি এরা সবই তখন কী ভুল বোঝাতেই চলল অথবা স্বরূপটা লুকিয়ে মনভোলানো বেশে এসে সত্যি পরিচয় ধরে দিয়ে গেল, আমাকে তা কে ঠিক করে বলে দেয়?

এ বাড়িটা তখন আমায় জানিয়েছে—মাত্র তেতলা সে। তেতলার নীচে যে আর-একটা তলা আছে, দোতলা বলে যাকে, এবং তারও নীচে একতলা বলে আর-একটা তলাও আছে— একথা জানতেই দেয়নি বাড়িটা। কিন্তু সে জলে না হাওয়ায় ভাসছে, এ মিছে কথাটাও তো বলেনি বাড়িটা। অসত্য রূপটাও তো দেখা যায়নি। আপনার খানিকটা রেখেছিল বাড়ি আড়ালে, খানিকটা দেখতে দিয়েছিল, তাও এমন একটি চমৎকার দেখা এবং না-দেখার মধ্য দিয়ে যে তেমন করে সারা বাড়ির ছবি ধরে, কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান ধরে, অথবা আজকের দিনে সারা বাড়িখানা ঘুরে ঘুরেও দেখা সম্ভব হয় না। আজকের দেখা এই বাড়ি সে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি বলে ঠেকে, যেটা সত্যিই আমাকে দেখা দেয়নি। কিন্তু সেদিনের সে একতলা - দোতলা নেই এমন যে তিনতলা, সে এখনও তেমনিই রয়েছে আমাদের কাছে।

নিজে থেকে জানাশোনা দেখা ও পরিচয় করে নেওয়া আমার ধাতে সয় না। কেউ এসে দেখা দিলে, জানান দিলে তো হল ভাব; কেউ কিছু দিয়ে গেল তো পেয়ে গেলাম। পড়ে পাওয়ার আদর বেশি আমার কাছে; কুড়িয়ে পাওয়া নুড়ির মূল্য আছে আমার কাছে, কিন্তু খেটে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির দিকে টান নেই আমার। হঠাৎ খাটুনি জুটে গেলে মজা পাই, কিন্তু 'হঠাৎ' সত্যি-'হঠাৎ' হওয়া চাই, না হলে নকল-'হঠাৎ' কোনোদিনই মজা দেয় না, দেয়ওনি আমাকে। আমি যদি সাহেব হতেম তো অবিবাহিতই থাকতে হত, কোর্টশিপটা আমার দ্বারা হতই না। দাসীটা চলে গেল তার যেটুকু ধরে দেবার ছিল দিয়ে হঠাৎ। এমনি হঠাৎ একদিন উত্তর-পুর্ব কোণের ঘরটাও যা-কিছু দেখবার ছিল দেখিয়ে যেন সরে গেল আমার কাছ থেকে।

মনে আছে এক অবস্থায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই নেই আমার কাছে। সেই সময়টাতে ছোটো ঘরে হঠাৎ একদিন সকালে জেগেই দেখলেম—লেপের মধ্যে থাকতে থাকতে কোন এক সময় শীতকাল গিয়ে গরম কাল এল। আজ সকালে আমার কপালটায় ঘাম দিয়েছে, আজই দাসীরা বিছানার তলায় লেপটিকে তাড়িয়ে দেবে, আজ রাতে খোলা জানলায় দেখা যাবে নীল আকাশ আর থেকে থেকে তারা, আর আমাকে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সুতোর কাপড়ের ঠিক তেমনি জামা পরে নিতে হবে না, সক্কাল থেকে মোজা পায়ে দিয়েও কর্মভোগে ভুগতে হবে না জেনে ফেললাম হঠাৎ।

সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত না-জানা থেকে জানার সীমাতে পৌঁছনোর বেলা একটা কোনো নির্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ-বিয়োগ-ভাগফলটার মতো এসে গেল জগৎসংসারের যা-কিছু, তা হল না তো আমার বেলায়। কিংবা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটল ঘটনা সমস্ত তাও নয়। হঠাৎ এসে বললে তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে, 'আমি এসে গেছি!' ঠিক যেমন ছবি এসে বলে আজও হঠাৎ,'আমি এসে গেলেম, এঁকে নাও চটপট।' যেমন লেখা বলে, 'হয়ে গেছি তৈরি, চালিয়ে চলো কলম।' চম্‌কিদেবী বলে নিশ্চয় জানি কেউ আছেন আর কাজই যাঁর গোড়া থেকেই চমক ভাঙিয়ে দেওয়া। দেখার পুঁজি জানার সম্বল তিলতিল খুঁটে ভরে তুলতে কত দেরি লাগত যদি চম্‌কি না থাকতেন সঙ্গে দাসীটা ছেড়ে যাবার পরেও। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রের মতো স্টেপ বাই স্টেপ পড়তে পড়তে চলতে দিলেন না দেবী আমাকে, হঠাৎ পড়া হঠাৎ না-পড়া দিয়ে শুরু করলেন শিক্ষা তিনি।

বাড়ির অলিগলি আপন-পর সব চেনা হয়ে গেছে, বাড়ির বাইরেটাকেও জেনে নিয়েছে। কাকের বুলি কোকিলের ডাক ভিন্নতা জানিয়ে দিয়েছে আপনাদের। গোরু-গাধাতে, মানুষে-বানরে, ঘোড়াতে আর ঘোড়ার গাড়িতে মিল-অমিল কোনখানে বুঝে নিয়েছি। বাড়ির চাকর-চাকরানি তাদের কার কী কাজ; কার মনিব কে-বা—সবই জানা হয়ে গেছে। বুঝেও নিয়েছি আমি এ বাড়ির একজন। কিন্তু কী নাম আমার সেটা বলার বেলায় হাঁ করে থাকি বোকার মতো—অথচ থামকে বলি থামই, ছাতকে ছাতা বলে ভুল করিনে; পুকুরকে জানি, পুকুর, আর তার জলে পড়লে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয় তাও জানি। চলি চলি পা নেই—বড়ো-বড়ো সিঁড়ির চার-পাঁচটা ধাপ লাফিয়ে পড়ি। জেনেছি কাঁচা পেয়ারা নুন দিয়ে খেতে লাগে ভালো; ডাক্তারের রেড মিকশ্চার চিংড়ি মাছের ঘি নয়, কিন্তু বিস্বাদ বিশ্রী জিনিস। দুধের সর ভালোবাসি কিন্তু দাসীরা কেউ সেটাতে এক-একদিন ভাগ বসায় তো ধরে ফেলি।

কেবল একটা কথা থেকে থেকে ভুলতে পারিনে—আমি ছোটো ছেলে। অনেকদিন লাগছে, বড়ো হতে, গোঁপ-দাড়ি উঠতে, ইচ্ছামতো নির্ভয়ে পুকুরের এপার-ওপার করতে, চৌতলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে এবং তামাক খেতে বিষ্টিতে ভিজতে।

বাড়ির চাকরগুলো স্বাধীনভাবে রোদ পোহায়, বিষ্টিতে ভেজে, ছোলাভাজা খায়। পুকুরে নামে-ওঠে, তামুক খায়, ফটকের বাইরে চলে যায় গোলপাতার ছাতা-ঘাড়ে হাঁটতে হাঁটতে—এসব কেবলই মনে পড়ায় বড়ো হইনি, ছোটোই আছি—বুঝি-বা এমনই থাকব চিরদিন তেতলায় ধরা। সেইসময় সেই বহুকাল আগের একটা ঝড় পাঠালেন আমাকে দেখতে চম্‌কিদেবী। ঝড়টা এসেছিল রাতের বেলায় এটুকু মনে আছে, তা ছাড়া ঝড় আসার পূর্বের ঘটনা, ঘনঘটা, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্ধ ঘর, অন্ধকার কী আলো কিছুই মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন উঠল তেতলায় ঝড়। কেবলই শব্দ, কেবলই শব্দ। বাতাস ডাকে, দরজা পড়ে, সিঁড়িতে

ছুটোছুটি পায়ের শব্দ ওঠে দাসী-চাকরদের। হঠাৎ দেখেও ফেললেম চিনেও ফেললেম—দুই পিসিমা, দুই পিসেমশায়, বাবামশায়, আর মাকে, যেন প্রথম সেইবার। তিনতলায় এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর সব-কটা ঘরই যেন ছুটোছুটি করে এসে একসঙ্গে একবার আমাকে দেখা দিয়েই পালিয়ে গেল।

এর পরেই দেখছি, বড়ো সিঁড়ির মাঝে একেবারে চৌতলার ছাত থেকে মোটা একগাছা শিকলে বাঁধা লোহার গির্জের চুড়োর মতো সেকেলে পুরনো লণ্ঠনটাকে নিয়ে শিকলসুদ্ধ বিষম দোলা দিচ্ছে ঝড়। নন্দ-ফরাশ — আমাদের লণ্ঠনটাকেই ভালোবাসে সে, সরু একগাছা শনের দড়া দিয়ে কোনোরকমে শিকল সমেত লণ্ঠনটাকে টেনে বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে সিঁড়ির কাটরায়। তুফানে পড়লে বজরাকে যেভাবে মাঝি চায় ডাঙায় আটকে ফেলতে, ঠিক তেমনি ভাবটা তার।

কোনদিন এর আগে জানিয়েছিল শিকলি, লণ্ঠন, সিঁড়ি ও ফরাশ আপন-আপন কথা আমাকে তা একটুও মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ মনে হচ্ছে সেই প্রথমে গিয়ে পড়লেম দোতলায়, বৈঠকখানার মাঝের ঘরটাতে।

কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে, হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে আনলে, কিংবা কোলে করে নামিয়ে আনলে তা মনে নেই। কেবল মাঝের ঘরটা মনে আছে। সেখানে সারি সারি বিছানা, কৌচ, টেবিল সরিয়ে, মাদুরের উপর পেড়ে দিতে ব্যস্ত চাকর-দাসীরা। হলদে রঙের বড়ো বড়ো কাঠের দরজা সারি সারি সব কটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরানিগুলো দুধের বাটি, জলের ঘটি, পানের বাটা, পিতলের ডাবর ঝনঝন কবে ফেলে ফেলে জমা করছে ঘরের কোণে। এরই মাঝে মাদুরে বসে দেখছি; মাথার উপরে সাদা কাপড়ের গোলাপ-মোড়া একটার পর একটা বড়ো ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি, ছোটো-বড়ো সব অয়েলপেনটিং বাড়ির লোকের। জানছি ঝড় যেন একটা কী জানোয়ার—গর্জন করে ফিরছে বন্ধ বাড়ির চারদিকে। দরজাগুলোও ধাক্কা দিয়ে কেবলই পথ চাচ্ছে ঘরে ঢোকবার।

একসময়ে হুকুম হল ছেলেদের শুইয়ে দেবার। দক্ষিণশিয়রে মায়ের কাছে সেদিন মেঝেতে পাতা শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে নিলেম, কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেম না, অনেক রাত পর্যন্ত শুনতে থাকলেম—বাতাস ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, আর দুই পিসি পান-দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনি আর-একটা আশ্বিনের ঝড়ের কথা।

সেই রাতে একটা ইংরিজি কথা জানলেম—'সাইক্লোন'। ঝড়ের এক ধাক্কায় যেন বাড়ির অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি, সেইসঙ্গে ঝড়ই-বা কী, সাইক্লোনই-বা কাকে বলে জানা হয়ে গেল। এক রাত্তিরে যেন মনে হল অনেকখানি বড়ো হয়ে গেছি, জেনেও ফেলেছি অনেকটা — ঘরকে, বাইরেকেও।
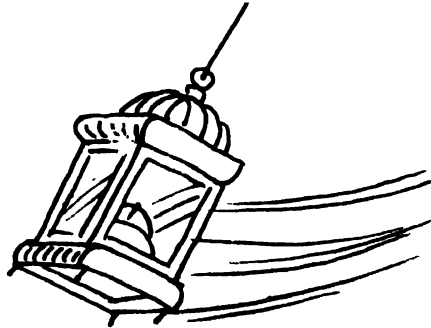
উত্তরের ঘর

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়া-ঘেরা সবুজ চক্কর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য, সুষমা ও কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুরজলে দিনরাত পড়ে আলো-ছায়ার মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠঠোকরা থেকে থেকে। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহংস দেয় সাঁতার, ফোয়ারাতে জল ছোটে সকাল-বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড়বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়। গরমের দিনে দুপুরে চিল স্থির ডানা মেলিয়ে ভেসে ঝিম সুরে ডাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই ওঠে উপরে। পায়রা থেকে থেকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ির ছাতে উড়ে উড়ে বেড়ায়। কাক উড়িয়ে নেয় শুকনো ডাল, মাটি থেকে গাছের আগায়। সন্ধ্যায় ওঠে নীল আকাশের তারা। রাতে ডাকে পাপিয়া—কতদূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয়—পিউপিউ, কিউকিউ! আবার শেয়ালও ডাকে রাতে, ব্যাঙও বলে বর্ষায়। বেজিও বেরোয়, বেড়ালও বেরোয় থেকে থেকে শিকার-সন্ধানে। একটা-একটা নেড়ি কুত্তো, সেও ফাঁক বুঝে হঠাৎ ঢোকে বাগানে, চারদিক দেখে নিয়ে চট করে সরেও পড়ে রবাহূত গোছের ভাব দেখিয়ে।

কিন্তু তখনও বাড়ির এই রমণীয় দিকটাতে নেমে যাবার আমার বয়েস হয়নি, উঁকি দেবারও অবস্থা হয়নি। ওদিকটা ছিল সেকালের নিয়মে বারবাড়ির সামিল। অন্দরে যারা থাকত তারা তেতলার টানা বারান্দার বন্ধ ঝিলমিল দিয়ে ওদিককার একটু আভাস মাত্র পেতে পারত। কী ছেলে, কী মেয়ে, কী দাসী, কী বউ, কী গিন্নিবান্নি—সকলের পক্ষেই এই ছিল ব্যবস্থা। বেশি রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল-দেওয়া জানলা কটা পুরোপুবি খোলা ছিল তখন বেদস্তুর। ওইদিকটা বন্ধ রাখা প্রথা হয়ে গিয়েছিল কতকটা দায়ে পড়েও। এ বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে প্রস্তুত করা—এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসেবে করে নিতে এখানে-ওখানে নানা পরদা দিতে হয়েছে, না হলে ঘরের আবরু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে, সেটা একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিল নিশ্চয়; তাই কতকগুলো পরদা, ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিল—আবরুর জন্যেও বটে, বাসঘরের অকুলানের জন্যেও বটে। এবং সেই পরদা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানলা-বন্ধ দরজা-বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আপনা হতেই। যখন আমি হয়েছি তখন বন্ধ থাকত দক্ষিণের ঝিলমিল তিনতলার, ভোর হতে রাত দশটা নিয়মমতো।

দক্ষিণ-বারান্দার তিন-হাত পাঁচিল, তার উপরে রেমো সবুজ রং-মাখানো টানা ঝিলমিল বন্ধ! আর আমি তখন মোটে দুই-হাত খাড়াই কি না সন্দেহ। ড্রপসিনের সবুজ পরদার ওপারে কী আছে জানার জন্যে যেমন একটা কৌতূহল থাকে, তেমনি বাড়ির মনোরম অংশটাকে দেখবার জন্যে একটা কৌতূহল ছিল কি ছিল না, কিন্তু উত্তরদিকটাতেই টানছে এখন মন—যেদিকটাতে জীবন বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় খিড়কির ফাঁকে ফাঁকে।

এই খড়খড়ি-দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল-বিকেল, যখন-তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেম। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু হচ্ছে সেখানে—চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কত চরিত্রের, কত ঢঙের, কত সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া—কত কী তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজকর্ম এখানে সবই এক-একটা চরিত্র নিয়ে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপরে এসে পড়ত একটার ঘাড়ে আর-একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ—ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্ত লীলা। উত্তরের সারি সারি তিনটে জানলার তলাতে দেড় ফুট করে উঁচু সরু দাওয়া—সেইখানে বসে খড়খড়ি টেনে দেখি। পুরোপুরি একখানা ছবির মতো চোখে পড়ত না। বাড়ি, ঘর, গাছ—এরই নীচে একটা ময়লা সবুজ টান, তারপর আবার ছবি—ছাগল, মুরগি, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খানিকটা চাকার আঁচড়-কাটা রাস্তা—তারপর আবার সবুজ টান। এমনি একটা করে খড়খড়ির ফাঁক আর একটা করে কাঠের পাটা—এরই উপর সব ছবি ও না-ছবিকে দু-ভাগ করে একটা সরু দাঁড়ি—খবরের কাগজের দুটো কলমের মাঝের রেখার মতোই সোজা—যেটা টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ ছবি দেখা।

বাড়ির উত্তর আঙিনাটায় একটা গোল চক্কর ছিল তখন—এখন সেখানে মস্ত লালবাড়ি উঠে গেছে। এই চক্করের পুবপাশে আর-একটা আধা-গোল গোছের চক্কর; পশ্চিমপাশে আর-একটা চৌকোনা পাঁচিল-ঘেরা বাগান। এই কটা ঘিরে আস্তাবল, নহবতখানা, গাড়িখানা। তিনটে বড়ো বড়ো বাদাম আর অনেক কালের পুরনো তেঁতুলগাছ একটা। এই গাছ কটার ফাঁকে ফাঁকে টানা উঁচু-নিচু সব পাকাবাড়ির ছাত আর চিলেকোঠা। সরু সরু কাঠের থাম দেওয়া, ঝুঁকে-পড়া বারান্দা দেওয়া রামচাঁদ মুখুজ্যের সাবেক বাড়ি—গরাদে আঁটা ছোটো ছোটো জানলা, ইট বার-করা ছাতের পাঁচিল আর দেওয়াল। উত্তরের এইটুকুর মধ্যে ধরা তখন বাইরের দৃশ্য-জগৎটি আমার, বাকি দিনগুলো শোনা আর কল্পনার মধ্যে ছিল। বহির্জগতের খিড়কি দিয়ে, উঁকি দিয়ে দেখার মতো ছবিগুলো। মানুষ, মুরগি, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু-মেথর, নন্দ-ফরাশ, গোবিন্দ-খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে-বেহারা, গোমস্তা, মুহুরি, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা—সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলেছে এই উত্তরের আঙিনাটায়। সকাল থেকে ঘুমের ঘড়ি না পড়া পর্যন্ত কত কী মজার মজার ঘটনা ঘটে চলেছে দেখতেম এইদিকটাতে। কতক সুরকির রাস্তায়, কতক গোল চাকলার মধ্যেটায়, কতক-বা খোলার ঘরগুলোর ভিতরে এবং বাহিরে, অথবা কোনো বাড়ির ছাতে অনেক দূরে। চলতিভাষায় যেন একটা চলনসই নাটক দেখছি। খুব বড়ো ট্র্যাজেডি কী কমেডি নয়, কিন্তু কতক নড়াচড়া, কতক হাবভাব, কতক-বা একটা ছবি—এই দিয়ে ভরতি একটা প্রহসন দেখছি বলতে পারি। সকালে চোখ খোলা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটায় চোখের পাতা বন্ধ করা পর্যন্ত একটা বড়ো নাটক দেখার মতো ছুটি নেই এখন, কিন্তু এটুকু অবসর পেয়েছিলেম তখন। নিত্যনতুন উত্তরচরিতের এক-এক অঙ্কের মতো—এই নাটক শুরু হত এবং শেষ হত যেভাবে তার একটু হিসেব দিই।

তখনও বাড়িতে জলের কল বসেনি। রাস্তার ধারে ধারে টানা নহর বয়ে কলের জল আসে। রোজই দেখি এক ভিস্তি, গায়ে তার হাতকাটা নীল জামা, কোমরে খানিক লাল শালু জড়ানো, মাথায় পোস্ট অফিসের গম্বুজের মতো উঁচু সাদা টুপি—নহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মোষোকে জল ভরে। মোষকালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়, যেন একটা জলজন্তু; পেটটা তার ক্রমেই ফুলতে ফুলতে চকচক করতে থাকে। মোষোকটা ফাটার উপক্রম হতেই ভিস্তি একটা সরু চামড়ার গলাট দিয়ে সেটাকে বেঁধে নিয়ে

গায়ের জল মুছিয়ে যেন পোষা জানোয়ারের মতো পিঠে তুলে নিয়ে চলে যায়, খানিক দৌড়, খানিক আস্তে চলা মিলিয়ে একটা চমৎকার চালে মাটির দিকে বুক ঝুঁকিয়ে। বাঁধা কাজে বাঁধা ভিস্তি, তার চাল-চোল সমস্তই এমন বাঁধা ছিল যে মনেই আসত না সে মরতে পারে, বদলাতে পারে। ঘড়ির মতো দস্তুর মাফিক বাঁধা নিয়মে কাজ বাজিয়ে চলত; দাঁড়াত যেখানকার সেখানে, জল ভরত যেখানকার সেখানে, চলে যেতও যেখানকার সেখানে দিনের পর দিন। তার চেহারা দেখিনি; শুধু তার চলার ভঙ্গি, কাপড়ের রং—এই বিশেষত্ব দিয়েই তাকে আমি দেখতে পাই— সেকাল-একাল সব কালেই সে একই ভিস্তি। কাকগুলোও যে-ভাবে কালের পরিবর্তন ছাড়িয়েছে, ভিস্তিগুলোও সেইভাবে তখনও যে এখনও সে রয়েছে ভিস্তিই। কৃষ্ণনগরের ভিস্তি পুতুল, যাত্রার সাজা ভিস্তি, বহুরূপীর ভিস্তি, আরব্য উপন্যাসের ভিস্তি—সবগুলোর সঙ্গে মিলে আছে সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ভিস্তি একজন, যে ঘড়ি ধরে জল ভরত মোষোকে। সেই সেকালের ভিস্তির বেশে বা চেহারায় যদি একটু বিশেষত্ব থাকত তবে একালের ভিস্তির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারতই না সে—সে যেন একটা সনাতন চিরন্তন জীবের মতো তখনও ছিল এখনও আছে।

ভিস্তি চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই মাথায় ফেটি বেঁধে দু-হাতে দুই ঝাঁটা নিয়ে দেখা দিত একটা মানুষ। জাতে সে ডোম, তার নাম ছিল শ্রীরাম, কিন্তু ডাকত সবাই ছিরে বলে। সে দুই হাত খেলিয়ে চটপট দুটো কলমের মতো করে কাটা ঝাঁটা বুলিয়ে যায়। নিমেষে সব রাস্তাই ঢেউ-খেলানো দুই প্রস্থ রেখায় অতি আশ্চর্য অতি পরিষ্কার ভাবে নকশাটানা হয়ে যায়। চমৎকার চুনোট-করা গেরুয়া কাপড়ে সমস্ত সদর রাস্তাটা যেন মোড়া হয়ে থাকে খানিকক্ষণ ধরে। রাস্তার আর্টিস্ট, ধুলোর আর্টিস্ট, ডবল ঝাঁটার আর্টিস্ট—তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকত কতক্ষণ! আমরা যেমন ছবির নানা কাজে নানারকম সরু মোটা ভোঁতা চেটালো তুলি রাখি, আমাদের ছিরে- মেথরও কাছে রাখত রকম-বেরকম ঝাঁটা। রাস্তার ঝাঁটা ছিল তার কলমের মতো ডগার একধারে ছোলা; জলের নর্দমা পরিষ্কার করবার জন্যে রাখত সে দাড়ি-কামানো বুরুশের মতো ছোটো এবং মুড়ো ঝাঁটা; বাগানের পাতালতা কুটোকাটা ঝাঁটানোর জন্যে ছিল চোঁচের মতো খোঁচা দু-ফাঁক ঝাঁটা যাতে সামান্য কুটোটিও ঝুড়িতে তুলে নেওয়া চলে অনায়াসে; উঠোন, দালান, বারান্দা ঝাঁটানোর ঝাঁটা ছিল চামরের মতো হালকা ফুরফুরে, বাতাসের মতো হালকা পরশ বুলিয়ে চলত মেঝের উপরে। এই নানারকম ঝাঁটার খেলা খেলিয়ে চলে যেত সে রোজই। আঙিনা, রাস্তা, অলিগলি, বারান্দা ঝেঁটিয়ে যেত ছিরু যখন তকতকে পরিষ্কার করে, তখন তারই উপরে চলত যাত্রা-অভিনয় আবার।

এবারে কেবল চলন্ত ছবি! একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া, তার চেয়ে ছোট্ট একটা পালকিগাড়ি টানতে-টানতে পুরনো বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াতেই বাক্সর মতো ছোট্ট গাড়ি থেকে মোটাসোটা গম্ভীর এক বাবু নেমে পড়েন, মাথার চুল তাঁর কদমফুলের মতো ছাঁটা। সোয়ারি নামতে না-নামতে বোঁ করে গাড়িটা গোল চক্করের পশ্চিমদিকের অশ্বত্থতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয়। ছোট্ট ঘোড়া অমনি ছোট্ট ফটক ঠেলে কচি ঘাস চোরকাঁটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগে, আর গাড়িখানা কুমিরপোকার শুঁড়ের মতো বোম-জোড়া আকাশে উঁচিয়ে নৈর্ঋতকোণের দিকে চেয়ে তার বাবুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

একটা ছাতি আস্তে আস্তে ফটকের দিকে এগিয়ে চলে, অথচ মানুষ দেখিনে তার নীচে। হঠাৎ দেউড়ির কাছে এসে ছাতিটা বন্ধ হয়ে তলাকার ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাশ করে দেয়—মাথায় চকচকে টাক, ছোট্ট যেন একটা মাটির পুতুলের মতো বেঁটেখাটো মানুষটি। ঘণ্টা বাজে এবার সাতবার, তারপর

খানিক ঢং ঢং ঢং টান দিয়ে সাড়ে সাত বুঝিয়ে থামে। রোদ এসে পড়ে লাল রাস্তার উপরে একফালি সোনার কাগজের মতো।

চীনেদের থিয়েটার দেখা যেমন খাওয়াদাওয়া গল্পগুজবের সঙ্গে চলে, আমাদের যাত্রা দেখা যেমন— খানিক দেখে উঠে গিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে, কিংবা হয়তো ঘরে গিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে এসেও দেখা চলে, তেমনি ভাবের দেখাশোনা চলত এই উত্তরদিকের জানলায় বসে।

হয়তো ঘরের ওধারে একটা কৌচের তলায় ঢুকে—রবারের গোলাটা পালায় কোথায়—এই সমস্যার মীমাংসা করতে কৌচের তলায় নিজেই একবার ঢুকে পড়তে চলেছি, পা দুটো আমার হাবু শহরের দরজায় গিয়ে ঠেকে ঠেকে, ঠিক সেইসময় খড়খড়ির আসরের দিক থেকে ঘোড়দৌড়ের শব্দ আর সহিসদের হইহই রব উঠল। অমনি নিজের রিজার্ভ বক্সে হাজির। দেখি গোল চক্কর ঘিরে ঘোড়দৌড় বেধে গেছে। সহিস, কোচম্যান, দরোয়ান যে যেখানে ছিল সবাই মিলে ঘোড়া-পালানো আর ঘোড়া ধরার অভিনয় করতে লেগে গেছে। এই অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা দিয়ে সকালের উত্তরকাণ্ডের পালা প্রায়ই বেলা দশটাতে কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হত। স্নান-আহারের জন্যে একটা মস্ত ইন্টারভাল। যাত্রা নিশ্চয়ই চলত তখনও—কেন না এই উত্তর-আঙিনাটা ছিল সাধারণ দিক; বাড়ির কাজকর্মে লোকের যাতায়াতের অন্ত ছিল না, কামাই ছিল না সেখানে। প্রবেশ আর প্রস্থান — এই ছিল ওদিকের নিত্যকার ঘটনা।

দুপুরবেলা নিঝুমের পালা চলছে এখানটায় দেখি। উত্তরের আঙিনার পশ্চিমকোণে আধখানা তেঁতুল আর আধখানা বাদাম গাছের ছাওয়াতে খোলার ঘরটা — ঘরের চাল ধনুকের মতো বেঁকে প্রায় মাটি ছুঁয়েচে। ঘরের সামনে আধখানা মাটিতে পোঁতা একটা মেটে জালা, তাই থেকে ছিরে-মেথর জল তুলে তুলে গা ধুচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে ইংরিজিতে নিজের বউকে গাল পাড়ছে, আর বউটা বাংলাতে বকে চলেছে তার সঙ্গে।

আস্তাবলের সামনে খাটিয়া, তার উপরে পাতা কালো কম্বল, তাতেই শুয়ে ঝকঝকে ঘোড়ার সাজ আর শিকলি। ঘরের মধ্যে ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ার শেষের পা দুটো আর চামরের মতো ল্যাজটা দেখা যায়। ল্যাজটা ছপছপ করে মশা তাড়ায়, আর পা দুটো তালে তালে ওঠে-পড়ে, কাঠের মেঝেতে খটাস-খট শব্দ করে।

গোল চক্করের পশ্চিমে আর-একটা পাঁচিল-ঘেরা চৌকোনা জায়গা, কখনো কপি কখনো বেগুন এই দুই রঙের পাতায় ভরাই থাকত সেটা। চক্করের পুবধারে আর-একটা ঘেরা জমি, সেটার ফটকের দুই ধারের দেওয়ালে চুন-বালিতে পরিষ্কার করে তোলা দুটো হাতি নিশেন পিঠে পাহারা দিচ্ছে। টিনের একটা খালি ক্যানেস্তারা কাদায় উলটে পড়ে আছে; সেইখানটায় হিজিবিজি চাকার দাগ রাস্তায় পড়েছে, তাতে একটু জল বেধে আছে; পাতিহাঁস কটা হেলতে দুলতে এসে সেই কাদাজলে নাইতে লেগে যায়। থেকে থেকে মাথা ডোবায় জলে আর তোলে, ল্যাজের পালক কাঁপায়, শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মাথা, নিজের পিঠে ঘষে আর ঠোঁট দিয়ে গাচুলকে চলে। একটা বুড়ো রামছাগল ফস করে রাস্তা থেকে একটা লেখা কাগজ তুলে গিলে ফেলে চটপট, তারপর গম্ভীর ভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে চলে যায় সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তা বেড়াতে দুপুরবেলা।

গোল চক্করের পুবগায়ে একটা আধ-গোল আধ-চৌকো চক্কর—মরচে-ধরা ফুটো ক্যানেস্তারা, খড়কুটো, ভাঙা গামলা, পুরনো তক্তপোশের উই-খাওয়া ফর্মা আর একরাশ ছেঁড়া খাতায় ভরতি। সেখানে গোটাকয়েক মুরগি চরে — ছাই রং, পাটকেল রং। সাদা একটা মস্ত মোরগ, তার লাল টুপি মাথায়, পায়ে হলদে মোজা,

গায়ের পালক যেন হাতির দাঁতকে ছুলে কেউ বসিয়েছে, একটির পাশে আর একটি। মোরগটা গোল চক্করের ফটকের একটা পিলপে দখল করে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না।

বেলা চারটে পর্যন্ত এইভাবে নিঝুমের পালা চলে। ঢং ঢং করে আবার ঘড়ি পড়ে। একটার পর একটা ইস্কুলগাড়ি, আফিসগাড়ি পালকি এসে দলে দলে সোয়ারি নামিয়ে চলে।

গোবিন্দ-খোঁড়া রাজেন্দ্র মল্লিকের ওখানে রোজই ভাত খায় আর আমাদের গোল চক্করটাতে হাওয়া খেতে আসে। কতকালের পুরনো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, ঠিক যেন বাইবেল কী আরব্য উপন্যাসের একটা ছবির থেকে নেমে এসেছে। গোল বাগানের ফটকের একটা পিলপে ছিল তার পিঠের ঠেস। বৈকালে সেখানটাতে কারও বসবার জো ছিল না। বাদশার মতো গোবিন্দ-খোঁড়া তার সিংহাসনে খোঁড়া পা ছড়িয়ে বসে যেত। পাহারাওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী—সবার সঙ্গেই আলাপ চলে, খাতিরও সকলের কাছে যথেষ্ট তার। শহর-ঘোরা সে যেন একটা চলতি খবরের কাগজ কিংবা কলিকাতা গেজেট। পাঁচিলের উপর বসে সে খবর বিলোত। শুনেছি প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিশ থেকে তেল বিলিয়ে গরিবদের ঘরেও দেওয়ালি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোবিন্দর ঘর-দুয়োর কিছুই নেই—সে ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে গোছের মানুষ, এটা পাহারাওয়ালারা সবাই জানত। তারা গোবিন্দকে ধরে বসলে পিদুম জ্বালাতেই হবে — ঘর না থাকে ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই। গোবিন্দ তখন আমাদের গোল চক্করে দরবারে বসেছে; পুলিশের রহস্যটা বুঝেও যেন সে বোঝেনি এইভাবে পাহারাওলাকে শুধুলে, 'সরকার থেকে কতটা তেল গরিবদের দেওয়ানোর হুকুম হল?' এক পলা করে তেল বিনামূল্যে দেওয়ানোর কথা যেমন পুলিশম্যান গোবিন্দকে বলা, অমনি জবাব সঙ্গে সঙ্গে—'যাঃ-যাঃ, তোর বড়োসায়েবকে বলিস, গোবিন্দ এক-সের তেল নিজে থেকে খরচ করচে।' ভিক্টোর হিউগোর গল্পের একটা ভিখিরির সর্দারের মতো এই গোবিন্দ-খোঁড়ার প্রতাপ আর প্রতিষ্ঠা ছিল তখনকার দিনে। এখন হলে পুলিশের সঙ্গে তকরার, সিডিশান, রাজদ্রোহ, এমনি কিছুতে ধরা পড়ে যেত নিশ্চয় গোবিন্দ।

এদিকে গোবিন্দ-খোঁড়ার দরবার গোল চক্করের পাঁচিলে, ওদিকে নহবতখানার ছাতে বসেছে তখন আমাদের সমশের কোচম্যানের মজলিশ দড়ির খাটিয়া পেতে। সে যেন দ্বিতীয় টিপু সুলতান বসে গেছে ফরসি-হাতে। হাবসির মতো কালো রং, মাথার চুল বাবরিকাটা, পরনে সাদা লুঙ্গি, হাতকাটা মেরজাই, চোখে সুরমা, মেদিতে লাল মোচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি। বাবামশায় হাওয়া খেতে যাবার পূর্বে ঠিক সময়ে সে সেজেগুজে বার হত। চুড়িদার পাজামা, রুপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো, আঙুলে রুপোবাঁধা ফিরোজার আংটি, গায়ে জরিপাড়ের লাল বনাতের বুককাটা কাবা তকমা আঁটা, কাঁধে ফুলকাটা রুমাল, মাথায় থালার মতো মস্ত একটা শামলা, কোমরে দুই সহিসে মিলে জড়িয়ে দিয়েছে লম্বা সাপের মতো জরির কোমরবন্ধ। ফিটফাট হয়ে সমশের লাল চক্করের পাঁচিলে চাবুক হাতে দাঁড়াত আর সহিস সাদা জুড়ির ঘোড়া দুটোকে চক্করের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বাইরে থেকে ফটক বন্ধ করে দিত। তখন সাদা ঘোড়া দুটোকে প্রায় দশ মিনিট সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্কর দিইয়ে তবে গাড়িতে জোতার নিয়ম ছিল। পাছে রাস্তায় ঘোড়া বজ্জাতি করে সেইজন্যে তাদের আগে থাকতে টিট করাই উদ্দেশ্য। এই দুর্দান্ত কোচম্যান, ঘোড়াও তার তেমনি, গাড়িখানা থেকে যেন ঝড়ের মতো বেরিয়ে পড়ত! কোচবাক্সের উপরে দেখতেম খাড়া দাঁড়িয়ে সমশের

হাঁকড়াচ্ছে চাবুক। ফেটিংগাড়ি ছিল খুব উঁচু। গাড়িবারান্দার খিলেনের কাছটাতে এসেই ঝপ করে সমশের নিজের আসনে বসে পড়ত গম্ভীর হয়ে! তারপর একসময়ে ঘোড়া, গাড়ি, কোচম্যান সাজগোজ সব নিয়ে একটা জমজমাট শোভাযাত্রার দৃশ্য রাস্তার উপর খানিক ঝলক টেনে বেরিয়ে যেত গড়ের মাঠে—আতর-গোলাপের খোশবুতে যেন উত্তরদিকটা মাত করে দিয়ে।

এরই একটু পরেই নন্দ-ফরাশ দু-হাতে আঙুলের ফাঁকে বড়ো বড়ো তেলবাতির সেজ দুটো অদ্ভুত কায়দাতে হাতের তেলোয় অটল ভাবে বসিয়ে উঠে চলত ফরাশখানা থেকে বৈঠকখানায়। তারপর ড্রপ পড়ত রঙ্গমঞ্চে, এবং নোটো-খোঁড়া, নন্দ-ফরাশ দুয়ে মিলে বেহালাবাদন দিয়ে সেদিনের মতো পালা সাঙ্গ হত সন্ধেবেলায়। তখন পিদুমের ধারে বসে রূপকথা শোনা, ইকড়ি-মিকড়ি, ঘুঁটি-খেলার সময় আসত।

সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী—দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটাকে বেশি মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিল আমার ছোটো বোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিল মঞ্জরী। আর দোয়ারি চাকর এই কবিত্বপূর্ণ মঞ্জরী নামটির নামের ডগাটা বঁটির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তাও বলে সে, কিন্তু আমি দেখি মঞ্জরীকে শুধু একটা গড়া-পরা নাকভাঙা নাম, বসে আছে একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে। তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা। মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে: 'এক ছিল টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ির ছাতের আলসেতে থাকে, আর রাজপুত্তুরের তোশক থেকে তুলো·চুরি করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে।'

ছাতে ওঠবার সিঁড়ি বলে একটা কিছু নেই তখনও আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে, ছাতের কার্নিসে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনি দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গ পেতেম ছাতের উপরের দিকটা। আবার রোজই নিশুতি রাতে মাথার উপরে পেতেম শুনতে হুটোপুটি করছে ছাতটা—ভাট গড়গড় গড়াচ্ছে, দুমদুম লাফাচ্ছে! ছাতটা তখন ঠেকত ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য বলে—যেখানে সন্ধেবেলা গাছে-গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি, আর আকাশ থেকে জুঁই ফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এ ছাত, ও ছাত পা মেলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে। এমনি করে গল্পকথার মধ্যে দিয়ে কত কী দেখেছি তখন! যখন চোখও চলে না বেশিদূর, পা-ও হাঁটে না অনেকখানি, তখন কান ছিল সহায়। সে এনে পৌঁছে দিত কাছে ছাত, হাতে এনে দিত কমলাফুলির টিয়ে পাখি, চড়িয়ে দিত আগডুম-বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পালকিতে এবং নিয়ে যেত মাসি-পিসির বনের ধারের ঘরটাতে আর মামার বাড়ির দুয়োরেও!

মায়ের অনেকগুলি দাসী ছিল—সৌরভী, মঞ্জরী, কামিনী কত কী তাদের নাম। অনেকদিন অন্তর দেশে যেত এরা সব গাঁয়ের মেয়ে—অনেকদিন পরে ফিরত আবার। কখনো-বা এরা দলবেঁধে যেত গঙ্গা-নাইতে পার্বণে, আর নিয়ে আসত দু-চারটে করে খেলনা, পীরের ঘোড়া, সবজে টিয়ে, কাঠের পালকি, মাটির জগন্নাথ, সোনার ময়ূর, আতা গাছে তোতা, ঢেঁকি, বঁটি। এমনি নানা রূপকথার দেশের, ছড়ার দেশের পশু, পক্ষী, ফুল, ফল, তৈজসপত্র সবাইকে পেতেম চোখের কাছেই কিন্তু মাসি-পিসির ঘর আর মামার বাড়ি দেখা দিয়েও দিত না—বাড়ির ছাতের মতোই অজ্ঞাতবাসে ছিল। মঞ্জরী-দাসী এক-একদিন খেয়ালমতো খোলা জানলার ধারে তুলে ধরত আর বলত—ওই দেখ মামার বাড়ি। বাড়ির সন্ধানে উত্তর-আকাশ হাতড়াত চোখ, দেখত না একখানিও ইট, শুধু পড়ত চোখে তখন আমাদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে মস্ত তেঁতুল-

গাছটার শিয়রে মন্দিরের চুড়োর মতো সাদা সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে। ওইটুকু দেখিয়েই দাসী নামিয়ে দিত কোল থেকে খড়খড়ির তলার মেঝেতে। তারপর সে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাবাড়িতে ভাত খেতে যেত একটা বগি-থালা সিন্দুকের পাশ থেকে তুলে নিয়ে।

প্রায় রাতেরই মতো চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে যেত ঘরখানা দিনদুপুরে। সবজে খড়খড়িগুলো সোনালি দাঁড়ি-টানা একটা-একটা ডুরে কাপড়ের পরদার মতো ঝুলত চৌকাঠ থেকে—কাঠের তৈরি বলে মনেই হত না জানালাগুলো! বাইরের খানিকটা আঁচ পাওয়া যেত খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে, সুতোর সঞ্চারে পৌঁছত এসে আকাশের দিক থেকে চিলের ডাক। বাতাসেরও ডাক খুব মিহি সুর দিয়ে কানে আসত—ঝড়ের একটা আবছায়া মনে পড়ত—একটা দুটো কোমল টান প্রথমে, তারপর খানিক চড়া সুর, তারপর বেশ একটা ফাঁক, তার ঠিক পরেই একখানা তীব্র সুর বাতাসের। এমনি গোটাদুই-তিন আওয়াজ, আর কিছু নেই যখন তিনতলায়, তখন সেই নিঃসাড়াতে চোখ দুটো দেখতে বার হত—যেন রাতের শিকারি জন্তু খুঁজত। এটা-ওটা-সেটা, এদিক-ওদিক-সেদিক সন্ধানে চলত সেদিনের আমিও তক্তার নীচে, সিঁড়ির কোণে, শার্সির ফাঁকে, আয়নার উলটো পিঠে এবং চৌকি বেয়ে আলমারির চালে নানা জিনিস আবিষ্কার করার দিকে। ছাতের কথা ভুলেই যাই—তখন ঘর দেখতেই মশগুল থাকে মন! এক ছোটো ছেলেমেয়েদের ছাড়া এই সময়টাতে খানিকক্ষণের মতো কাউকে পেত না তিনতলার ঘরগুলো। কাজেই এসময়ে আমাদের সঙ্গে যেন ছাড়া পেয়ে জিনিসগুলোও হঠাৎ বেঁচে উঠত, এবং তারাও বেরিয়েছে দিনদুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়—এটা ভাবে জানাত।

সারা তিনতলার দেওয়াল, ছবি, সিঁড়ি, তক্তা, আলমারি, ফুলদানি, মায় মেঝেতে পাতা মস্ত জাজিম এবং কড়িতে ঝোলানো পাখাগুলোর সঙ্গে এমনি করে দুপুরে ঘরে ঘরে ফিরে আর উঁকি দিয়ে, সারা তিনতলা কতদিনে পেয়েছিলেম, পুরোপুরি ভাবে তা বলা যায় না। একটা দোলনা-খাট —ছোট্টো, সেটা খাট থাকতে-থাকতে হঠাৎ কবে একদিন জাহাজ হয়ে উঠল এবং দুলে দুলে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে চলাচল শুরু করলে। মস্ত জাজিম বিছানা ক-জোড়া ছোটো হাতের তাড়ায় যেন ফুলে ফুলে উঠল—যেন ক্ষীরসাগরে ঢেউ তুলে। তক্তার উপরটার চেয়ে তক্তার নীচেটা কবে যে আপনাকে ভারী নিরিবিলি আরামের জায়গা বলে জানিয়েছিল, কোন তারিখে, কোন বছরে, কতকাল আগেই-বা—তা কি মনে থাকে? জানিনে, ভুলে গেছি, এই হল উত্তর তারিখের বেলায়। কিন্তু জিনিসের বেলাতে একেবারে তা নয়—এখনও পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কী তা স্পষ্ট দেখছি আমি—জিনিসগুলোকে একটুও ভুলিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই, মানুষদের মধ্যে অনেকের চেহারাই লোপ পেয়ে গেছে এই তিনতলার থেকে, যেটার কথা আজ বলছি। কাঠের বেড়া-দেওয়া দোলনা-খাট, জাহাজ-জাহাজ খেলে যে কোণে বসে আমাদের সঙ্গে, সেখান থেকে দেখা যায় উত্তরে সরু একফালি দেওয়ালে ঝোলানো একটি ছোট্ট আলমারি—ওষুধ থাকে তার মধ্যে। এই আলমারির চালে বসানো রয়েছে দেখি হলদে-মাটির নাড়ুগোপাল। সে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতের মস্ত নাড়ুটা এগিয়ে দিয়ে চেয়ে আছেই আমার দিকে। এই গোপাল ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোগাপানা সরু-গলার একটা নীল কাচের বোতল—রাঙা, হলুদ, কালো, সাদা রঙের টিকিট আঁটা সেটার গায়ে। নাড়ু দিয়ে লোভ দেখাত মাটির হলেও নাড়ুগোপালটি। আর বিস্বাদ তেলের দু-তিন চামচ নিয়ে বসে থাকত নীল কাচের বোতলটা। রঙিন টিকিট দিয়ে ভোলাতে চাইত, কিন্তু পারত না। আর-একটা

জিনিসকে দেখতে পাই—আনারপুরের জালি কাপড়ে-মোড়া একটা মস্ত ঢাকনা। ছোটো বোন যখন ছোটো ছিল সে এই ঢাকনে-পাখির মতো ঘুমের সময় চাপা পড়ত। যখন তাকে দেখেছি তখন সেটার কাজ গেছে। খালি ঢাকনাটা তখনও কিন্তু ঘরের পশ্চিমধারে মস্ত একটা আলমারির চালে চড়ায় বেধে-যাওয়া উলটোনো নৌকার ছইখানার মতো কাত হয়ে থাকে। ঘরের দক্ষিণগায়ে দেখতে পাই তিনটে মোটা মোটা পালতোলা থাম। অন্ধকারের পরদার উপরে মাঝের থামটা থেকে একগাছা মশারির দড়ি ঝুলছে, তার গায়ে সারি সারি মাছি বসে গেছে—কালো-কালো ফুলের কুঁড়ির মতো, নড়ে না, চড়ে না।

আমাদের ঘরের পশ্চিমগায়ে আর-একটা ক্যাম্বিসের বেড়াঘেরা ঘর, চমৎকার করে সাজানো। মায়ের বসবার ঘর সেটা। সেখানে প্রত্যেক জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট স্পষ্ট—যেখানকার যা ধরা রয়েছে, সব ঠিকঠাক। আজও মনের মধ্যে রয়েছে—এই ঘরটার পুবদিকের দরজার কাছে একেবারে কাচের মতো পিছল কালো বার্নিশ-মাখানো বাদামি টেবিল একটা পায়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলের কিনারায় সোনালি পাড়, ঠিক মাঝে একটা পাহাড় আর সরোবরের ছবি লেখা। এই টেবিলের নীচে একটা কেমনতর কল ছিল, সেটাতে জোরে টান দিলেই টেবিলের উপরটা কাত হয়ে ফেলে দেয় বই, কাগজ, সেলাইয়ের বাক্স, উলবোনার কাঠি ইত্যাদি টুকিটাকি! এই টেবিলটার সামনে থাকে হলদে কাঠের ছোট্ট একখানা চৌকি ফুলকাটা কার্পেটমোড়া, ঠেলা দিলে সেটা হঠাৎ ভাঁজ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে চ্যাপটা হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। এই ঘরে থাকে কাঠির মতো সরু সরু পা একজোড়া ইটালিয়ান কুকুর—কাচের পুতুলের মতো ছোট্ট। কুকুরদুটো পাঁউরুটি, বিস্কুট, মুরগির ডিম খায়। আমার জন্যে পড়ে থাকে কৌচের নীচে খালি ডিমের খোলাটা। লুকিয়ে সেটা চিবিয়ে খেয়ে ধরা পড়ে যাই। হঠাৎ পিঠে পড়ে বেত, নীলমাধব ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করেন আমাকে হাইড্রোফোবিয়া হয় কি না; মা, পিসি, দাসী, সবাই ছিছি করতে থাকে; বাবামশাই হুকুম দেন আমাকে মংলু-মেথরের কাছে পাঠিয়ে দিতে। মেথরের সঙ্গে থাকতে হবে শুনে ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। শেষে দেয়ালের দিকে একঘণ্টা মুখ ফিরিয়ে থাকার শাস্তিটা বাবামশায় দিয়ে চলে যান অন্য ঘরে।

তখন কুকুর দুটোকে একদিন কী করে মেরে ফেলা যায় তারই ফন্দি আঁটি মেঝেতে পাতা মস্ত গালচের দিকে চেয়ে চেয়ে। এই গালচেখানাকে মনে পড়ে—বড়ো বড়ো সবজে পাতা আর সাদা ধুতরোফুল, কালোজমির উপরে বোনা। কটা কৌচ নীল আর সাদা ছিটমোড়া রয়েছে এখানে-ওখানে, আঁকাবাঁকা করে সাজানো। দুটো কৌচ চন্দ্রপুলির গড়ন, আর-একটা দেখতে যেন তিনটে ব্যাঙ একসঙ্গে পিঠে পিঠে জোড়া কিন্তু ঝগড়া করে তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। ডবল ব্র্যাকেটের মতো করে কাটা, গোলাপি রঙের ছোপ-ধরানো মার্বেল পাথরের একটা টেবিল এক কোণে রয়েছে, তার উপরে পাথরে-কাটা দুটি পায়রা ফল খেতে নেমেছে—সত্যিকার মতো পাখির আর আপেলের রং দেখে লোভ জাগে মনে। ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বড়ো হলটাতে উঠে যাবার পাঁচধাপ সিঁড়ি—তারই গায়ে অনেক উপরে একটা ব্র্যাকেটে তোলা আছে, চৌকো কাচের ঢাকনা-দেওয়া, গোপাল পালের গড়া লক্ষ্মী আর সরস্বতী—ছোট্ট ছোট্ট আসল মানুষের মতো রং-করা কাপড় পরানো। দেশি কুমোরের হাতে গড়া এই খেলনা দেবতার কাছেই, দরজার উপর খাটানো চওড়া গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো, তেল রং-করা বিলিতি একটা মেমের ছবি। চোখ তার কালো, চুল কটা নয় একটুও, মাথায় একটা রাঙা কানঢাকা টুপি, খয়েরি মখমলের জামা হাতকাটা, সাদা ঘাঘরা পরনে। সে বাঁ হাতে একটা ঝুড়ি নিয়েছে, রুমাল-ঢাকা চুবড়ির মধ্যে থেকে যেন একটা সত্যিকারের কাচের

বোতল গলা বার করেছে। ডান হাত রেখেছে মেয়েটা ঠিক যেন সত্যিকার মস্ত একটা কুকুরের পিঠে। কুকুর চেয়ে আছে ঝুড়ির দিকে, মেয়েটা চেয়ে আছে কুকুরের দিকে। একেবারে জলজীয়ন্ত মানুষ আর কুকুর আর মখমল আর ঝুড়ি আর ব্র্যান্ডির বোতল—কিছুতেই মনে হত না অথচ সেটা ছবি নয়।

মায়ের এই বসবার ঘরের পাশেই পশ্চিমদিকে বাবামশায়ের শোবার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে তখন। মস্ত একটা চাবি দিয়ে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ রয়েছে, কিন্তু জানছি সেখানে সাহেব মিস্ত্রি লাল, সাদা, হলদে, কালো নতুন রকমের বিলিতি টালি কেটে কেটে বসাচ্ছে মেঝেতে—ঠুকঠাক খিটখাট ছেনির শব্দ হচ্ছেই সেখানে সারাদিন। ঘরটা যেদিন খুলল দুয়োর, সেদিন দেখি সেখানে সবকটা জানলা-দরজার মাথায় মাথায় সোনার জল-করা কার্নিস বসে গেছে, আর সেগুলো থেকে ফুলকাটা ফিনফিনে পর্দা জোড়া জোড়া ঝুলছে, সবজে আর সোনালি রেশমে পাকানো মোটা দড়ায় ফাঁসে লটকানো। ঘর জোড়া পালঙ আয়নার মতো বার্নিশ করা। ঘরটার পশ্চিমমুখো জানলাটা খুলে তার ওধারটাতে বানিয়েছে অক্ষয় সাহা ইঞ্জিনিয়ার-বাবু একটা গাছঘর, কাঠ আর টিন আর ঘষা কাচের শার্সি দিয়ে। সেখানে দেওয়ালগুলো আগাগোড়া গাছের ছালের টুকরো দিয়ে মুড়ে ভাগবত-মালি লটকে দিয়েছে সব বিলিতি দামি পরগাছা! কোনোটা সাপের ফণার মতো বাঁকা, কোনোটার লম্বা পাতা দুটো সাপের খোলসের মতো ছিট দেওয়া ডোরাকাটা। কিন্তু এর একটা পরগাছাতেও ফুল-ফল কিছুই নেই, কোনোটাতে-বা পাতাও নেই, কেবল সেটা আর কাঁটা।

এই গাছঘরের মাঝে একটা তিনফুকোর দালানের মতো খাঁচা। তারের টেবিল তাতে হলদে রঙের এক-জোড়া কেনেরি পাখি ধরা থাকে। শোবার ঘরটা তখনও নিজের সাজ সম্পূর্ণ করেনি ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে। শুধু সরু পাথরের তাকের সঙ্গে আঁটা গোল চুলবাঁধাব আয়নাখানা মায়ের রয়েছে একটা দিকে। এই আয়নাখানাকে ঘিরে মিহি গিলটির পাড়, তাতে সবজে আর সাদা মিনকারি দিয়ে নকশা-করা জুঁইফুল আর কচি পাতার একগাছি গোড়ে মালা। আর এরই সামনে স্ফটিক-কাটা চৌকোনো একটি ফুলদানির মাঝখানে সোনার বোঁটাতে আটকানো যেন বরফকুচি দিয়ে গড়া ভুঁইচাপা—সোনার ডাঁটি তাকে নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। জলের মতো পরিষ্কার আয়নার দিকে চেয়ে ফুল দেখছে ফুলের একখানি ছায়া স্থির হয়ে!
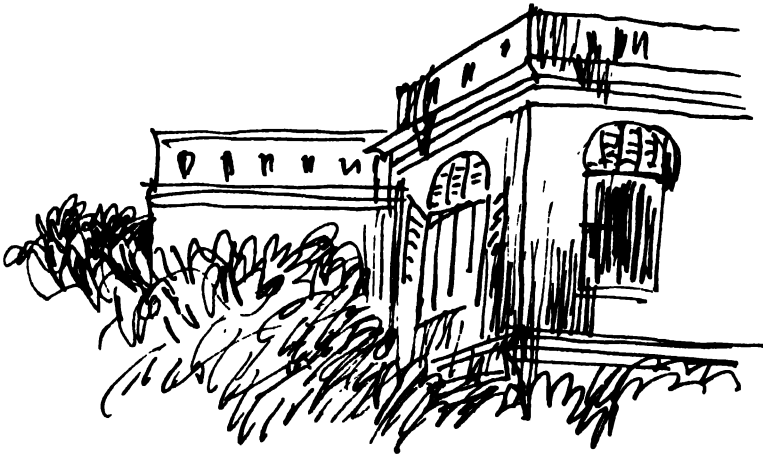
ব্যাপ্‌টাইজ

৭৪ খ্রি. অব্দের আগে থেকে দাসীর কোল ছেড়ে, চাকরের হাত ছেড়ে কাঠরা না ধরে বাড়ির সব সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে মজবুত হয়ে গেলেম; কিন্তু তখনও দেখি হাতের পাঁচটা আঙুলের নাম জানিনে, ডান হাতে বাঁ হাতে গোলমাল হয়ে যায়।

সেই অবস্থায় একদিন সকালে আমাদের দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে চায়ের মজলিশ করে বসেছে। বেয়ারা-বাবুর্চি উর্দি পরে ফিটফাট হয়ে সকাল থেকে দোতলায় হাজির। আমার সেই নীল মখমলের সেকেন্ডহ্যান্ড কোট আর শর্ট প্যান্টটার মধ্যে পুরে রামলাল আমাকে ছেড়ে দিয়েছে যতটা পারে চায়ের মজলিশ থেকে দূরে।

কে জানে সে কে-একজন—মনে তার চেহারাও নেই—সাহেবসুবোগোছের মানুষ, চা খেতে-খেতে হঠাৎ আমাকে কাছে যেতে ইশারা করলেন! পরের ঘরে ঢুকতে মানা ছিল পূর্বে, কাজেই আমি ধরা পড়েছি দেখে পালাবার মতলবে আছি, এমন সময় রামলাল কানের কাছে চুপিচুপি বললেন—'যাও, ডাকছেন, কিন্তু, দেখো, খেয়ো না কিছু।' সাহস পেলেম, সোজা চলে গেলেম, টেবিলের কাছে যেখানে রুটি বিস্কুট, চায়ের পেয়ালা, কাচের প্লেট, তখমা-ঝোলানো বাবুর্চি আগে থেকে মনকে টানছিল। ভুলে গেছি তখন রামলালের হুক্‌মের শেষভাগটা, ঘরের মধ্যে কী ঘটনা ঘটল তা একটুও মনে নেই। মিনিটকতক পরে একখানা মাখন-মাখানো পাউরুটি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসতেই আড়ালে কেদারদাদার সামনে পড়লেম। ছেলেমাত্রকে কেদারদাদার অভ্যাস ছিল 'শালা' বলা। তিনি আমার কানটা মলে দিয়ে ফিসফিস করে বলেন—'যাঃ শালা, ব্যাপ্‌টাইজ হয়ে গেলি।' রামলাল একবার কটমট করে আমার দিকে চেয়ে বলে—'বলেছিলুম না খেয়ো না কিছু।'

কী যে অন্যায় হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনে; কেউ স্পষ্ট করেও কিছু বলে না; দাসীদের কাছে গেলে বলে—'মাগো খেলি কী করে?' ছোটো বোনেরা বলে বসে—'তুমি খেয়েছ, ছোঁব না!' বড়োপিসি মাকে ধমকে বলেন, 'ওকে শিখিয়ে দিতে পারনি ছোটোবউ।'

যে ভদ্রলোক চা খেতে এসেছিলেন তিনি তো গেলেন চলে খাতিরযত্ন পেয়ে; কেদারদাদাও গেলেন শিকদারপাড়ার গলিতে; কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ কথাটা আমার আর কাছছাড়া হয় না। রুটিখানা হজম হয়ে যাবার অনেক-অনেক ঘণ্টা পরে পর্যন্ত আমার মনে কেমন একটা বিভীষিকা জাগতে থাকল। কারও কাছে এগোতে সাহস হয় না; চাকরদের কাছে তোষাখানায় যাই, সেখানে দেখি রটে গেছে ব্যাপ্‌টাইজ হবার ইতিহাস; দপ্তরখানায় পালাই, সেখানে যোগেশদাদা ঠাকুরদাদাকে ডেকে বলে দেন আমি ব্যাপ্‌টাইজ হয়ে গেছি। এমনি একদিন দু-দিন কতদিন যায় মনে নেই, একলা-একলা ফিরি, কোথাও আমল পাইনে, শেষে একদিন ছোটো পিসিমা আমায় দেখে বললেন, 'তোর মুখটা শুকনো কেন রে?'

মনের দুঃখ তখন আর চাপা থাকল না—'ছোটো পিসিমা, আমি ব্যাপ্‌টাইজ হয়ে গেছি।' ছোটোপিসি

জানতেন হয়তো ব্যাপ্‌টাইজ হওয়ার কাহিনী এবং যদি বিনা দোষে কেউ ব্যাপ্‌টাইজ হয় তো তার উদ্ধার হয় কীসে, তাও তাঁর জানা ছিল, তিনি রামলালকে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় দিয়ে আনতে বললেন।

চলল নিয়ে আমাকে রামলাল ঠাকুরঘরে। পাহারাওয়ালার সঙ্গে যেমন চোর, সেইভাবে চললেম রামলালের পিছনে-পিছনে নানা গলি-ঘুঁজি উঠোন সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছোতে হচ্ছে ঠাকুরঘরে—যেতে যেতে দেখছি অন্দরবাড়ির লাল টালি-বিছানো ছোট্টো উঠোন জল দিয়ে সবেমাত্র ধোয়া হয়েছে। সেই উঠোনের পশ্চিমের দেয়ালে একটা গরাদে আঁটা ছোটো জানালা, তারই ওধারে অন্ধকার ঘর, তারই মধ্যে কালো একটা মূর্তি বড়ো বড়ো মেটে জালার মুখ খুলে কী তুলছে। পায়ের শব্দ পেয়ে মূর্তিটা গোল দুটো চোখ নিয়ে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে দেখলে। এর অনেক কাল পরে জেনেছিলেম এ লোকটা আমাদের কালীভাণ্ডারী—রোজ এর হাতের রুটিই খাওয়ায় রামলাল। কালী লোক ছিল ভালো, কিন্তু চেহারা ছিল ভীষণ। আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতের কথা পড়ি আর মনে পড়ে এখনও কালীর সেদিনের চোখ, গরাদে-আঁটা ঘর আর মেটে জালা। উঠোন থেকেই দক্ষিণধারের রান্নাবাড়ির ছাদের উপর দেখা যায় ঠাকুরঘরের খানিকটা অংশ। কিন্তু সোজা রাস্তা ছিল না সেখানে পৌঁছোনোর! উত্তরদিকে পাঁচটা ধাপে মেটে সিঁড়ি ধরে চলল রামলাল। এই সিঁড়ির গায়েই পালকি নামবার ঘর; সেখানে ঘরজোড়া দোতলা পর্যন্ত একটা মেটে সিঁড়ি—গজগিরি পাঁচিল আর উঁচু উঁচু ধাপগুলো তার—সেটা পেরিয়ে একটা সরু গলি, তার জানালা নেই, দরজা নেই, খালি পাঁচিল আর ছোটো ছোটো ফুটো-করা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটা অন্ধকারে মোড়া।

এই সরু গলিটা পেরিয়ে পড়লেম একটা খোলা ছাদের একধারে একটা আরও সরু বারান্দায়। সেখানে সারিসারি মাটির উনুন। একটা মোটাসোটা দাসী দেখি মস্ত লোহার কড়া আগুনের উপর চাপিয়ে বসে আছে ইট একখানা পেতে। সে আমার দিকে চেয়ে দেখার আগেই সামনের চার-পাঁচটা ধাপ নেমে গিয়ে পড়েছি একটা ছোটো জানালা-আঁটা ঘরে। সেখানে দেখি অন্ধকার—একটা মস্ত জাঁতা নিয়ে বসে এক বুড়ি— সাদা কাপড় পরা—আমাকে দেখেই সে একবার জাঁতাটা ঘুরিয়ে দিলে। ঘরঘর শব্দে সমস্ত ঘরখানা পায়ের তলায় কেঁপে উঠল। রামলাল আর সেখান থেকে নড়তেই চায় না। ভাবছি ছোটোপিসি বলেছেন গঙ্গাজলের কথা, রামলাল কি এত নেমকহারাম হবে যে হুকুম না মেনে জাঁতাবুড়িকে দিয়ে দেবে আমাকে, আর চাল-ডালের সঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাব যখন, তখন গিয়ে রামলাল ছোটোপিসিকে মিছে কথা বলবে যে আমি ইচ্ছে করে জাঁতা ঘোরাতে গিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছি।

রামলাল যখন বুড়ির কাছ থেকে একমুঠো সোনামুগ খুঁটে বেঁধে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির দিকে অগ্রসর হল তখন রামলালের সঙ্গ নিতে একটুও দেরি করলেম না। জাঁতাঘরটা ছাড়িয়েই রান্নাবাড়ির বারান্দা — সেখানে মাছভাজার গন্ধ পেয়ে মনে হল এ-যাত্রা বেঁচে গেছি।

রান্নাবাড়ির উঠোনের পুবগায়ে সরু মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় ঠাকুরবাড়ি—কতকালের সিঁড়ি, ইট খসে-খসে ধাপগুলো তার ফোগলা হয়ে গেছে। এই সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে দেওয়ালের গায়ে চৌকো একটা দরজা ফস করে খুলে রামলাল বললে—'এটা কি জানো? চোরকুটুরি, পেতনি থাকে এখানে।'

আর বলতে হল না, সোজা আমি উঠে চললেম সিঁড়ি যেখানে নিয়ে যায় যাক ভেবে। খানিক পরে রামলালের গলা পেলেম—'জুতো খুলে দাঁড়াও, পঞ্চগব্যি আনতে বলি।' ভয়ে তখন রক্ত জল হয়ে গেছে।

ছোটোপিসি দিয়েছেন হুকুম গঙ্গাজলের; কেন যে রামলাল পঞ্চগব্যির কথা তুলছে সে প্রশ্ন করবার মতো অবস্থার বাইরে গেছি তখন। মনও দেখছি ঠিক সেই পর্যন্ত লিখে বাকিটা রেখেছে অসমাপ্ত।

আমার 'ব্যাপ্‌টাইজ' হবার কথা মনেই ছিল না। আর কিছুদিন হল কোন হোস্টেলের বাঙালি ছেলেরা আমাকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিল। সেখানে পাতে বসে দেখি দেশি খাবারের মধ্যে এক টুকরো করে মাখন-মাখানো পাউরুটি! দেখেই আমার সেই ৭৪ খ্রি. অব্দের রুটি খাওয়া মনে পড়ে গেল। ছেলেদের শুধোলেম, 'রুটিখানা কেন রসগোল্লার সঙ্গে?' সর্দার পোড়ো একটু হেসে বললে, 'ওটা আমরা সব ছেলেদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছি মশায়।'

আমাদের সেকালের পুজো

আমাদের ছেলেবেলায় পুজো আসত। কয়লাহাটার রাজা রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তখনও পুজো হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে পুজো না থাকলেও পুজোর আবহাওয়া এসে লাগত আমাদের বাড়িতে।

পুজোর আগেই আসত চীনেম্যান—বার্নিশ-করা নতুন জুতোর জন্যে পায়ের মাপ নিতে। সব বাড়ির ছেলেরা মিলেই পায়ের মাপ দিতুম। অবাক হতুম তার মাপ নেওয়ার কায়দা দেখে। একটুকরো লম্বা ফালি কাগজ নিয়ে সব ছেলেদের একবার পায়ের লম্বা আর একবার বেড়টা মেপে নিয়েই ছেড়ে দিত। মাপ নেওয়ার ওইরকম যত্ন দেখে মনে আশঙ্কা হত যে জুতো কোনোদিন এসে পৌঁছোবে কি না। কর্তাদের চোখের আড়ালে চীনেম্যানের গা-ঘেঁষে জিজ্ঞেস করতুম—জুতো কবে আসবে বলো না! ভালো করে মাপ নিয়েছ তো? ফোসকা পড়ে না যেন এমন জুতো তৈরি করে দিয়ো। নাকি সুরে চীনে সাহেব বলত, 'ঠিক হোঁবে, বালো জুতো হোঁবে।' চীনেম্যান বলে নাক কুঁচকে ঘেন্নায় অবহেলা করবার জো ছিল না। একবার কে যেন বলেছিল, 'চীনেম্যান চুং চ্যাং, মালাইকা ভট্।' তার জন্য তার ভয়ানক বকুনি হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে তার আদর ছিল খুব। সৌম্যমূর্তি চীনেম্যান আর তার হাস্যমুখ এখনও মনে পড়ে।

তারপর আসত দরজি। তার নামটা ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ে 'আবদুল'। তার মাথায় গোল গম্বুজের মতো একটা মস্ত সাদা টুপি। গায়ে সামনে-বোতাম-দেওয়া দিব্যি ধবধবে সাদা চাপকান, মস্ত ভুঁড়ি। পিঠে কাপড়ের পুঁটলি। তার কাছে দিতে হত সক্কলের জামার মাপ। জামা-তৈরির কাপড় জোগানের ভারটা সেই নিত। সবুজ কিংখাপের থান, তার ওপর সোনালি বুটি—সেটাই ছিল ছেলেদের সকলের পছন্দ; সেই থান থাকত তার বগলে—সেই কাপড় থেকে ছেলেদের একটা করে চাপকান সক্কলের তৈরি হত। সব ছেলেদের একরকম পোশাক। আর ওই কাপড়েরই জরি-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি টুপিও একটা সকলেই পেতুম। এই হল পুজোর পোশাকের পালা।

পোশাকের পালা চুকে গেলে আসত গিব্রেল সাহেব। ইহুদি সাহেব সে। টকটকে রঙ, গোঁফ-দাড়িতে জমকালো চেহারা! তার চেহারাটা হুবহু শাইলকের ছবি। তার ওপর ইহুদি—জামার আস্তিনে রুপোর বোতাম সারিসারি লাগানো থাকত। তা দেখে চমক লাগত। সে আসত গোলাপ আর আতর বিক্রি করতে। কর্তারা, বাবুরা, সব্বাই ছিলেন তার খদ্দের। আমাদের ছোটোদের জন্যও ছোটো ছোটো শিশিতে সে আনত গোলাপি আতর। সেটা আমাদের বার্ষিকী। তার জন্যে পয়সা দিতে হত না তাকে।

তারপরেই পুজোর পার্বণীর পালা। ছোটো-বড়োর হিসেবটা তখনই বেশ বোঝা যেত। বড়োরা বেশি পেত, আর ছোটোরা পেত কম। বড়োরা কেউ চার টাকা, কেউ আট টাকা—আর ছোটোরা বয়স-হিসেবে এক টাকা থেকে আট আনা চার আনা। এইরকম পার্বণী পেতুম আমরা, চাকর-বাকরদেরই হত জোর লাভের মরসুম। তাদের হাতে আমাদের পাওনা যার-যার পার্বণী জমা করে না দিলে নানারকম মুশকিল বাধত। তবে আমার চাকর রামলাল ওরই মধ্যে একটু লোক ভালো ছিল। সে সর্বৈব ফাঁকি দিত না, ওই পার্বণীর পয়সা

থেকে চীনেবাজারে গিয়ে আমার জন্যে এক-আধটা নতুন খেলনা এনে দিত যে তা বেশ মনে আছে। এই রামলাল-চাকর ছিল কয়লাহাটার বাড়িতে ছোটো কর্তা রাজা রমানাথ ঠাকুরের পা-টেপার চাকর। ছোটো কর্তা ভারী শৌখিন মানুষ ছিলেন—হাতের স্পর্শ হিসেবে তাঁর সব তেল-মাখানোর চাকর, মাথা-টেপবার চাকর, পা-টেপবার চাকর, এমনি সব রকম-রকম চাকর রাখা হত।

ষষ্ঠীর আগেই নেমন্তন্ন আসত। ছোটো কর্তার বাড়িতে পুজোর নেমন্তন্ন হত। বাড়িসুদ্ধ ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সকলের। আমাদেরও নেমন্তন্ন র[illegible] করতে ও ছোটো কর্তাকে প্রণাম করতে যেতে হত। সেখানে আবার আর-এক প্রস্থ পার্বণী আদায় হত। তিনিই দিতেন পার্বণী, বড়োদাদাকে (গগনেন্দ্রনাথ) এক টাকা, মেজোদাদাকে (সমরেন্দ্রনাথ) আট আনা আর আমি পেতুম চার আনা। একবার আমি তাঁর সামনেই ঘোরতর বেঁকে বসলুম। 'চার আনা নেব না, এক টাকা দিতে হবে।' এ বুদ্ধিটা বোধ হয় রামলালই দিয়েছিল। ছোটো

কর্তা সেই বুড়ো আমটির মতো! একথা শুনে ধীরে-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে রুপোর সিকিটি নিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন—'এই নাও, না-ও, রাগ কোরো না, একে বলে টাকার ছানা—এ বড়ো হবে।' আর আমার মুখে জবাব নেই। এরপর কী জবাব দেব রামলাল তো শিখিয়ে দেয়নি। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাই নিলুম। ছোটো কর্তাকে প্রণামের পালা শেষ করে ঢুকতে হত অন্দরে। সেখানে সব আগে দিদিমাকে (রমানাথ ঠাকুরের স্ত্রী) প্রণাম করেই সন্দেশ পেতুম। দিদিমা আবার নতুন করে নেমন্তন্ন দিতেন—'রামলাল, ছেলেদের যাত্রা দেখাতে আনিস।'

নবমীর দিন যাত্রা বসত কয়লাহাটায়। ওই দিন সন্ধে থেকে সেখানে হাজির। খাওয়াদাওয়া সব সেখানেই। চাকরেরা খাওয়াদাওয়া সারিয়ে নিয়ে যেত কর্তার একটি ঘরে—সে-ঘরে মস্ত একখানা সেকেলে খাট ছিল। সে যেন বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসনের চেয়েও জমকালো। সেটা এত উঁচু যে সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠতে হত। সেইখানে নিয়ে গিয়ে চাকরেরা আমাদের শুইয়ে দিত। আর বলে যেত— 'এখন ঘুমোও, যাত্রা জমলে নিয়ে যাব।' চাকরদের ভয়ে তখন চুপচাপ লক্ষ্মীছেলে হয়ে শুয়ে পড়তুম। মটকা মেরে ঘুমোবার ভান করতুম। তারপর চাকরেরা চলে গেলে সেই খাটের ওপর আমাদের বাড়ির ছেলেরা আর সে-বাড়ির ছেলেরা সবাই মিলে হইহল্লা, গল্পগুজব খেলা শুরু করে দিতুম। ঢোল বাঁধা হচ্ছে, গিজতা-গিজুম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খাওয়াদাওয়া ভোজের 'এটা নিয়ে আয়' 'ওটা নিয়ে আয়' 'দই আন সন্দেশ আন' এইসব কানে আসত। এই করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তুম জানিনে। একসময়ে রামলাল এসে বলত, 'ওঠো। ওঠো। যাত্রা জমেছে।' ঘুমে তখনও চোখ জড়িয়ে থাকত। চাকরেরা কোলে করে নিয়ে গিয়ে আমাদের তখন যাত্রার আসরে বসিয়ে দিয়ে আসত।

যাত্রার আসরে দেখি সব গুরুজনেরা সামনে বসেছেন। বড়ো বড়ো সব সটকা পড়েছে। আসর ঘিরে পাড়াপড়শি চাকর-দাসী চেনা-অচেনা মেলাই লোক জড়ো হয়েছে। দোতলার বারান্দায় খড়খড়ির পিছনে মেয়েরা, বৈঠকখানার বারান্দায় ছোকরা বাবুরা। আর আমাদের জায়গা ছোটোকর্তার বসবার পিছনে এক দিকে। তিনি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে বসতেন। ছোটোদের বড়ো ভালোবাসতেন তিনি। আরতির সময়ও আমরা তাঁর চারপাশে সামনে-পিছনে হাতজোড় করে সারি দিয়ে দাঁড়াতুম।

যাত্রা তখন জমেছে। কতরকম নাটকই না তখন হত। 'বউ মাস্টার' না কী-একটা যাত্রার দলের নাম আমার মনে আছে। চারধারে গেলাসবাতি জ্বলছে—তাইতেই আসর আলো। মাঝে-মাঝে তেলবাতির ফরাশ এসে তেলবাতি বদলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হরকরারা সব পান দিয়ে যাচ্ছে। দরোয়ানেরা গোঁফ পাকিয়ে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে একবারে খাড়া, যেন দুগ্গাঠাকুরের অসুর সব দাঁড়িয়ে উঠেছে। যাত্রার সময় সবাই রুমাল বেঁধে প্যালা দিতেন। আমাদেরও হাতে চাকরেরা রুমালে পয়সা বেঁধে দিয়ে বলত—'বাবুরা যখন প্যালা দেবেন, তখন তোমরাও প্যালা দিয়ো।' রুমালসুদ্ধু পয়সা ছুড়ে দিয়ে ভাবতুম রুমালখানা বুঝি আর ফেরত এল না। কিন্তু অধিকারী মশাই ঠিক আবার রুমাল থেকে টাকাপয়সা খুলে নিয়ে রুমালগুলো একত্র করে যার-যার কাছে পৌঁছে দিতেন।

যাত্রায় দেখতুম সব বালকের দল গান গাইতে বেরুত। তাদের মাথায় সব পালকের টুপি। সে পালকের বাহার দেখে নাম দেওয়া হয়েছিল 'বক-দেখানো' পালকের টুপি। অধিকারী আসতেন যাত্রার আসরে চাপকান পরে। মাথায় শামলা চড়িয়ে, বুকে গার্ড-চেন ঝুলিয়ে। জুড়িদের শুধু সাদা কাপড়ের ইজের আর চাপকান।

রাজাদের গালপাট্টা—মোড়াশা পাগড়ি—মন্ত্রীরও তাই, খালি যা পাকা গোঁফ। নারদ এখনও যেমন, তখনও তেমন। একরাশ পাটের দাঁড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া এক নামাবলী গায়ে—আর বাঁশের আগায় লাউ-খোলা বাঁধা কী-একটা একতারার মতন নিয়ে দেখা দিতেন। ছেলেরা সব পেশোয়াজ আর নোলক পরে সখী সাজত। মাথায় জরি দিয়ে জড়ানো বিনুনি চুল। বুকে উকিলদের মতো করে ওড়না জড়ানো। তবে কারুর কারুর গোঁফদাড়ি কামানো হয়ে উঠত না যে তাও দেখেছি।

কী যে অভিনয় হত তা বুঝতে পারতুম না। তবে বেশ মনে আছে কখনো কখনো চোখে জল এসে যেত। কখনো ভারী ভয় হত। কখনো হাসতুম, অথচ ভয় করত। ভীম, রাবণ, কংস ওদের হুংকার আর অ্যাকটিং শুনে বুক কেঁপে উঠত। তার ওপর ভীমের গদাটা ছিল ভারী কৌতূহলের জিনিস।—'মোমজামা' কাপড়ের খোলে তুলা ভরতি করা থাকত যে, তা কী জানতুম! ওইটে ঘুরিয়ে হারে!-রে!-রে! করে ভীম আসরে প্রবেশ করলেই পিলে চমকে যেত।

এমনি সব দেখতে-দেখতেই ভোর হয়ে যেত। ঝাড় আর গেলাসবাতির সব আলো মিটমিটে হয়ে আসত—দেখতুম কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে—কেউ চোখ বুজে তামাকই টেনে চলেছে। সেইসময় ঢাকা-দেওয়া একটা পাখির খাঁচা-হাতে হাজির হত এক বহুরূপী। নানারকম প্রভাতী পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে জানিয়ে দিত—ভোর হয়েছে 'যাত্রা শেষ।' আজকালকার যাত্রা-থিয়েটারের মতো ওই ঠ্যানঠেনে ঘড়িঘণ্টার বিরক্তিকর আওয়াজ ছিল না সেকালের যাত্রায়। যাত্রা শেষ জানিয়ে দেবার জন্যে ঢোলটা একবার বেজে উঠত মাত্র। এদিকে রৌসুনচৌকিতে 'ভোরাই' ধরত। ওই অত ভোরে কিন্তু তখনও অনেক আগন্তুক আসত, বেশির ভাগ মেয়েরাই, গঙ্গা নেয়ে ঠাকুর দেখতে এসে গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে যেত। আমাদের নিয়ে রামলাল তখন বাড়িতে ফিরত। কয়লাহাটার মোড়ে গিয়ে গাড়ি ভাড়া হত। তখন সেখানে গোরুর গাড়ির ভয়ানক ভিড়। হইচই হট্টগোল—গাড়িতে গিয়ে উঠতে বুক ধড়াস ধড়াস করত। এখন তো সেখানে তোমাদের মস্ত রাস্তা বিবেকানন্দ রোড।

এর পরে বিজয়া। সেইটে ছিল আমাদের খুব আনন্দের দিন। সকাল থেকে খালি কোলাকুলি আর পেন্নাম। আমরা তখন যাকে তাকে পেন্নাম করছি। সেদিনও কিছু কিছু পার্বণী মিলত। আমাদের বুড়ো বুড়ো কর্মচারী যাঁরা ছিলেন—যোগেশদাদা প্রভৃতিকে আমরা বিজয়ার দিন পেন্নাম করে কোলাকুলি করতুম। বুড়ো বুড়ো চাকরেরাও সব এসে আমাদের টিপটিপ করে পেন্নাম করত। তখন কিন্তু ভারী লজ্জা করত। খুশিও যে হতুম না তা নয়। কর্তামশায়কে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ), কর্তাদিদিমাকে, এ-বাড়ির, ও-বাড়ির সকলকেই প্রণাম করতে যেতুম! বরাবরই আমরা বড়ো হয়েও কর্তামশায়কে প্রতি বছর প্রণাম করতে যেতুম। তিনি জড়িয়ে ধরে বলতেন— 'আজ বুঝি বিজয়া!' সে কী কম আনন্দ! তাঁর কাছে তো সহজে যাওয়া ঘটত না, তাই। তারপর সন্ধেবেলা হল 'বিজয়া সম্মিলনী'। আমাদের বাড়িতেই বসত মস্ত জলসা। খাওয়াদাওয়া, মিষ্টিমুখ, আতর, পান, গোলাপজলের ছড়াছড়ি। ঝাড়বাতি জ্বলছে। বিষ্টু-ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন। তার গলায় বিজয়ার সেই করুণ গান শুনে মেয়েরা চিকের আড়ালে চোখের জল ফেলতেন। কী তাঁর গান—

'আজু মায়ে লয়ে যায় সহে না প্রাণে।
যার প্রাণ যায় সেই জানে।।'

রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুর

সে যা-এক মজার গল্প, রবিকাকার এক পুষ্যিপুত্তুর জুটেছিল জানো সেকথা? তখন রবিকাকার সবে বিয়ে হয়েছে, দোতলার ঘরে থাকেন। ঘরের পাশে আর-একটা ছোটো ঘর বানিয়ে নিলেন। তাতে ছোটো ছোটো তক্তা দিয়ে সাজিয়ে বেশ বসবার ঘর বানিয়েছেন। সেখানেই তাঁর যাবতীয় বই থাকে, লেখবার নিচু ডেস্ক, তাতেই মাটিতে বসে লেখাপড়া করতেন। এমন সময়ে একদিন একটা ছোকরা ছেঁড়া-ময়লা জামা কাপড়, উসকোখুসকো চুলে কাকিমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, স্বপ্নে নাকি দেখেছে কাকিমা ওর পূর্বজন্মের মা ছিলেন, আদেশ হয়েছে রোজ চরণামৃত খেতে হবে কিছুকাল ধরে, গড় হয়ে এক প্রণাম। সে আর নড়ে না, কোথাও যাবে না। কাকিমার মায়া লাগল, মা বলে ডেকেছে, বললেন, আচ্ছা বাবা থাকো এখানেই। রবিকাকা আর কী করেন রাজি হলেন। লোকটা রোজ কাকিমাকে পেন্নাম করে পাদোদক খায়। বেড়ে আছে, রবিকাকা আর কাকিমা ওকে কাপড়-চোপড় কিনে দেন, এটা-ওটা দেন। দিব্যি ঘরের ছেলের মতো থাকে। এখন তার সাজসজ্জাও কী পরিপাটি, উসকোখুসকো চুলে তেল-জল পড়ল, তাতে সিঁথি কেটে কোঁচানো ধুতি-চাদর করে ক্রমে-ক্রমে সে কাকিমার ছেলে হয়ে উঠল। আগে থাকত নীচে দপ্তরখানায়, এখন দোতলায় উঠে গেল। পাদোদক পান করে একেবারে পদবৃদ্ধি হয়ে গেল। বাড়ির সবাই রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুরের উপর মহা বিরক্ত। অথচ কেউ কিছু বলতে পারে না। সত্যদাদা ছিলেন রবিকাকার ভাগনে, সম্পর্কে ভাগনে হলেও বয়সে বড়ো ছিলেন। তিনি না পেরে মাঝে মাঝে বলতেন, রবিমামা এ তুমি করছ কী। ও লোকটার হাবভাব সুবিধের নয়। রবিকাকা তাকেও তাড়া লাগাতেন, বলতেন, যাও যাও, তোমাদের যতসব বাজে ভাবনা, বেচারা গরিবের ছেলে, বাড়িতে আছে তাকে নিয়ে তোমরা কেন লাগতে যাও। কারও কথায়ই কান দেন না। সত্যদাদা ছাড়তেন না, মাঝে মাঝে বলতেন আর রবিকাকাও তাড়া লাগাতেন। রবিকাকার তখন সংস্থান বেশি ছিল না। কর্তাদাদামশায় কিছু দিতেন আর বই থেকে কিছু অল্পস্বল্প আয় হত, সে আর কতই-বা। তাই থেকে লোকটার সব খরচ জোগাতেন। দেখতে দেখতে তাঁর পুষ্যিপুত্তুর ফিটবাবু হয়ে উঠল, বার্নিশ-করা জুতো হল, তার সাজের বাহার কত! এই হতে-হতে ক্রমে রবিকাকার বই চুরি যেতে লাগল দুটি-একটি করে। রবিকাকা একে ধমকান তাকে ধমকান, চাকর-বাকরদের তম্বি করেন কিন্তু ওই লোকটাকে কিছু আর বলেন না। বইচুরি চলতেই লাগল। রবিকাকার জামাকাপড় এদিক-ওদিক হলে বুঝতেন যে ওই লোকটাই নিয়েছে, কিছু বলতেন না। কিন্তু যখন তাঁর বই ধরে টান পড়ল তখনই হল মুশকিল। তবু আশ্চর্য তখনও ওই লোকটাকে সন্দেহ করতেন না। সত্যদাদা বলতেন, রবিমামা, এ-কাজ তোমার ওই পুষ্যিপুত্তুরেরই। রবিকাকা চুপ করে থাকেন। একদিন আরও একটা কী দামি বই চুরি গেছে, রবিকাকা লোকটাকে ডেকে বলাতে সে বললে, আমি সত্যবাবুকে ওই ঘরে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম, বাড়ি ফিরে দেখি সত্যবাবু আপনার ঘরে ঘুরঘুর করছেন। এই যা বলা রবিকাকা তো বুঝলেন সব ব্যাপার, তা হলে এই লোকটারই কাজ। যখন এত সাহস সে সাফ সত্যবাবুর নাম বলে দিলে। এই তখন সত্যদাদা বিগড়ে গেলেন,

বললেন, কী আস্পর্ধা, দাঁড়াও, তক্কে-তক্কে থাকব। আমার নামে লাগিয়েছ বাবা দেখে নেব। এইবারে বাড়িসুদ্ধ সবাই ওর উপরে খাপ্পা। চাকর-বাকরদের উপর কড়া হুকুম হল যেন লোকটাকে চোখে-চোখে রাখে। রবিকাকার ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না আর। লোকটাও তখন বুঝেছে যে আর বেশিদিন চলবে না এখানে, তার প্রতাপ কমেছে। শেষে একদিন রবিকাকা কোথায় বেরিয়ে গেছেন। কর্তাদাদামশায় একবার রবিকাকাকে একটা ক্যারেজ ক্লক বকশিশ দিয়েছিলেন, বেশ বড়ো ঘড়ি আর খুব দামি, সেটা রবিকাকার ওই লিখবার ঘরেই থাকত। লোকটা করলে কী কেমন করে এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে সেই ক্যারেজ ক্লক, কলম, খাতা, দামি-দামি বই—সেগুলি বুক-কোম্পানিতে বিক্রি করত—আরও সব কী-কী আলনা থেকে গোপনে ধুতি-চাদর সব নিয়ে সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা কি সেসব কিছু জানি। আমরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল। আমরা আরও বলাবলি করতে লাগলুম যে পুষ্যিপুত্তুর চলেছেন দেখ সেজেগুজে। সে সেই যে বেরিয়ে গেল তো গেলই। রবিকাকা ফিরে এলেন, ঘরে ঢুকে দেখেন ঘর খালি। তখন চৈতন্য হল। সত্যদাদা ওঁরা বললেন, পুলিশে খবর দাও, কিন্তু আশ্চর্যি রবিকাকা, বললেন কী আর হবে, যাক গেছে তো গেছে। রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুর অদৃশ্য হল, আর খোঁজ নেই। রীতিমতো রবিকাকাকে বসান দিয়ে ছাড়লে কিন্তু পুষ্যিপুত্তুরের ভাগ্য তাঁর এখনও। অনেক পুষ্যিপুত্তুর ঢুকছে ক্রমে-ক্রমে, তারাও অদৃশ্য হবে। রবিকাকার ওই এক মজা দেখেছি, কেউ একবার কোনোরকম করে ঢুকতে পারলে হয়, বেশ কিছু করে নিয়ে সরে পড়তে পারে। আর কাউকে অবিশ্বাস নেই। প্রবোধ ঘোষ রবিকাকার ক্লাসফ্রেন্ড, ছেলেবেলার বন্ধু, তিনিই প্রথম রবিকাকার 'কবি-কাহিনী' ছাপিয়ে ছিলেন। তিনি একবার কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির নামে কী বলেছিলেন যে ও লোকটি স্পাই। তাঁকে রবিকাকা অ্যায়সা তাড়া মারলেন, বললেন, তোমাদের কেবল সন্দেহ কেবল অবিশ্বাস লোকের উপরে। বুঝে দেখো, ছেলেবেলার বন্ধু ভালো বুঝে কথাটা বলতে এসে তাড়া খেয়ে ফিরে যান। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ রবিকাকা, এমন সরল বিশ্বাস সবার উপরে। কাউকে কোনোদিন সন্দেহের চোখে দেখতে দেখিনি।